মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চারটি উপন্যাস

- ধরাবাঁধা জীবন
- প্রতিবিম্ব
- চিন্তামণি
- আদায়ের ইতিহাস

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

চতুর্থ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
প্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

ধরা-বাঁধা জীবন

উপন্যাস

এক

একদিনে ভূপেনের বৌ আর ছেলে মরিয়া গেল, কিন্তু ভূপেন কাঁদিল না। প্রথমে মরিল তার বৌ, কয়েক ঘণ্টা পরে ছেলেটা।

ভূপেনের আর ছেলেমেয়ে নাই। বছর দু'য়েক বয়স হইয়াছিল ছেলেটার। মাসখানেক আগে তার টাইফয়েড হয়। ছেলের সামান্য কিছু হইলেই ভূপেনের বৌ বড় অস্থির হইয়া পড়িত। ভাবিয়া ভাবিয়া এবং কারও বারণ না মানিয়া দিনরাত ছেলের সেবা করিয়া সে বড়ই কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। আরও বড় একটা কারণ ছিল তার কাবু হইয়া পড়ার। মারা সে গেল সেই কারণটির শেষ ধাক্কায়—মরা একটা মেয়েকে জন্ম দিতে গিয়া।

প্রথম মরণটা যখন ঘটে, ভূপেন আনমনে একটা সিগারেট ধরাইয়া মেয়েদের কান্নার শব্দ কানে আসা মাত্র আধপোড়া সিগারেটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। ছেলের মরার সময়ও সে তেমনি আনমনে একটা সিগারেট ধরাইল এবং মেয়েদের কান্নার শব্দ নূতন আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠামাত্র আবার সিগারেটটা ফেলিয়া দিল।

বন্ধু ও প্রতিবেশী ভদ্রলোকেরা আসিয়াছিল। ভূপেনের বৌ মারা গেলে তারা ভাবিল, ছেলের ভাবনায় শোক মানুষটার চাপা পড়িয়া গিয়াছে, সে পরে কাঁদিবে, ছেলের একটা কিছু হইয়া গেলে। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর তারা ভাবিল, পর পর দু'টি দুর্ঘটনায় মানুষটার ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে, থতমত ভাবটা কাটিয়া গেলেই সে পাগলের মত মাথা কপাল কুটিয়া কাঁদাকাটা করিতে থাকিবে।

কিন্তু অল্পে অল্পে সময় কাটিয়া গেল, দেহ দুটিকে শ্মশানে নেওয়ার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, ভূপেন কাঁদিল না। না কাঁদিলে যে সব পাগলামী করার রীতি আছে এ অবস্থায় সে রকম কোন পাগলামীও করিল না। কেবল মুখখানা তার দেখাইতে লাগিল অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ। কদিন দাড়ি কামায় নাই, স্নান হয় নাই দু'তিন দিন, ভূপেনের মুখখানা এমনিই শোকাতুর মানুষের মুখের মত হইয়া গিয়াছিল। সকলে তাই আরও বেশী অস্বস্তির সঙ্গে ভাবিতে লাগিল, মুখে যার গভীর মর্মান্তিক শোকের এমন স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে সে কাঁদে না কেন ?

দুটি মানুষ যে বাড়িতে মারা গিয়াছে সদ্য সদ্য, সে বাড়িতে অসাধারণ একটা অবস্থা সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক, সে জন্য কিছু আসিয়া যায় না, অস্বাভাবিক কিছু ঘটিলেই মানুষ পীড়া বোধ করে। ভূপেনের চুপচাপ থাকা ছাড়া এ বাড়িতে আর সব ঠিক মানানসই আছে। ভূপেনের মা আর পিসীমা চীৎকার করিয়া মরাকান্না কাঁদিতেছে, ভূপেনের দিদি বিমলা ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফিট হইতেছে, ভূপেনের ছোটবোন মেঝেতে পা দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া মাথা ফাটানোর চেষ্টা আরম্ভ করায় পাড়ার

একটি বৌ দু'হাতে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, ভূপেনের বৌদিদি ভিতরের বারান্দায় দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া গা এলাইয়া পড়িয়া আছে আর মৃদু ও মিহি গলায় গানের মতো সুর করিয়া কাঁদিতেছে, ভূপেনের দাদা পাগলের মত একবার ভিতর ও একবার বাহির করিতে করিতে হায় হায় করিতেছে। আর শোকের এই সমস্ত প্রকাশ্য অভিব্যক্তির মধ্যে চলিতেছে মরণের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আয়োজন।

কোমরে গামছা জড়াইয়া আট দশজন উৎসাহী ও অভিজ্ঞ মানুষ জুটিয়া গিয়াছে। হরদম বিড়ি সিগারেট পুড়িতেছে; বয়স্ক ভদ্রলোকদের মুখে নানা রকম দার্শনিক মন্তব্য শোনা যাইতেছেঃ বাঁচা মরার উপর মানুষের নাকি কোন হাত নেই, ভগবান কেন যে দেন আর কেন যে কাড়িয়া নেন তিনিই জানেন, যাইতে আমাদের সকলকেই হইবে, দুদিন আগে আর পরে।

এ সমস্তের মধ্যে ভূপেনের নিঃশব্দ শোক বড়ই খাপছাড়া মনে হইতে লাগিল। প্রসন্ন অভিজ্ঞ মানুষ। চিন্তিত মুখে সে আরেকজন অভিজ্ঞ মানুষকে বলিল, 'এতো ভাল কথা নয়, একটু কাঁদাকাটা করা যে দরকার!'

ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রসন্ন ভূপেনের কাছে গেল।

'এম্‌নি অদৃষ্ট ভাই মানুষের সংসার করতে হলে সবাইকে এমনি ক'রে কাঁদতে হয়, কি করবে বল!'

—'আমার এ কি সর্বনাশ হয়ে গেল প্রসন্নদা? কেন আমার এমন হ'ল প্রসন্নদা?'

কাঁদতে কাঁদতে মানুষ যে ভাবে এ ধরনের কথা বলে অবিকল সেই রকম শোনাইল কথাগুলি। তবু বেশ বুঝা গেল ভূপেন কাঁদে নাই।

প্রসন্ন থাকে সহরের প্রায় অন্য প্রান্তে। ভূপেনকে কাঁদাইতে না পারিয়া সে হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল। পরদিন আসিল প্রসন্নের বোন প্রভা। বাড়িতে পা দিয়াই চোখ মুছিতে মুছিতে ধরা গলার সে দাবী করিয়া বসিল, 'না না, এরকম করবেন না ভূপেনবাবু, একটু আপনি কাঁদুন। কেন চেপে রাখছেন জোর ক'রে?'

'কাঁদিব?'—ভূপেন কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল।

'হ্যাঁ কাঁদুন। প্রাণ ভরে কেঁদে নিন। তাতে কোন দোষ নেই। এরকম অবস্থায় কাঁদা যে দরকার—'

নিজের কান্না বন্ধ করিতে প্রভাকে নিজের মুখে রুমাল গুঁজিয়া দিতে হইল। এ তার লোক দেখানো কান্না নয়, পারিলে না কাঁদিয়াই ভূপেনের সঙ্গে দেখা করার কাজটা সে সারিয়া যাইত। ভূপেনকে কাঁদাইতে আসিয়া ভূমিকা করিতে গিয়া নিজেই সে এমনভাবে কাঁদিয়া ফেলিবে, তার ধারণাও ছিল না। সমস্ত শরীর তার থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে আর দু'চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। এতখানি ব্যাকুল হইয়া প্রভা নিজে না কাঁদিলে ভূপেন হয়তো এখন কাঁদিয়া ফেলিতে পারিত, প্রভার বিকৃত মুখভঙ্গি দেখিতে দেখিতে তার মুখের এতক্ষণের কাঁদ কাঁদ ভাবটুকু পর্যন্ত ঘুচিয়া গেল।

দু'বছর আগে প্রভা ডাক্তারি পাশ করিয়াছে। পাশ করার অনেক আগে হইতেই সে মাঝে মাঝে আসিয়া ভূপেনের বাড়ির ছেলে মেয়েদের চিকিৎসা করিয়া যাইত। মন তার কোনদিন নরম ছিল না, ভাবপ্রবণতা তার নাই। মনে মনে ভূপেন বোধহয় একটু ভয়ই তাকে করে। ভূপেন তার প্রিয়জনের পর্যায়ে পড়ে সন্দেহ নাই, ভূপেনের বৌ আর ছেলেটাকেও সে স্নেহ করিত, তবু এভাবে তার কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার

উপযুক্ত কারণ তো ভূপেনের বৌ আর ছেলের মরণ নয়! সহানুভূতির কান্না কি এমন হয়?

ব্যাপারটা ভূপেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রভাকে সে কোনদিন কাঁদিতে দেখে নাই। বছরখানেক আগে প্রভার ছোট ভাইটি যখন মারা যায় প্রভা নাকি তখন ভয়ানক কাঁদিয়াছিল! ভূপেন সে সময়ে এখানে ছিল না। আজ প্রভার কান্নার ভঙ্গিটা ভূপেনের অভিনব এবং খাপছাড়া মনে হইতে থাকে।

কান্নার বেগ কমিয়া আসিলে প্রভা বলে, 'কি ক'রে সইবেন ভূপেনবাবু? পণ্টুর কথা মনে হ'লে আজও যে আমার বুক ফেটে যায়? মনে হয় আমার কেউ নেই, সব শূন্য হয়ে গেছে।'

এবার কতকটা বুঝিতে পারিয়া ভূপেন ভাবে, প্রভার তো নিজের ছেলেমেয়ে নাই, তাই ছেলেকে আর ভাইকে হারানোর তফাৎটা ঠিক ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ছেলে মরিয়া গেলে মানুষের কেমন লাগে, ও তার কি বুঝিবে!

একটু ভাবিয়া ভূপেন বলিল, 'কেঁদো না প্রভা। শোক পাওয়া সংসারের রীতি, কি করবে বল। মানুষের তো কোন হাত নেই!'

প্রভা আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

'আমি চেষ্টা করলে হয় তো বিশুকে বাঁচাতে পারতুম ভূপেনবাবু।'

শুনিয়া ভূপেন ভাবিল, ডাক্তার হোক আর যাই হোক, প্রভা মেয়েমানুষ তো, এরকম আবোল-তাবোল কথা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।

কেবল মেয়েমানুষ বলিয়াই প্রভার উপর আজ ভূপেন যেন বিশেষ মমতা বোধ করে। এবং বোধ হয় সেই জন্যই দুপুরবেলা উদ্দেশ্যহীনভাবে বাড়ির বাহির হইয়া কি করিবে ভাবিতে গিয়া প্রথমেই ভূপেনের মনে হয়, প্রভাদের বাড়ি যাওয়ার কথা। কিন্তু মোটে কয়েক ঘণ্টা আগে প্রভা আসিয়া তার সঙ্গে দেখা করিয়া কাঁদিয়া গিয়াছে, এখন আবার তাদের বাড়ি যাইতে ভূপেনের সংকোচ বোধ হয়। অন্য সময় অন্য অবস্থায় প্রভা আসিলেও একবার ছাড়িয়া দশবার তাদের বাড়ি যাওয়া চলিত, আজ বোধ হয় একটু খারাপ দেখাইবে গেলে। প্রভা কি ভাবিবে কে জানে।

ট্রামে উঠিয়া সে টিকিট করে সহরের অন্য প্রান্তে যাওয়ার, যেখানে প্রভাদের বাড়ি। কিন্তু চৌরঙ্গীতে নামিয়া গাড়ি বদল করার পরিবর্তে টিকিটটা ফেলিয়া দেয়। তারপর কি ছবি দেখানো হইতেছে নাম না পড়িয়াই একটা সিনেমায় ঢুকিয়া পড়ে। টিকিট কেনার সময় সে বড়ই সংকোচ বোধ করে, ভিতরে গিয়া বোধ করে অস্বস্তি। আজ কি তার সিনেমা দেখা উচিত? চেনা মানুষ কেউ তাকে এখানে দেখিলে কি মনে করিবে কে জানে! কেবল তাই নয়, ভূপেনের মনে হইতে থাকে, আজ, সিনেমায় আসিয়া সে যেন সরমা আর নন্তুর স্মৃতিকে কেমন অপমান করিতেছে। ওরা দুজন যে সত্যই নাই, এ চিন্তায় ভূপেন এখনও অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। ওদের যে পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এ-কথাটা সব সময়েই মনে থাকে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ওদের এতকালের অস্তিত্বের অনুভূতিও যেন আগের মতই জোরালো হইয়া আছে!

পর্দায় একজনকে কাঁদিতে দেখিয়া ভূপেন ছবির দিকে মনোযোগ দিয়া কারণটা বুঝিবার চেষ্টা করে। তারপর ছবিটা তার ভাল লাগিয়া যায়, আর কিছু মনে থাকে না। কাহিনীটা উদ্ভট, অন্য সময় ভূপেনের বিরক্তি বোধ হইত, আজ অবাস্তব নরনারীর জীবনের স্রোতের মত খাপছাড়া অসম্ভব ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া তার এমন মজা লাগে

বলিবার নয়। এবং ছবি শেষ হওয়ামাত্র তার মনে হয়, এ জগতে ধরা-বাঁধা কোন নিয়মই নাই, এখন তার প্রভাদের বাড়ি যাওয়ার মধ্যে দোষের কি থাকতে পারে?

বাড়ির মধ্যে প্রভা খুব হাসিতেছিল, বাহিরের ঘর হইতে শোনা যায় এত জোরে। শুনিয়া ভূপেনের মস্ত একটা দুর্ভাবনা যেন কাটিয়া যায়। আজ সকালে প্রভা নন্তু আর সরমার জন্য কাঁদিতেছে মনে করিয়া প্রথমটা তার কি রকম খারাপ লাগিয়াছিল এবং কান্নাটা তার নিজের ভাই-এর জন্য জানিতে পারিয়া কি রকম নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন খেয়াল না হোক পরে ভূপেন সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল। কথাটা জটিলও নয়, দুর্বোধ্যও নয়। যতই কষ্ট হোক মুক্তির একটা অবাধ্য অনুভূতিও যে প্রথম হইতে জাগিয়া আছে সেটা না মানিয়া ভূপেনের লাভ কি? শীতকালের শেষাশেষি হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যেও হঠাৎ একদিন আবহাওয়ার পরিবর্তন অনুভব করার মত স্ত্রী-পুত্রের শোকের মধ্যে হাল্কা ও ব্যাপক মুক্তির স্বাদ সে যদি পায়, প্রভার তো অভদ্র রকমের আনন্দ বোধ করাই উচিত। আহা, আজ কতকাল মেয়েটা শুধু তাকে একবার দেখিবার জন্য, তার দুটি কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া ছুটিয়া তার বাড়িতে গিয়াছে। বছরের পর বছর বোকার মত সে কিরকম নির্বিকারভাবে প্রভার নীরব পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল ভাবিলে ভূপেনের কান গরম হইয়া উঠে। সরমাকে বিবাহ করিবার সময় একবার তার মনেও হয় নাই, তার বৌ হওয়ার জন্য মনে মনে প্রভা ছটফট করিতেছে। ওরকম সাধারণ শ্রীহীন একটা মেয়ে যে আবার মনের মধ্যে এ ধরণের কামনা পোষণ করিতে পারে, এ ধারণাই তার ছিল না। প্রায় তিন চার বছর পরে প্রভার মনের অবস্থা সম্বন্ধে তার প্রথম সন্দেহ জাগে,—তাও প্রভার কথা তুলিয়া সরমা মাঝে মাঝে তাকে ঠাট্টা করিত বলিয়াই কথাটা তার খেয়াল হইয়াছিল। তারপরেও ব্যাপারটা গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে তার কি কম সময় লাগিয়াছে!

বুঝিয়াও যেন বুঝা যায় নাই, বিশ্বাস করিয়াও বিশ্বাস করিতে ভরসা হয় নাই। মন বড় শক্ত প্রভার, কথায় কাজে মনের ভাব সে সহজে ধরা পড়িতে দেয় না। তবে ক্রমে ক্রমে ভূপেনের নিজের দৃষ্টিশক্তি যেন তীক্ষ্ণ হইয়াছে, বোধশক্তি বাড়িয়াছে। প্রভার সম্বন্ধে যে কথাটা প্রথমে নিজের কাছেই উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা বলিয়া মনে হইত, পরে নানারকম যুক্তি দিয়া সেই কথাটাকেই সে সত্য বলিয়া দাঁড় করাইতে শিখিয়াছে। প্রভার চোখের দৃষ্টিতে নেশার অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মত একটা দুর্বোধ্য স্বপ্নময় ভাব আছে বলিয়া যেদিন প্রথম মনে হইয়াছিল, ব্যাপারটা সেদিন রীতিমত হাস্যকর ঠেকিয়াছিল ভূপেনের কাছে। নিজের ছেলেমানুষী ভাবপ্রবণতার প্রমাণ বলিয়া মনে হইয়াছিল নিজের এই আবিষ্কার। কিন্তু আজকাল প্রভার চোখের দিকে চাহিয়া প্রায়ই সে স্পষ্ট দেখিতে পায়, কুয়াশার মত ঘোলাটে কিছু প্রভার দৃষ্টিকে যেন নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছে। আর খাপছাড়া ঠেকে না। এরকম হওয়াই সঙ্গত মনে হয়। এতকাল মন যদি প্রভার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া থাকে প্রেম, চোখে তার ছাপ পড়িবে বৈকি।

হাসি থামাইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া প্রভা নামিয়া আসিল। খানিকক্ষণ একেবারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে বোধহয় ভূপেনের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটা বুঝিবার চেষ্টা করিল, তারপর হঠাৎ বসিয়া পড়িল নিজে।

'আজ আপনি আসবেন ভাবিনি।'

'কোথায় আর যাব বল? তুমি ছাড়া আমার কে আছে।'

নিজের অসহায় অবস্থাটা এমন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া ভূপেন পরম তৃপ্তি বোধ করে। অনেককাল তপস্যা করার পর ভক্তকে বর দিতে আসিয়া দেবতার কেমন লাগে ভূপেনের জানিবার কথা নয়, তবু তার মনে হইতে থাকে, সে যেন ওইরকম একটি দেবতার পদ পাইয়াছে। বরদানের ভূমিকাটিও যে বেশ লাগসই হইয়াছে প্রভার চকিত দৃষ্টিপাতে সেটুকুও সে বুঝিতে পারে। কিন্তু তারপর প্রভার মুখে যে ভয় আর ভাবনায় স্পষ্ট ছাপ পড়ে, সেটা একটু দুর্বোধ্য মনে হয় ভূপেনের।

প্রভা একটু ভাবিয়া বলে, 'আপনার কথাই সারাদিন ভাবছিলাম।'

'তা জানি।'

শুনিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া প্রভা যেন খানিকক্ষণ অবাক হইয়াই ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

'আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, আপনি কয়েকদিন কোথা থেকে ঘুরে এলে পারেন। কি আর করবেন এখানে থেকে?'

ঘুরে আসতে বলছ? তা যেতে পারি—তুমি যদি সঙ্গে যাও।

শুনিয়া প্রভা হঠাৎ হাসিয়া বলে, 'আপনি আশ্চর্য মানুষ। চা খাবেন?'

ভূপেন বলে, 'কেন খাব না?'

চা-ও খাওয়া হয়, কিছুক্ষণ গল্পগুজবও চলে। তারপর ভূপেন আবার বেড়াইতে যাওয়ার কথা তোলে। ধরা যাক ভূপেন গেল, সঙ্গে গেল ভূপেনের মা আর বোন, প্রভা কি তাদের সঙ্গে যাইতে পারে না?

'তুমি বুঝি ভাবছিলে তোমায় নিয়ে একা পালিয়ে যাবার মতলব করেছি?'

প্রভা বলে, 'না, তা ভাবিনি। কিন্তু রুগীপত্র ফেলে আমি কি ক'রে যাব? এখুনি তো আমায় উঠতে হবে—একটা ডেলিভারি কেস আছে। আপনার সঙ্গে যে দুদণ্ড গল্প করব তারও উপায় নেই।'

প্রভা ডাক্তার, রুগীপত্র ফেলিয়া ভূপেনদের সঙ্গে দেশ ভ্রমণে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, বসিয়া যে ভূপেনের সঙ্গে একটু গল্প করিবে সে সময়ও তার নাই। বাড়ি ফিরিবার পথেই ভূপেনের নিজস্ব জগতে একটা যেন ওলট-পালট হইয়া যায়। এক মুহূর্তে ভবিষ্যৎ হয় অর্থহীন, কল্পনা হয় তিতো, এমন তীব্র বিষাদ জাগে যেন কিছু পাপ করিয়াছে। এটুকু ভূপেন বোঝে যে ডেলিভারি কেসের দায়িত্ব সহজ নয়, না গিয়া প্রভার উপায় নাই, কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? যত গুরুতর কাজই তার থাক, প্রভা তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে, আমার কাজ আছে আপনি এবার যান। একথা এভাবে প্রভা যদি বলিতে পারে, এতদিন প্রভার সম্বন্ধে সে যা ভাবিয়া আসিয়াছে তা তো সত্য হইতে পারে না।

সেইদিন বাড়ির লোকে প্রথম টের পাইল, নিজের ঘরে আরাম কেদারায় চিৎ হইয়া ছেলে আর বৌ-এর শোকে ভূপেন কাঁদিতেছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, ভূপেন চোখে হাত চাপা দিয়া শুইয়া আছে। পা টিপিয়া কাছে গিয়া বৌদিদি দেখিয়া আসিল, গালে জলের স্রোতের দাগ।

তাই বটে। পুরুষ মানুষ কি আর চেঁচাইয়া কাঁদে!

বৌদির কাছে খবর পাইয়া সকলেই আসিল। চাপা আর্তনাদের কয়েকটা অদ্ভুত শব্দ কানে যাওয়ায় ভূপেন চোখ মেলিয়াই দেখে, তাকে ঘিরিয়া আপনজনের ভিড়। এতক্ষণ সে ছেলে আর বৌ-এর কথাই ভাবিতেছিল। সব মনে হইতেছিল শূন্য,

ভিতরে পাক খাইতেছিল একটা অসহায় যন্ত্রণা। চোখ দিয়া যে জল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে ভূপেন জানিতেও পারে নাই। এখন টের পাইয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ভূপেন সজল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া বাড়িতে একটা বিষম কাণ্ড বাধিয়া যায়। দিদির ফিট অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল, একটা চীৎকার করিয়া সে ঢলিয়া পড়ে। ভূপেনের ছোটবোন অনু দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া মাথাটা যার এবড়ো-খেবড়ো হইয়া গিয়াছে, খানিকক্ষণ বিস্ফোরিত চোখে দিদিকে দেখিয়া সেও মূর্ছা যায়।

বৌদিদি কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, 'কি হ'ল দ্যাখো ঠাকুরপো।'

ভূপেন শান্তভাবেই বলে, 'হবে আবার কি, সব হিস্টিরিয়া। ওদের চিকিৎসা হওয়া দরকার। প্রভাকে ডাকব ফোন ক'রে ?

'এত রাত্রে ডাকবে প্রভাকে ?'

প্রভাকে বৌদিদি পছন্দ করে না।

প্রভা সব সময়েই যেন তার সমালোচনা করে। ছেলেমেয়েদের গাদা গাদা খাওয়ানো ভাল নয়, শিশু যে সব সময় ক্ষুধায় কাঁদে তা নয়, পেটের ব্যথাতেও অনেক সময় কাঁদে, মা'র নোংরামির জন্যই অনেক সময় ছেলেমেয়েদের অসুখ হয়, এই সব। সাতটি ছেলেমেয়ে বৌদিদির, কুড়ি বাইশ বছর সে স্বামীর ঘর করিতেছে, ডাক্তারিটা পাশ করিয়াই প্রভা যেন তার চেয়ে বেশী জানে—আজ পর্যন্ত যার একটা স্বামীও জুটিল না !

মুখে জলের ছিটা দিলেই একটু পরে এরা দু'জনে উঠিয়া বসিবে, সেজন্য রাত এগারোটার সময় প্রভাকে ডাকিয়া পাঠানোর কোন অর্থই বৌদিদি বুঝিতে পারে না। তবে, সোজাসুজি বারণ করিবার সাহসও তার নাই। ক'দিন বাড়ির লোকের ব্যবহারে সে জ্বালাতন হইয়া গিয়াছে। সরমা আর নন্তুর অসুখের বাড়াবাড়ির সময় বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে ভগবানের নামে ছাড়িয়া না দিয়া তাদের দিকে একটু নজর রাখিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, ভূপেনের ছেলে আর বৌ-এর জন্য তার একটুও দরদ নাই। দু'জনে মরিয়া গেলে সে খুব কাঁদিয়াছিল, দারুণ শোকের মধ্যেও সকলে বলাবলি করিয়াছিল তার শোকের বাড়াবাড়ির কথা। ভূপেনের বৌ-এর সঙ্গে তার মনোমালিন্য ছিল বলিয়া, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে কতকগুলি ব্যাপারে ঠোকাঠুকি লাগিত বলিয়া, সে মরিয়া গেলেও যেন তার শোক হওয়া উচিত নয়। শোকের প্রথম ধাক্কায় সকলে যখন নানারকম পাগলামী আরম্ভ করিয়াছে, তখনও সে শিশুগুলিকে যত্ন করিয়াছিল। সেজন্য দিদি যে তাকে কতবার শুনাইয়াছে ঠিক নাই : বেঁচেছিস্ বড়বৌ, না ? বড়লোকের মেয়ে ছিল, সকলের আদুরে ছিল, হিংসেয় তাই জ্বলে মরতিস্—হাড়ে তোর বাতাস লেগেছে, না ?

অন্য সময় তার সম্বন্ধে এ ধরনের কথা মনে আসিলেও বাড়ির লোকে সাধারণতঃ চুপ করিয়াই থাকে, অথবা আড়ালে দু'চারজন চুপি চুপি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে ! বাড়িতে একটা অসাধারণ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার মুখ আর কারও আটক থাকে নাই, যা মনে আসিয়াছে মুখের উপর বলিয়াছে। প্রভাকে ডাকিতে বারণ করিলে ভূপেন যদি কিছু ভাবিয়া বসে, আর এখনকার মনের অবস্থায়, বলিয়া ফেলে : মেয়েদের কথা বৌদিদি গ্রাহ্য করে না, কিন্তু ভূপেন অন্যায় কিছু বলিলে বড়ই অপমান হইবে। সে অপমান সহ্য করার ক্ষমতা তার হইবে না, হয়তো চটাচটিই হইয়া যাইবে ভূপেনের সঙ্গে। এখন ভূপেনের সঙ্গে চটাচটি হওয়া উচিত হইবে না। বিবাহ করার আগে ভূপেনের সঙ্গে তার বড় ভাব ছিল। আবার ভূপেন একা মানুষ হইয়া গেল। বিবাহ

যদি আবার সে করেও,—করিবে যে তাতে অবশ্য বৌদিদির কোন সন্দেহ নাই,—দু' একটা বছর তো এমনিই কাটিয়া যাইবে। এই সময়ের মধ্যে বৌদিদির সঙ্গে আবার কি আগের মত ভাব করিবে না ভূপেন? কয়েক মাস পরে বৌদিদির বড় মেয়েটার বিবাহে কর্তব্যবোধে যতটা করুক, ভাইঝির উপর স্নেহের বশে যতটা করুক, বৌদির জন্য তার চেয়ে বেশী কিছু সে কি করিবে না?

দু'টি ননদকে মূর্ছা যাইতে দেখিয়া মনের দুর্বলতায় বৌদিদি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ভূপেনের শান্ত ভাব দেখিয়া আর প্রভাকে ডাকিবার কথা শুনিয়া চোখের পলকে সে কান্নাও বন্ধ করিয়া ফেলে, এত সব কথা তার ভাবাও হইয়া যায়। ভূপেনের পরামর্শ চাওয়ার জবাবে আমতা আমতা করিয়া চারদিক বজায় রাখিয়া পাল্টা প্রশ্ন করে। স্পষ্ট বলে না যে এতরাত্রে প্রভাকে ডাকা উচিত নয়। প্রভাকে ডাকাই যে ভাল, তাও বলে না।

কিন্তু তার কথা শুনিয়া ভূপেনকে মুখ গম্ভীর করিয়া নীরবে ভাবিতে দেখিয়া বৌদিদি একটু ভড়কাইয়া যায়। নিজের বক্তব্য আরও পরিষ্কার করিয়া বলে, 'যা, তুমি ভাল বোঝ তাই কর। আমি ওসব কি বুঝি!'

ভূপেন জিজ্ঞাসা করে, 'প্রভাকে তোমার কেমন লাগে বৌদি?'

বৌদিদি লাগসই জবাব খুঁজিতে খুঁজিতে ভূপেন আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, সেদিন আমার নামে কিসব বলছিল না তোমাদের কাছে? আমি ভীষণ শক্ত মানুষ, দয়ামায়ার ধার ধারি না এইসব?'

বৌদি বলে, 'কই না, ওসব কিছু তো বলে নি। ঠাকুরঝিদের কাছে যদি ব'লে থাকে—'

এতক্ষণে অনু উঠিয়া বসিয়াছে। ভূপেন তাড়াতাড়ি প্রভাকে ফোন করিতে নীচে চলিয়া গেল। সকলে সুস্থ হইয়া উঠিলে এতরাত্রে তাকে ফোন করার উপলক্ষ থাকিবে না।

প্রভা আসিয়া পৌঁছিতে পৌঁছিতে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। দিদি এবং অনু তখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

সারাদিন প্রভার দেহ এবং মন দুয়েরই অনেক পরিশ্রম গিয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া ঘুমানোর আয়োজন করিতে করিতে ভূপেনের জোর তাগিদে উঠিয়া আসিয়াছে। বিরক্ত হইয়া মুখ ভার করিয়া সে বলিল, 'কাল সকালে ডাকলেই পারতেন।'

ভূপেন বলিল, 'দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল কিনা—'

প্রভা বলিল, 'ওরকম যারা কথায় কথায় অজ্ঞান হয়, তাদের গায়ে বালতি বালতি জল ঢেলে দিতে হয়। আমি ওর কি চিকিৎসা করব!'

ভূপেন নীচু গলায় আদার করিয়া বলিল, 'তুমি রাগ করেছ প্রভা?'

প্রভার বোধ হয় মনে পড়িয়া গেল এই মানুষটার সম্প্রতি ছেলে আর বৌ মারা গিয়াছে। সেও এবার শান্ত গলায় বলিল, 'না, রাগ করিনি। বড় ঘুম পেয়েছে কিনা—'

'এখানে ঘুমিয়ে থাকো?'

এ প্রস্তাবে প্রভা রাজী হইল না। নিজের বিছানাটি ছাড়া আর তার ঘুম আসে না। তাছাড়া কাল ভোর হইতে না হইতে রোগী আসা আরম্ভ হইবে।

তখন ভূপেন বলিল, 'চলো তবে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

প্রভা বলিল, 'উঁহু, রাত একটার সময় আপনি আমায় অতদূরে পৌঁছে দিতে যাবেন, তার কোন মানে হয় না। ফিরতে ফিরতে আপনার আড়াইটে তিনটে বেজে যাবে।

কাল বোধহয় সারারাত ঘুমোন নি—' সঙ্গে যে দাসী আসিয়াছিল, তার সঙ্গেই প্রভা ফিরিয়া গেল।

দুই

এমনিভাবে প্রভার সঙ্গে ভূপেনের একদিনে তিনবার দেখা হইয়া গেল, ছেলে আর বৌ-এর শোকের প্রথম ধাক্কায় সে যখন কাবু হইয়া পড়িয়াছে। তারপর প্রভার সঙ্গে দু'একদিন অন্তর দেখা হইতে থাকে, দিন কাটিতে কাটিতে মাস কাটিয়া যায়। ভূপেন স্পষ্ট করিয়া প্রভাকে কিছু বলে না, ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। ভাবে কিছুদিন চুপ করিয়া থাকাই উচিত। ছেলে বৌ মারা যাওয়ার পর কিছু সময় কাটিতে না দিয়া প্রভাকে বলা সঙ্গত হইবে না এবার তুমি আমার বৌ হও প্রভা।

কেবল এইজন্যই যে ভূপেন চুপ করিয়া থাকে তা নয়। ছেলে আর বৌ-এর শোকটাই তাকে বাধা দেয়। ভূপেন কাঁদে না, কিন্তু ভাবে। প্রায় সব সময়েই ভাবে। চোখ বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে কখনও সরমাকে কখনও নন্তুকে চোখের সামনে দেখিতে পায়, ওদের চোখের মুখের হাতের পায়ে চুলের দাঁতের এক একটি বৈশিষ্ট্য হঠাৎ এক সময় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ওদের হাসি কান্নার মুখ-ভঙ্গি মনে করিতে গিয়া শব্দ পর্যন্ত শুনিতে পাইয়া দু'একবার ভূপেন চমকাইয়া পর্যন্ত ওঠে।

সরমার বাক্স আলমারী ঘাঁটিতে ভূপেনের ভাল লাগে। মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই খেলাতেই সে মাতিয়া থাকে। কত বিচিত্র কাপড় জামাই সরমার ছিল, প্রসাধনের কত বিভিন্ন সামগ্রী! গায়ে আঁটেনা এত সোনার গয়না ছিল, তবু রাশি রাশি কাঁচের চুড়ি জমা করা আছে দেখিয়া ভূপেন যেন আশ্চর্য হইয়া যায়, নতুন করিয়া আজ যেন সে বুঝিতে পারে কি ছেলেমানুষই ছিল তার সরমা। দু'টি দামী কাপড়ের ভাঁজে খানিকটা আচার পাওয়া যায়। সরমার চুরি করিয়া আচার খাওয়ার সখ ছিল, কবে ধরা পড়িবার ভয়ে এখানে আচার গুঁজিয়া দিয়াছিল, তারপর আর মনে ছিল না! তিন শিশি ওষুধ একটি বাক্সের তলে লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়। মাস ছয়েক আগে সরমাকে শরীর ভাল করার জন্য ওষুধ দেওয়া হইয়াছিল। এতদিন পরে আজ ভূপেন টের পায় ওষুধ সরমা খাইত না, তাকে ফাঁকি দিয়াছিল। দুষ্টুমিও কি কম জানিত তার সরমা!

অজস্র স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে সরমা তার স্মৃতি আর পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। বাক্সটি খোলামাত্র যে গন্ধ নাকে লাগে তাও যেন সরমারই একটা ঘনিষ্ঠ স্থায়ী অস্তিত্ব। ভূপেন জোরে শ্বাস টানে, সরমার প্রত্যেকটি দরকারী জিনিস হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দ্যাখে। কিছুক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে, কেমন যেন একটা নেশা হইয়াছে।

সরমার স্মৃতিচিহ্নের বেলা এরকম হয়, নন্তুর স্মৃতিচিহ্নের ব্যাপারে অন্য রকম। সরমার জামা কাপড়ের সঙ্গেই নন্তুর কত পোষাক আছে, বাক্সে আলমারীতে তার কত খেলনা, ঘরেও কত কি জমা করা আছে এখানে ওখানে। কিন্তু নন্তুর কোন জিনিস যেন সহজে ভূপেনের চোখেই পড়িতে চায় না। দেখিবার বা ঘাঁটিবার বিশেষ আগ্রহও তার নাই। কখনও যদি খেয়াল হয় যে ঘরের কোণের ছোট টেবিলটার উপকার ছবির

বই-এর গাদাটি ছিল নন্তুর, ভূপেনের বুকের মধ্যে হুহু করিতে থাকে। এ যে নন্তুর স্মৃতিচিহ্ন, আজ নন্তু নাই বলিয়া কতকগুলি আস্ত আর মলাটছেঁড়া নতুন ও পুরাতন শিশুপাঠ্য বই দেখিয়া নন্তুর কথা মনে করিয়া তার কষ্ট হইতেছে এসব ভূপেন ভাবে না, ছেঁড়া মলাট দেখিয়া তার মনে পড়িয়া যায় কি দুরন্ত ছেলেই ছিল তার নন্তু, একটা প্রায় অচিন্তনীয় ও অসহ্য যন্ত্রণা তার ভিতরে মোচড় দিতে থাকে।

তবে বেশীক্ষণের জন্যে নয়। সরমার কথা মনে পড়িয়া যায়, মনে পড়িয়া যায় যে তার একটি ছেলে ছিল সে ছেলেটি মরিয়া গিয়াছে এবং এইসব মনে পড়িয়া যে গভীর শোক জাগে, তার নীচে নন্তুর সম্বন্ধে মনের দুর্বোধ্য ও যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়াটি চাপা পড়িয়া যায়। শ্মশানে ভূতের ভয়ে যার মূর্ছার উপক্রম হয়, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাইয়া আসিয়া সে নিজের ঘরে বসিয়া ভূতের গল্প পড়িয়া শিহরিয়া উঠিতে পারে। ভূপেনও কতকটা সেই রকম করে।

একদিন প্রভা বলিল, 'আপনি নাকি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে কাঁদাকাটা করেন, বৌদির কাছে শুনলাম?'

ভূপেন বলিল, 'না কাঁদাকাটা করব কেন? হৈ চৈ গোলমাল ভাল লাগে না, তাই দরজা বন্ধ ক'রে বসে থাকি?'

'চুপচাপ বসে থাকেন?'

'ঠিক চুপচাপ থাকি না—'

'আরও একমাসের ছুটি নেবেন শুনলাম? কোথাও যদি না-ই যান, ঘরের কোণে মন খারাপ ক'রে বসে থাকার জন্য ছুটি নিয়ে লাভ! তার চেয়ে কাজকর্মে মেতে থাকা ঢের ভাল।'

ভূপেন একটু ভাবিয়া বলিল, 'এক মাস নয়, তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছি। এ তিন মাসের মাইনে পাব। তারপর তিন মাস আদ্দেক মাইনের ছুটি নেব, তারপর ছ'মাস বিনে মাইনেয়।'

প্রভা আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'কেন?'

কথা হইতেছিল প্রভাদের বাড়িতে, প্রভার ঘরে, দুপুরবেলা। সকালে প্রভা ভূপেনদের বাড়ি গিয়াছিল, ভূপেন বাড়ি ছিল না। ভূপেন তাই দুপুরবেলাই দেখা করিতে আসিয়াছে। দেরী করিয়া আসিলে অবহেলা মনে করিয়া প্রভার মনে যদি কষ্ট হয়? দুপুরবেলা এ সময়টা প্রভার একটু ঘুমানো অভ্যাস। চোখ দু'টি তার ঝিমাইয়া আসিয়াছিল। বিস্মিত হইলে প্রভা মাথাটা একটু পিছন দিকে ঠেলিয়া ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া আড় চোখে তাকায়, সেই সঙ্গে শরীরটাও একটু বিশেষ ভঙ্গিতে কাত হইয়া পড়ে। এটা তার চিরদিনের অভ্যাস। ভূপেনের অনেকবার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু কোনদিন চাহিয়া দেখে নাই। আজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিশেষভাবে দেখিতে দেখিতে প্রভার প্রশ্নের জবাব দিতে সে ভুলিয়া গেল।

প্রভার বিস্ময় কমিয়া গেল। অস্বস্তি বোধ করিয়া সে আবার বলিল, 'এতদিনের ছুটি নেবেন কেন?'

তখন ভূপেন বলিল, 'বছরখানেক না কাটলে তো আর আমাদের বিয়েটা হ'তে পারবে না। আমার যা মনের অবস্থা তাতে আপিসের কাজ আমার দ্বারা হবে না প্রভা। তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু নয় প্রভা, তোমার জন্যই মনটা আমার বেশী অস্থির হয়ে পড়েছে। সাত আট বছর তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি ভাবলেই—'

প্রভার চোখ মুখে এবং দেহে আবার বিস্ময়ের ভঙ্গি ফুটিয়া ওঠে। প্রভাকে কি

বলিবে ভূপেন অনেকবার ভাবিয়া রাখিয়াছিল, এতদিনে মুখস্ত হইয়া যাওয়ার কথা। আজ যে বলিবে এটা অবশ্য ঠিক ছিল না, তবু ভাবিয়া রাখা কথাগুলির বদলে এসব কথা বলিয়া ফেলিল কেন ভূপেন বুঝিতে পারে না। শান্তভাবে সরল ভাষায় প্রভাকে জানানো যে, সে তাকে বহুদিন হইতে ভালবাসে এবং তেমনি সহজ শান্তভাবে জীবনটা একসঙ্গে কাটানোর জন্য তার সম্মতি চাওয়া, এর মধ্যে সাত আট বছর প্রভার মনে কষ্ট দেওয়ার প্রশ্ন তো নাই !

বিব্রতভাবে ভূপেন আবার বলিল, 'আমি বলছিলাম কি, লোকে যা ভাবে ভাবুক. আর মাসখানেকের মধ্যে আমরা বিয়েটা সেরে ফেলি এসো। এতদিন উপায় ছিল না তাই কোন রকমে কাটিয়েছি, এখন আর তোমায় ছেড়ে একটা দিনও থাকতে পারছি না প্রভা।'

প্রভা নীরবে উঠিয়া জানালার কাছে সরিয়া গেল। জানালায় কিছুই দেখিবার নাই. কয়েক হাত তফাতেই পাশের বাড়ির দেয়াল। মাঝখানে ইঁটপাতা সরু গলি. পায়ে পায়ে ইঁটগুলি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রভার মাথার পিছনে আলগা অসম্পূর্ণ খোঁপা দেখিতে দেখিতে ভূপেনের হঠাৎ আঘাত পাওয়ার মত তীব্র লজ্জা বোধ হয়। কেবল লজ্জা নয়, ঘুম বা নেশার ঘোর কাটিয়া গিয়া সচেতন হইয়া উঠিবার মত একটা অনুভূতি এমন স্পষ্টভাবে সে অনুভব করিতে আরম্ভ করে যে তার মনে হয় অনেকগুলি দিন একটা অদ্ভুত আত্মবিস্মৃতির মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবার পর এই মুহূর্তে সত্যই বুঝি তার চেতনা হইয়াছে। এই কয়েকদিন, সরমা ও নন্তুর মৃত্যুর পরের দিনগুলি, কিছুই সে সজ্ঞানে করে নাই।

কি ভাবিতেছে প্রভা? বুড়ো বয়সে বৌ মরা মাত্র আবার বিবাহ করায় তাকে ক্ষেপিয়া উঠিতে দেখিয়া হয়তো সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। হয়তো বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছে না, স্ত্রী-পুত্রের জন্য যার চোখের জল শুকানোর সময় পায় নাই সে কেমন করিয়া এত সহজে আরেকজনের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় আত্মবিস্মৃতির মুহূর্তে কথাগুলি সে বলিয়া ফেলে নাই, প্রভা তা জানে। সেরকম কোন ভূমিকায় গড়িয়া ওঠে নাই। আজও নয়, আগেও নয়। প্রৌঢ় বয়সের স্বাভাবিক ধীরতার সঙ্গে প্রায় আবেগহীন ভাষায় সে ঘোষণা করিয়াছে তার প্রেম প্রয়োজনের প্রস্তাব। তার প্রেম ও তার প্রয়োজন? প্রভাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া সে যেভাবে প্রভাকে বলিত, তুমি না গেলে কিন্তু চলিবে না প্রভা, সেইভাবে সে তাকে জানাইয়া দিয়াছে তাকে ছাড়িয়া একটা দিনও যে থাকিতে পারিতেছে না। গলাটা একটু কাঁপিয়া পর্যন্ত যায় নাই।

বিয়াল্লিশ বছর বয়স হইয়াছে। বিয়াল্লিশ বছর! অথবা তেতাল্লিশ? তেতাল্লিশ হওয়াও তো আশ্চর্য নয়। ভূপেন আশ্চর্য হইয়া যায়। নিজের বয়স সম্বন্ধে তার সঠিক ধারণা নাই, মনে মনে একটা আন্দাজী হিসাব রাখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছে? বছরের কি এত ছড়াছড়ি, জীবনে যে একটা হিসাব রাখিতেও এত অবহেলা?

প্রভার কত বয়স হইয়াছে?

সরমার বয়সটা মনে আছে। আর নন্তুর। বিবাহের সময় সরমার বয়স ছিল সতের, দশ বছর পরে সে মারা গিয়াছে। নন্তু বাঁচিয়া থাকিলে এই ফাল্গুনে তার ন'বছর বয়স হইত।

সরমার চেয়ে প্রভা তিন চার বছরের বড়। প্রভার তবে ত্রিশের কাছে বয়স পৌঁছিয়াছে! তাই বটে। একটু তাই মোটা হইয়া পড়িয়াছে প্রভা আজকাল, একটু

শিথিল হইয়া পড়িয়াছে তার দেহ তার মন, কথা আর চালচলনে আসিয়াছে গাম্ভীর্য ! একদিন, অনেকদিন আগে, সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া প্রভাকে নামিতে দেখিয়া তার মন ভুলিয়াছিল, মনে হইয়াছিল তার নিজের জীবনের ছন্দ ও তরঙ্গ যেন রূপ ধরিয়া নীচে নামিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে। আজ সমতল মেঝেতে পা ফেলিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকার সময় প্রভাকে একটু মোটা মনে হইতেছে বটে।

বাহিরের সঙ্গে ভিতরের প্রভার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কেবল তার নিজের পরিবর্তন নয়। ভূপেন ভাবেঃ এতগুলি বছর ধরিয়া চোখের সামনে ধীরে ধীরে প্রভার এই পরিবর্তন না ঘটিয়া যদি চোখের আড়ালে ঘটিত? আজ হয়তো প্রভাকে এত সহজে মনের কথা না বলিতে পারিত না। ইচ্ছা থাকিলেও সাহস হয়তো হইত না।

প্রভা ফিরিয়া আসিয়া সামনে একটা চেয়ারে বসিল। তার মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই ভূপেনের আকস্মিক আত্মপ্রকাশ তাকে কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত করিয়াছে। তার শান্ত নির্বিকার মুখের ভাব দেখিয়া ভূপেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

'এখন ওসব আলোচনা থাক, ভূপেনবাবু।'

কালও প্রভা তাকে ভূপেনবাবু বলিয়াছে, আট ন'বছর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছে। অনেকদিন আগেই হয়তো প্রভা আপনি ছাড়িয়া তুমিতে নামিয়া আসিতে পারিত, শুধু চলিয়া আসিতেছিল বলিয়াই অভ্যাসের মত ভূপেনবাবু বলাটাই বজায় থাকিয়া গিয়াছে। আজ সম্বোধনটা ভূপেনের কানে বিঁধিবার কোন কারণ ছিল না। অবুঝ শিশুর মত ভূপেন তবু এই অর্থহীন শব্দকে যাচিয়া সংকেতের অর্থ দিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।

'কেন।'

'আপনার যে রকম মানসিক অবস্থা—'

'আমার মানসিক অবস্থা ঠিক আছে!'

'তাই কি থাকতে পারে? বৌদি আর নন্তুর জন্য আপনার মন—'

'ওদের কথা বাদ দাও প্রভা। ওদের আমি ভুলতে চাই।'

ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? ভুলবার কথা হলে ভুলবার অন্য চেষ্টা করতে হয় না। আপনা থেকেই মানুষ ভুলে যায়। আপনি আজ যা বললেন, কেবল আমার জন্য বলেননি। তা হলে এত শীগগির বলতে পারতেন না। ওদের জন্য আপনার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। সে কষ্ট সইতে পারছেন না বলেই এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি ভাবছেন অন্যরকম কিন্তু আপনার মনের তলে তাগিদ আছে, যে কোন উপায়ে হোক কষ্টটা যাতে সহ্যের সীমায় আনা যায়।'

ভূপেন আহত বিস্ময়ে প্রভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কোনদিন সে প্রভাকে মুখে কিছু বলে নাই, অন্যভাবে জানানোর কোন চেষ্টাও করে নাই, তবু এতকাল তার ধারণা ছিল প্রভা সব জানে। একটা অনির্দিষ্ট সুখের মত এই ধারণা তার মনে দিনের পর দিন স্থান পাইয়া আসিয়াছে। আর কিছু না হোক, প্রভা সব জানে। কতদিন প্রভার সঙ্গে নন্তুর অসুখের কথা আলোচনা করিতে করিতে দুজনে তারা নির্বাক হইয়া গিয়াছে, প্রভার ক্লিষ্ট মুখে গভীর শ্রান্তির ছাপ দেখিয়া সে কি করিবে ভাবিয়া পায় নাই। তারপর প্রভার মুখে ধীরে ধীরে শান্তির ও তৃপ্তির লাবণ্য ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়া নিজেও যে কি গভীর স্বস্তি বোধ করিয়াছে বলিবার নয়। ভাবিয়াছে, হতাশার মধ্যে প্রভা এতক্ষণে সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল, এতক্ষণে তার মনে পড়িয়া গেল যে সে একা নয়, সামনে যে মানুষটা বসিয়া আছে, সেও তাকে চায়।

আজ প্রভা তার ব্যাকুলতার মানে করিতেছে অন্য রকম। স্ত্রী পুত্রের শোকে তার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে তাই সে তাকে চায়, শোকের অসহ্য জ্বালার মলম হিসাবে। আট বছর ধরিয়া তার মনকে জানিয়ে রাখিলে তার কথার এ ব্যাখ্যা করা তো প্রভার পক্ষে সম্ভব হইত না।

প্রভা আবার বলিল, 'ছুটি নেবেন বলেছিলেন, তাই করুন আপনি। ছুটি নিয়ে ঘুরে আসুন বাইরে থেকে। মন শান্ত হয়ে যাবে।'

'মন তো বিশেষ অশান্ত মনে হচ্ছে না প্রভা।'

'নিজেই তো বললেন।'

'তুমি যা বলছ আমি তা বলিনি।'

'আপনি কি বলতে চান বৌদি আর নন্তুর জন্য আপনার একটুও কষ্ট হয়নি? ওদের ভুলে গেছেন?'

'অমন কথা বলতে চাইব কেন?'

'তাইতো মানে দাঁড়ায় আপনার ব্যবহারের। হয় ওদের শোকে দিশেহারা হয়ে গেছেন, নয় ওদের মনে নেই। আর কি মানে হতে পারে বলুন?'

এতদিন পরে প্রভাকে মানে বুঝাইয়া বলিতে হইবে!

'তুমি জান না মানে?'

'ভেবে তো পাচ্ছি না।'

অভিভূতের মত খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ভূপেন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। শোকে দুঃখে ভরা জীবনে তার আজ প্রথম এক যন্ত্রণাদায়ক ধাঁধাঁ আসিয়াছে। মিথ্যে আর ভুলে ভরা এক অবিশ্বাস্য দুর্বোধ্য অভিজ্ঞতা।

যাওয়ার সময় প্রভা মৃদুস্বরে বলিল, 'রাগ করলেন?'

ভূপেন বলিল, 'না। রাগ করার কি আছে?'

তিন

প্রভার উপর রাগ করিয়াই ভূপেন ছুটির দরখাস্ত বাতিল করিয়া দিল। মন অশান্ত বলিয়া সে দিশেহারা হইয়া গিয়াছে, পাগলামি করিয়াছে? প্রভা বুঝুক, মন অশান্ত হইলেও সে দিশেহারা হয় না, পাগলামি করে না। দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার জন্য তাকে ছুটি লইয়া দূরে পলাইয়া যাইতে হয় না।

সরমা আর নন্তুর জন্য শোকের তীব্রতা সাধারণ নিয়মেই কমিতে থাকে। কেবল জাগিয়া থাকে একটা গভীর অভাব বোধ! আঘাতের বেদনা দিয়া সে অভাব বোধকে আর অবশ করিয়া রাখা যায় না, বৈরাগ্যের উদাসীনতা দিয়া অবহেলাও করা যায় না। রীতিমত অসন্তোষ লইয়া দিন কাটাতে হয়। ফাঁকার মর্যাদাহানি ঘটে এবং অপবাদ জোটে ফাঁকির: প্রথম যৌবনের কাব্যাস্বাদনাকে মহাজনব্রতী—কম বেশী যে ব্রত সকলেরই পালনীয়—যেমন গাল দেয়।

স্নেহ করার সঙ্গে সরমাকে ভূপেন শ্রদ্ধা করিত, মনে মনে তাকে একটু ভয় করার অভ্যাসও বুঝি তার জন্মিয়া গিয়াছিল? তার এই বিস্ময়কর মানসিক প্রক্রিয়ার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা কঠিন।

প্রভাকে পাইয়া জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের বাধা ছিল সরমা। সাত বছর ধরিয়া সে জানিয়া রাখিয়াছিল, সরমার জন্যই প্রভার সঙ্গে শুধু ভদ্র ব্যবহারের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া তাকে বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে। তবু কোনদিন সে সরমার উপর বিদ্বেষ অনুভব করে নাই। বরং সর্বদা সরমার কাছেই নিজেকে তার অপরাধী মনে হইয়াছে। সরমার জন্য বঞ্চিত জীবনযাপন করিতে হইবে বলিয়া না হোক, তার কাছে এই অপরাধের অনুভূতিতেই ভূপেনের মনে বিদ্রোহ জাগা উচিত ছিল, কারণ, মানুষের মন আত্মপীড়নের উপলক্ষকে ঘৃণা করে। কিন্তু ভূপেনের মনে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে বিপরীত, সরমার জন্য সে বোধ করিয়াছে মমতা। কারণটা বোধহয় এই যে চিরদিন সে বিশ্বাস করিয়াছে সরমাকে কিছুদিন সত্যসত্যই সে ভালবাসিয়াছিল এবং সরমা তাকে সর্বদা ভালবাসে, তার মনটাও সরমার সম্পত্তি, প্রভাকে দান করার কোন অধিকার তার নাই। সে প্রভাকে চায় জানিতে পারিলে, বেচারী সরমা মনের দুঃখেই মরিয়া যাইবে, এই ছিল ভূপেনের ধারণা। অনেক সময় সে সরমার সেই মর্মাহত অবস্থা কল্পনা করিত আর সহানুভূতি ও মমতায় সে নিজেই হইয়া পড়িত কাতর। সরমা যে অসুখী ছিল তা নয়, কিন্তু নিজের এই কল্পনা ভূপেনের মনে তাকে করিয়া রাখিত বিষাদময়ী।

সাধারণ জীবনের খুঁটিনাটি সুখ সুবিধা ও অভ্যাসের ব্যতিক্রমে বিরক্তি বোধ করিবার মত মানসিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে ভূপেন অনুভব করিতে লাগিল, কতদিকে কতভাবে সরমার জীবনের সঙ্গে জীবনটা তার জড়াইয়া গিয়াছিল।

জীবনে তার প্রথমে আসিয়াছিল সরমা, তারপর মনে আসিয়াছিল প্রভা। তারপরেও সরমার সঙ্গেই তার জীবন কাটিয়াছে বছরের পর বছর, প্রভাকে চাহিয়াছে মনে মনে। আজও সে প্রভাকে চায় কিন্তু সরমাকে ছাড়া কি করিয়া তার দিন কাটিবে তাও সে ভাবিয়া পাইতেছে না! সরমার সেবা, সংসারের ছোট বড় ব্যাপারে সরমার সঙ্গে পরামর্শ, সম্মুখে অথবা আড়ালে সরমার উপলব্ধ উপস্থিতি, এ সবও যে তার বাঁচিয়া থাকার জন্য এত বেশী প্রয়োজনীয় ভূপেন তা জানিত না। সারাটি সন্ধ্যা প্রভাকে ঘিরিয়া মনে মনে স্বপ্ন রচনা করিয়া শুইতে গেলে আজও তার সরমার অভাবেই বিছানা খালি মনে হয়, মাঝরাত্রে ঘুম তার ভাঙ্গে সরমাকে চাহিয়া। ভূপেনের গভীর সংশয় জাগে। মাঝে মাঝে মনে হয় প্রভাকে কাছে না পাইলেও তাকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা ও কামনার জাল বুনিতে বুনিতে দিন যদি বা কাটানো চলে, বাস্তব জীবনে সরমার অভাব সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রভাকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা ও কামনার জাল বুনিবার দিনও তার শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রভা তার স্বপ্ন জানে না, মানে না। স্ত্রী পুত্রের জন্য নিজের ও বাড়ির মানুষের কান্নার দিনগুলি কাটিবার আগেই তাকে লইয়া নূতন জীবন সুরু করিবার প্রস্তাব শুনিয়াই প্রভা চমকাইয়া গিয়াছে, ধরিয়া লইয়াছে এটা এক শোকার্ত মানুষের পাগলামি।

কথাটা ভাবিতে গেলেও ভূপেনের মাথা ঘুরিয়া যায়। প্রভা তাকে ভালবাসে! সাত আট বছর একটা ভুল ধারণা সে পোষণ করিয়া আসিয়াছে, একি সম্ভব হয়? দিনের পর দিন কত ঘনিষ্ঠভাবে তারা মেলামেশা করিয়াছে তবু ভুল ধরা পড়ে নাই।

এই চিন্তার জ্বালার সঙ্গে ভূপেন অনুভব করে, বন্ধন আলগা হইয়া গিয়াছে। বাহিরে থাকিলে বাড়ি ফিরিবার তাগিদ আগেও ছিল না, যেখানে খুসী যাওয়ার বাধাও ছিল না। শুধু মনে পড়িত বাড়িতে সরমা নন্তু, এই দু'জন আপনার জন আছে—

নিজের ঘরে একটু একা থাকিবার জন্য মনটা ছটফট করিবার সময়েও যাদের খুসীমত কাছে আসিবার ও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অধিকার ছিল। মনোযোগ দাবী করিবার এখন কেউ নাই, কিছুই নাই! জীবনের যে অংশটুকু পরাধীন ছিল, তাও স্বাধীনতা পাইয়াছে।

এই মুক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া, সরমা আর নন্তুর চিন্তা ঠাণ্ডা হাওয়ার আগেই প্রভার কাছে তার বিবাহের প্রস্তাব। বারুদের মত এই একটিমাত্র প্রতিক্রিয়ায় মুক্তির উচ্ছ্বাস উন্মাদনা যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। বন্ধন নাই, এ অনুভূতিও অভাব বোধের মত ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।

একদিন দু'টি পুরাণো বন্ধু বহুকাল পরে ভূপেনকে দুঃখের জগতে দুঃখের জীবনে একটি আনন্দ করার আহ্বান জানায়, বলে, এখন তো বাইরে রাত কাটাতে বাধা নেই, এসো না?'

দু'জনেই সংসারী, ধীর হিসাবী মানুষ, একজন সম্প্রতি মেয়ের বিবাহ দিয়া শ্বশুর হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ সংসারে নিখুঁত গাহর্স্থ্য জীবন তারা যাপন করে। চর্বিস্নিগ্ধ দেহে, বেশভূষা চালচলনে উগ্র আমোদ-প্রমোদের পিপাসার ইঙ্গিত বা অপচয়ের ছাপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

'এখনো ওসব আছে নাকি তোমাদের?'

অজিত একটি ইনসুরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার, ভূপেনের সঙ্গে এককালে তারই বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল সবচেয়ে জোরালো। হতাশার স্তিমিত হাসি হাসিয়া সে বলে, 'মাঝে মাঝে—মাসে দু'তিন রাতের বেশী হয় না! আগের সেদিন কি আর আছে ভাই, বড় একঘেয়ে লাগে, মাঝে মাঝে তাই একটু—।

উৎসাহ জাগে না! ঝড়ের রাত্রির মত প্রথম যৌবনে কয়েকটি ফুর্তির রাত্রি আসিয়াছিল, অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। রজনীব্যাপী বেপরোয়া উল্লাসের চেয়ে রাত্রিশেষের অবসাদের স্মৃতি মনকে আজ বিষন্ন করিয়া দেয়। কতকটা অনাবশ্যক অপ্রিয় মুক্তির আরেকটা বড় রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে সে রাজী হয়, অনিচ্ছার সঙ্গে।

সন্ধ্যার পর দোকানে মদ সাজানো ঘরে ঢুকিয়াই মন তার আরও দমিয়া যায়, গেলাসে প্রথম চুমুক দিবার সময় আতঙ্ক জাগে, তিনটি স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য ভিতরের অমর অনাহত লাজুক তরুণটিকে পীড়ন করে, জীবনের সময় ও জীবনীশক্তির স্বার্থপর সতর্ক প্রহরীর মত নিজেই সে এক মুহূর্তে সময় ও একবিন্দু শক্তির অসার্থক অপচয়ের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নিজেকে সাবধান করিয়া দিতে থাকে। মাঝরাত্রে যখন পা টলিতেছে, বিশ্বজগৎ হইয়া গিয়াছে ফেণা আর বুদবুদ, তখনো নিজের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া চলিতে থাকে যে, লাভ কি? আর আপশোষ করিতে হয় যে, হায়, নিজেকে ভুলিবার এত আয়োজনও যদি ব্যর্থ হইল, তবে আর বাঁচা কেন?

শশীতারা তীক্ষ্ন গলায় গান ধরে,—গানের ওপর হুমড়ি খেয়ে ভিরমি গেল সে! সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু চোখ ঠারে। এক রাত্রির জন্য ভাড়া করা সে চোখের ইসারায় সাড়া দেওয়ার জন্য যেন ভিরমি লাগিয়া ভূপেন পড়িয়া যায়। শশীতারার গায়ে নয়, তাকিয়ার উপর। অভ্যাস নাই, বেহিসেবী মদ গিলিতে বন্ধুরা অনেক বারন করিয়াছিল। অচেতন ভূপেনকে উদ্ভট ভঙ্গিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তারা সগর্বে ভাবে, আমরা ওর মত নই, আমাদের মাত্রা জ্ঞান আছে, ফুর্তি করতে বসেও আমরা

সংযম হারাই না। একটু রাগও তাদের হয়। বড় একঘেয়ে জীবন, ফুর্তি কোনদিন জমে না, ভূপেন সঙ্গে থাকায় আশা করিয়াছিল হয়তো আজ জমিবে। রাত্রির পর রাত্রি বৃথা গিয়াছে, আরেকটা রাত্রি আজ ব্যর্থ হইয়া গেল। এখন আবার অন্য একটি রাত্রির ভরসায় বুক বাঁধিতে হইবে।

স্বর্ণ মোটাসোটা মানুষ, একবার সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই তার হাঁপ ধরিয়া যায়। কাজ করার বদলে সে করে সংসার পরিচালনা। তার মনটা ভাল, মাথায় বুদ্ধি আছে, স্বভাবটি মিশুক ও মিষ্টি। সরমাকে সেও স্নেহ করিত। সরমার জন্য মন কেমন করার সঙ্গে ভূপেনকে সহানুভূতি দেওয়ার জন্য উদ্যত হইয়া থাকিয়াও সুযোগ না পাইয়া সে বড় দমিয়া গিয়াছিল। তারপর ভূপেন এইসব কাণ্ডকারখানা সুরু করিয়া দেওয়ায় ভয়ে ভাবনায় সে যেন দিশেহারা হইয়া গেল।

কেবল ভূপেনের জন্য নয়, সাংসারকে স্বর্ণ ভালবাসে, তার অখণ্ড নিয়মানুবর্তী সুখের সংসার। সরমা এ সংসারের একটা দিক ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মরণের বিরুদ্ধে তো নালিশ নাই। সরমার মত আরেকজনকে আনিয়া সে ভাঙ্গন জোড়া দেওয়ার আশা ইতিমধ্যেই স্বর্ণের মনে উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে কিছুকাল শুধু সমবেদনা জানাইয়া তারপর ধীরে ধীরে নূতনভাবে জীবন আরম্ভ করিবার উৎসাহ জাগাইয়া তুলিবে, এই ছিল স্বর্ণের পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে একদিন কথায় কথায় সে ভূপেনকে বলিয়াছে: বুড়ো হয়েছ বলো না ঠাকুরপো। বিয়াল্লিশ বছর এমন কি বয়স মানুষের!

সরমার পরিবর্তে আরেকজনকে আনা যায় কিন্তু ভূপেন যদি নিজের সঙ্গে সংসারকেও ধ্বংস করিতে বসে, তবে তো কোন উপায় থাকিবে না।

উপেনের উপার্জন কম, কোন মাসে সে সংসারে সামান্য খরচ দেয়, কোন মাসে দেয় না। সেজন্য কিছুই আসিয়া যায় নাই। সরমা কোনদিন স্বর্ণকে তার গৃহিণীর আসন হইতে সরাইয়া নিজে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করে নাই। কেবল ভূপেনের সেবা আর সুখসুবিধার দায়িত্বটা সে নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছিল, তাও স্বর্ণের প্রতিনিধির মত স্বাধীনভাবে নয়। সমগ্রভাবে সংসারের ভার ছিল স্বর্ণের। টাকার প্রশ্ন আজও উঠিবে না, স্বর্ণ জানে। যার টাকাতেই সংসার চলুক, তাকে ছাড়া সংসার চলিবে না। নিজের কর্তৃত্ব করার সাধ মিটাইতে ভূপেনের বড় ভাইয়ের স্ত্রী হওয়ার অধিকার খাটাইয়া গায়ের জোরে সে সংসারের গৃহিণীপদ অধিকার করে নাই, সংসার গড়িবার ও চালাইবার ভারটা আপনা হইতে তার জুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূপেন যদি বিগড়াইয়া যায়, সংসারে যদি তার মন না থাকে, সংসার তো তবে আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে, দেখা দিবে অভাব, বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি।

ভয়ে ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া একদিন সে প্রভার বাড়ি গেল। প্রভাকে সে তেমন পছন্দ করে না, ভূপেনের সঙ্গে তার মেলামেশাকে সে কোনদিন ভাল চোখে দেখিতে পারে নাই। স্পষ্ট কিছু মনে না হইলেও মনটা তার চিরদিন খুঁত খুঁত করিয়াছে। কিন্তু এই বিপদের সময় অত ভাবিলে চলিবে কেন।

সমস্ত শুনিয়া প্রভা বলিল, 'কি আশ্চর্য ব্যাপার! মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে ভূপেনবাবুর। এই বয়সে এ সব কি!'

স্বর্ণ বলিল, 'বয়স আর এমন কি বেশী?'

প্রভা মুখ ভার করিয়া বলিল, 'তা বৈ কি, দ্যাওরটি আপনার এখনো ছেলেমানুষ আছে।'

স্বর্ণ বলিল, হঠাৎ ঘা খেলে মানুষের এরকম হয় ভাই। কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যায়, কেউ মদ ধরে। এখন ঝোঁকটা কেটে গেলে বাঁচি। আমার কিছু বলতে তো সাহস হয় না, তুমি যদি একটু চেষ্টা কর, সামলে যেতে পারে।'

স্পষ্টভাবে স্বর্ণের এ অনুরোধ জানাইবার প্রয়োজন ছিল না, প্রভাও সেই কথাই ভাবিতেছিল। এসব ব্যাপারে সে ভাল বুঝিতে পারে না, মানুষের বেহিসাবী উন্মাদনা, আবেগের অসংযম। হিস্টিরিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় আছে, অনেকের চিকিৎসাও করিয়াছে। ভূপেন সত্যসত্যই পাগল হইয়া গেলে সে তার মানে বুঝিতে পারিত, হয়তো চিকিৎসার ব্যবস্থায় সাহায্যও করিতে পারিত। একজন ধীর স্থির শান্ত মানুষের মধ্যে এসব পাগলামি কি করিয়া আসে কে জানে !

মাঝখানে ভূপেনের সঙ্গে বার দুই তার দেখা হইয়াছে, ভূপেন সহজভাবেই তার সঙ্গে কথা বলিয়াছে, ভিতরে তার কি চলিতেছে কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রভার তাও ভাল লাগে নাই। সে আশা করিয়াছিল, তার সেদিনকার খাপছাড়া প্রস্তাব সম্বন্ধে আবার সে কথা তুলিবে—বিশ বছরের ভাবুক ছেলের মত উচ্ছ্বাসের আমদানি না করিয়া সহজভাবে আলোচনা করিবে ও বিষয়ে। একটা বুঝাপড়ার জন্য প্রভা সত্যসত্যই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ভূপেনের সঙ্গে কখনো কোন বিষয়ে তার মনোমালিন্য হয় নাই, তাদের সম্পর্কে কোনদিন এতটুকু ভুল বোঝার স্থান ছিল না।

জীবনে অনেক রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রভা সঞ্চয় করিয়াছে, তার মধ্যে সবচেয়ে অভিনব ভূপেনের সঙ্গে দিনের পর দিন সহজ ও গভীর অন্তরঙ্গতা বজায় রাখিয়া চলিবার অভিজ্ঞতা। মানুষের অন্ধ স্বার্থপরতা আর অফুরন্ত দাবীর সঙ্গে তো ভালোভাবেই পরিচয় ছিল প্রভার, ভূপেন কোনদিন অন্যমনেও তার কাছে মেলামেশার বেশী কিছু চাহিবে না, প্রথমে একথা তার কল্পনাতেও ছিল না। কল্পনা করিতেও চায় নাই। একটু অধীরতার সঙ্গে অন্য কল্পনাই বরং সে আরম্ভ করিয়াছিল, কবে কথা বলিতে বলিতে ভূপেন তার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া নিবে। তারপর দিন সপ্তাহ মাস কাটিয়া গিয়াছিল, মাঝে মাঝে ভূপেনের চোখে সে দেখিয়াছিল ক্ষুধা আর কাতরতা, কিন্তু কথায় সে কিছু বলে নাই, ব্যবহারে কিছু বুঝিতে দেয় নাই। তখনও প্রভা বিশ্বাস করিতে পারে নাই, তাদের সম্পর্কে এই সীমা বজায় রাখিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে ভূপেন প্রস্তুত হইয়াছে, মানুষের পক্ষে সে সংযম সম্ভব। পুরুষ অবুঝ, খেয়ালী তাদের প্রকৃতি, অস্থির তাদের অগভীর সংকীর্ণ চিত্ত, দুদিনের বেশী কামনাকে তারা চাপিয়া রাখিতে পারে না। প্রভা তখন জানিত না ভূপেনের দিকে আত্মসংযমের প্রশ্ন ছিল না, কারণ আত্মহারা হওয়ার প্রেরণাই তার মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। প্রভাকে সে পাইবে না, যতদিন সরমা বাঁচিয়া আছে প্রভাকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখাও অর্থহীন, এই ছিল তার কাছে চরম সত্য। এবং এই সত্যকে সে মানিয়া লইয়াছিল। মেলামেশায় পাছে বাধা সৃষ্টি হয়, প্রভা পাছে দূরে সরিয়া যায়, এই ছিল তার ভয়। একটা নির্দিষ্ট সীমা সে তাই কোনদিন অতিক্রম করে নাই।

এদিকে অসহিষ্ণু প্রভা পড়িয়া গিয়াছিল ধাঁধায়। এ অভিজ্ঞতা ছিল তার অভিজ্ঞতার বাহিরে। পুরুষ ঘনিষ্ঠ হয় যতখানি হওয়া সম্ভব, বছর পার হইয়া যায় প্রকাশ্যে আর নির্জনে কাছাকাছি হওয়ার ভূমিকা করিয়া, অথচ কিছুই ঘটে না। এ কোন দেশী

সম্পর্ক নারী ও পুরুষের? কিছুদিনের জন্য তখন প্রভার বড় কষ্টকর মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে কাটিয়াছিল। জীবনের অনেক সীমাহীন সম্ভাবনার দুর্বোধ্য রহস্যময় অনুভূতি তাকে কখনো ব্যাকুল করিয়া রাখিত, কখনো সে অনুভব করিত খাপছাড়া আনন্দ, বিষাদের চাপে জীবন কখনো হইয়া উঠিত দুর্বহ। বিষাদের পর আসিত ক্ষোভ। দেহ মন তার যেন জ্বালা করিতে থাকিত। কোনদিন ভূপেনকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিত, কোনদিন করিত অপমান! কোন রকমে মানুষকে একবার জয় করিতে পারিলে তাকে কি শাস্তি দিবে ভাবিতে ভাবিতে তার নিদ্রাহীন রাত কাটিয়া যাইত।

একদিন শ্রান্তির ছলে ভূপেনের কাঁধে মাথা রাখিয়া কয়েক মিনিটের সে কয়েকটা যুগ কাটাইয়া দিয়াছিল, প্রতি মুহূর্তে পরবর্তী মুহূর্তের অঘটন প্রত্যাশা করিয়া। নিজের নেই স্পষ্ট নির্লজ্জ পাশবিক অভিযানের কথা ভাবিলে আজও প্রভার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। ভূপেন শুধু সন্তর্পণে তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'একটু ভাল লাগছে প্রভা?'

কিছুই যেন অপ্রত্যাশিত নয়, খাপছাড়া নয়। হঠাৎ দুর্বলতা বোধ করিয়াছে, মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছে, তার কাঁধে মাথা রাখিয়া তাকে আশ্রয় করিয়া প্রভা একটু বিশ্রাম করিবে বৈ কি। সংকোচ বোধ করিলেই যেন প্রভার অন্যায় হইত।

তারপর হইতে প্রভা তাদের সম্পর্ককে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অপমানের জ্বালাটুকু পর্যন্ত আর বোধ করে নাই।

দুপুরবেলা স্বর্ণ প্রভার কাছে গিয়াছিল, বিকালে প্রভা এ বাড়ি আসিল। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই সে মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। মেয়েদের সঙ্গে দু'একটি কথা বলিয়াই সে উপরে উঠিয়া গেল। ভূপেন এখনো শুইয়া আছে শুনিয়া একটু যে দ্বিধা মনে ছিল তাও সে এবার বাতিল করিয়া দিল।

রোগী দেখিয়া দেখিয়া প্রভার এসব কেমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। রোগীর বিছানায় বসার মত সে ভূপেনের বিছানায় বসে, তাপ নেওয়ার মত কপালে হাত রাখে, নাড়ী দেখার মত তার হাত ধরিয়া মুমূর্ষুকে ভরসা দেওয়ার মত হাসি হাসে।

'ছি, তোমার না চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে? এসব ছেলেমানুষী কেন আবার?

অনুযোগ দিয়া একটি কথাও বলিবে না ভাবিয়াছিল, অনেকদিনের অভ্যাসে আপনা হইতে মনের প্রধান নালিশটা অনুযোগের ভাষায় বাহির হইয়া গেল। চিকিৎসার প্রথম কিস্তি হিসাবে, আজ যাচিয়া ভূপেনকে অনেক কিছু দিবে ঠিক করিয়াছিল মনে পড়ায় ছোটছেলেকে আদর করার মত ছোট একটি চুমু দিল!

ভূপেন কিছুই করিল না, বোকার মত শুধু কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল, 'এই প্রথম প্রভা। বন্ধুরা জোর করে টেনে নিয়ে গেল। তুমি তো জানই ওসব অভ্যেস আমার নেই।'

'অভ্যেস হতে কতক্ষণ!'

'না সে ভয় নেই। এমন বিশ্রী লাগছে কি বলব তোমায়। ওরা যে কি আনন্দ পায় ওরাই জানে!'

গত রাত্রির বেপরোয়া উল্লাসের চেয়ে অবসাদের স্মৃতিই ভূপেনকে বিষণ্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কিছুই ভাল লাগে নাই। নিজেই সে যে সময় আর জীবনীশক্তির অসার্থক অপচয়ের এমন স্বার্থপর প্রহরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাল রাত্রির আগে কখনো খেয়াল হয় নাই। গায়ের জোরে বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে গিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, এও কম লজ্জার কথা নয়। অভ্যাস নাই বলিয়াই কি তার সহ্য হয় নাই।

এখনো দেহ মনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া আছে। সকালে একবার এবং সারাদুপুর ঘুমানোর পর বিকালে আরেকবার স্নান করিয়াও মনে হইতেছে বাসি বেলফুলের গন্ধ যেন এখনো বাতাসে লেপটিয়া রহিয়াছে।

দুজনে অনেক কথা হয়,—অনেক। একযুগ আগে যে কথা বলা চলিত সেগুলি অবশ্য মনের মধ্যে ভিড় করিয়াই থাকে, দু'জনে শুধু উচ্চারণ করিয়া যায় কথাগুলির সময়োপযোগী অনুবাদ। অনুবাদের ভাষা অতি সুবোধ্য, কিন্তু শব্দগুলির মানে এত কম যে কিছু যেন প্রকাশ করাই কঠিন। তবু কথা বলিতে বলিতেই ভূপেনের জিভের বিস্বাদ জড়তা কাটিয়া যায়। বাসি বেলফুলের গন্ধ চাপা পড়িয়া যায় প্রভার পরিচিত সেন্টের গন্ধে, বসা সর্দির মত মস্তিষ্কের ভোঁতা টসটসে অস্বস্তিবোধ কাটিয়া যায় প্রভার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে প্রভা বলিল, এখন যাই, একটা কেস আছে। চারটের সময় যাওয়ার কথা, সন্ধ্যে হয়ে গেল।'

উঠি উঠি করিয়াও প্রভা একটু দেরী করে। ছোট ঘড়িটির সেকেণ্ডের কাঁটা চলিতেছে দেখিয়াও কাণের কাছে ধরিয়া রাখিয়া পরীক্ষা করে ঘড়িটির প্রাণ আছে কিনা! তবু ভূপেনের মনে পড়ে না প্রভা আজ যাচিয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে, তার অনেকদিন আগেকার প্রায় চাপা-পড়া প্রস্তাবের সক্রিয় জবাবের মত বিদায় নেওয়ার সময় অন্ততঃ তাকে একটু গ্রহণ করা তার একান্তভাবে উচিত। চিরদিন যে আসে আর চলিয়া যায়। আসার মধ্যে প্রভা নিজেই আজ নতুনত্ব আনিয়াছে, যাওয়ায় মধ্যে বৈচিত্র আনিবার দায়িত্বটা তার। কাল সন্ধ্যায় দুঃখীর বরফ শীতল পানীয়ে প্রথম চুমুক দিয়া উষ্ণতা বোধ করার মত নূতন সম্ভাবনার উত্তেজনায় ভূপেন চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিন ও রাত্রি ব্যাপী নিবিড় মিলনের কল্পনায় ছড়ানো সে সম্ভাবনার সূচনা যে আজ এই মুহূর্তে প্রভাকে একটু আদর করায়, সেটা খেয়াল না হইলে ভূপেন কি করিবে। চিরদিনের প্রথাতে সে প্রভাকে বিদায় দিল।

রাত দশটার সময় প্রভা ফোন করিল।

'রাজী তো হলাম, আমার কিন্তু ভয় করছে।'

'কিসের ভয় ?'

'ঠিক ভয় নয়, কেমন যেন ভাবনা হচ্ছে।'

'কিসের ভাবনা ?'

'কাল সকালে একবার এসো।' বলিয়া প্রভা কথা বন্ধ করিয়া দিল।

চার

দু'জনের বাড়ীতেই ব্যাপারটা মোটামুটি অনুমান করিয়া সকলে শঙ্কিত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। ছেলে-বৌ মারা যাওয়ার পরেই হঠাৎ ভূপেন যেভাবে প্রভার দিকে ঝুঁকিয়াছিল, তাতে বৌদির ভয়ের সীমা ছিল না। মনে হইয়াছিল, শোক যে ভূপেনের হয় নাই সরমা ও নন্তুর জন্য, তার কারণও বুঝি এই। রুদ্ধ-নিশ্বাসে সে প্রতীক্ষা করিয়াছিল, কি হয় কি হয়। কিন্তু কিছুই তখন হয় নাই। প্রভার জন্য ভূপেনের ব্যাকুলতা কমিয়া গিয়াছিল, ছেলে বৌয়ের জন্য সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল শোকে।

প্রভার সঙ্গে ভূপেনের দেখা সাক্ষাতও যেন কমিয়া গিয়াছিল আগের চেয়ে। তারপর কোথায় এক রাণীকে সন্তান প্রসবের জন্য সাহায্য করিতে গিয়া প্রভা কিছুদিন এক রাজবাড়ীতে বাস করিয়া আসিল। তারপরেও কিছু ঘটিল না। ধীরে ধীরে সকলের দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। বৌদি কোমর বাঁধিয়া সরমার অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। দিদির ফিট পর্যন্ত একটানা অনেকদিন স্থগিত হইয়া রহিল।

হঠাৎ দু'জনে আবার কি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে দ্যাখো। একদিনে যার ছেলে-বৌ মরিয়া যায়, জানাশোনা একজন লেডী ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া ফেলাটা তার পক্ষে বড়ই অশোভন হয়, এটা খেয়াল করিয়া কি দু'জনে চুপ করিয়া ছিল এতকাল ?

প্রভা বৌ হইয়া এ বাড়িতে আসিলে কি অবস্থা দাঁড়াইবে ভাবিতে গেলেও বৌদির বুক ধড়ফড় করে! এমনিই প্রভার যা দেমাক, বাড়ির মানুষগুলিকে সে এমনই যেরকম অবজ্ঞা করে, তাতে একেবারে গৃহিণী হইয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলে মানুষকে সে কি আর টিঁকিতে দিবে ? বিবাহ করার সাধ হইয়া থাকে সরমার মত আরেকটি ভীরু নরম বৌ আসুক, কর্তালি করার অভ্যাস যায় নাই, সব বিষয়ে যে বৌদির দুখ চাহিয়া থাকিবে। প্রভাকে কেন ? প্রাণ দিয়া এত সে সেবা করে ভূপেনের তাকে জব্দ করার জন্য প্রভাকে কেন ?

এদিকে প্রসন্ন ভয়ে ভয়ে বোনকে জিজ্ঞাসা করে, 'ডাক্তারি বুঝি ভাল লাগছে না প্রভা ?'

'ভাল লাগছে না ? কে বললে তোমায় ?'

দু'একদিন পরে প্রসন্ন আবার বলে, 'একটা প্রফেসন নেওয়ার পর সেটা ছেড়ে দিলে মেয়েরা সুখী হতে পারে না প্রভা। ভারি অগৌরবের বিষয় হয়। পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার চায়, অথচ স্বাধীনভাবে থাকবার সুযোগ পেলেও নিজেরাই সেটা বজায় রাখতে পারে না। সাধে কি পুরুষ জাত মেয়েদের দাবিয়ে রেখেছে।

প্রভা মৃদু হাসিয়া বলে, 'তুমি যেমন বৌদিকে রেখেছ ?'

সকলের বিপদ হইয়াছে, এখনো সবটাই নিছক সম্ভাবনার ব্যাপার, স্পষ্ট করিয়া ভূপেন ও প্রভা কিছু ঘোষণা করে নাই। স্পষ্ট করিয়া তাই তাদের কিছু বলাও যায় না। নিজের চাকরীর পঁচাত্তর টাকার সংসার চালানোর কথা ভাবিতে প্রসন্নের কপাল ঘামিয়ে ওঠে। প্রথম প্রথম প্রভা অবশ্য সাহায্য করিবে, কিন্তু সে আর কতদিন। তার ছেলেমেয়ে হইবে, নিজের সংসার গড়িয়া উঠিবে, তখন কি আর মনে থাকিবে বাপ দাদা ভাইপো ভাইঝির কথা ? অথচ স্পষ্ট করিয়া ওরা কিছুই বলিবে না। এরকম অবস্থার মধ্যে মানুষ থাকিতে পারে!

অন্য মানুষের যারা বৌ তাদের চিকিৎসা করিয়া শ্রান্ত হইয়া প্রভা বাড়ী ফেরে, নিজের ঘরের নির্জনতায় পুরুষালি ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারের হাতলে পা তুলিয়া চিৎ হইয়া নিজের বধূ-জীবন কল্পনা করে। এমনি বিষন্ন শান্তির সময় ভূপেনের বুকে মাথা রাখিয়া বিশ্রামের কল্পনায় সর্বাঙ্গে তার শিহরণ জাগে, নিশ্বাস জমা হইয়া দীর্ঘ অতৃপ্তির মত মুক্তি পায়। কিন্তু কত ভয় আর ভাবনাও যে বুক তার দুরু দুরু কাঁপাইয়া দেয়।

ভূপেনের দিক দিয়া তার ভয়ের কিছু নাই, সে তার কোন ইচ্ছায় কোন কোন কাজে বাধা দিবে না, কিন্তু যে পরিবর্তনগুলি অপরিহার্য, কারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর যে যোগাযোগগুলি নির্ভর করিবে না ? যখন খুসী বাহির হইয়া গিয়া যখন

খুসী সে ফিরিয়া আসে, দিবারাত্রি বাহিরে কাটাইলেও কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় না সে কোথায় ছিল। আপনজনের দিকে ইচ্ছা হইলে তাকায়, ইচ্ছা না হইলে তাকায় না। ঘরের দরজার মোটা পর্দাটি টানিয়া দিলে সে একা হইয়া যায়, পর্দা সরাইয়া ঘরে উঁকি দিবার সাহস পর্যন্ত কারও হয় না। নারী ও শিশুর মঙ্গলের জন্য সমিতি গড়িয়া মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করে। অসংখ্য অভ্যাসের ভেলায় ভাসিয়া চলে জীবন স্রোতে। এসব যদি সে বজায় রাখে, ভূপেনের বৌ হওয়ার অর্থ কি? আর এই যে সব বিচিত্র উপকরণে জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে, এগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে ভূপেনের বৌ হইয়া তার লাভ কি? শুধু অবসর মিলনের জন্য তো বিবাহের দরকার হয় না।

অথচ বিবাহ ছাড়া মিলনও তাদের বিস্বাদ হইয়া যাইবে। প্রভা ভাল করিয়াই তা জানে। তার নিজের জন্য হয়তো নয়, ভূপেনের জন্য। এইরকম প্রকৃতি ভূপেনের! শুধু প্রভাকে পাইলে তার চলিবে না, প্রভার জীবনও তার চাই।

প্রভা ঘরের চারিদিকে তাকায়। এ ঘর ছাড়িয়া ভূপেনের বাড়ীতে একটা ঘরে তাকে বাস করিতে হইবে। বাহিরে বারান্দায় গিয়া প্রভা সংসারের কলরব শোনে, আপনজনের চলাফেরা চাহিয়া দ্যাখে। ভূপেন যেমন তার বাড়ীর সংসারটির কর্তা, সেও তেমনি এই সংসারের কর্ত্রী। তার টাকায় তার নির্দেশে এই সংসার চলে। এবার তাকে গিয়া চালাইতে হইবে ভূপেনের সংসার। সে টাকা পাঠাইবে কিন্তু তার এই সংসারে কর্তৃত্ব করিবে অন্য একজন। তার প্রচলিত নিয়ম আর ব্যবস্থাগুলিও হয়তো বাতিল হইয়া যাইবে দু'দিনের মধ্যে।

কেবল নিজের নিজের বিচার বিবেচনাই নয়, আসন্ন বিপদের মত তাদের মিলনের সম্ভাবনায় বাড়ির মানুষের মধ্যে যে ভয় জাগিয়াছে সেই ভয়ের উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়াও তাদের দমাইয়া দেয়। একটা রাত্রিও তাদের দূরে কাটাইতে ইচ্ছা করে না, ভিন্ন দু'টি বাড়িতে দুটি ঘরে রাত জাগিয়া তারা পরস্পরের জন্য ছটফট করে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বিবাহটা সারিয়া ফেলিবার তাগিদও কোন পক্ষ হইতে আসে না। আলোচনা সেদিন যতটুকু আগাইয়াছিল সেইখানেই থমকিয়া থাকে। আর তাদের দূরে থাকিবার প্রয়োজন নাই, এইটুকু বুঝাপড়া করিয়াই যেন তারা একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। আর কিছু বলিবার বা করিবার প্রয়োজন যেন নাই। কাছাকাছি আসিলে মাঝে মাঝে বরং মনে তাদের এই অস্বস্তিই জাগিয়া উঠে যে, অন্যজন হয়তো হঠাৎ বলিয়া বসিবে, একটা দিন তবে এবার ঠিক করে ফেলা যাক?

মেজাজ দু'জনেরই বিগড়াইয়া যাইতে থাকে। কাম্য মিলনকে ঠেকাইয়া রাখিতেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তাদের ফুরাইয়া যায়, অতি তুচ্ছ কারণে সমস্ত জগতের উপর রাগে তাদের গা জ্বালা করিতে থাকে। পরামর্শ করিয়া তারা যদি বিবাহ পিছাইয়া দিত, কোন কথা ছিল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার কথা ভাবিয়া মন শুধু তাদের ব্যাকুল হইয়া উঠিত। এখন তাও সম্ভব নয়। পরামর্শ করিতে হইলে এখন সবচেয়ে নিকটবর্তী শুভ দিনটিতে বিবাহ চুকাইয়া ফেলিবার পরামর্শই করিতে হয়। তাই যে উদ্ভট অবস্থা তারা সৃষ্টি করিয়াছে সেই অবস্থারই জের টানিয়া চলিতে চলিতে দম যেন তাদের ফুরাইয়া যাইতে চায়।

দু'বাড়ীর লোকেরাও ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। সংসারের খরচের জন্য টাকা চাহিতে গিয়া বোনের কাছে অপমানিত প্রসন্ন কিছুক্ষণের জন্য এমন কথাও ভাবে যে, এর চেয়ে নিজের পঁচাত্তর টাকাতে সংসার চালানোর চেষ্টা করাও ভাল। ভূপেনের

বাড়িতে ছেলেমেয়ের একটু সর্দি হইলে, মেয়ে-বৌয়ের একটু মাথা ধরিলে প্রভাকে ডাকা হইত, প্রভাও ডাকিলেই যাইত। এখন বৌদির খোকার আটানব্বই পয়েণ্ট এক জ্বরের জন্য ব্যাকুলভাবে তাকে ডাকিলে ফোনেই সে খোকাকে ঘণ্টা দুই চৌবাচ্চায় ডুবাইয়া রাখিবার উপদেশ দেয়, অনু মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে শুনিয়া বলে যে একটা পেরেক যেন তার তালুতে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। পেরেকটা এমনি না ঢুকিলে যে হাতুড়ি ব্যবহার করা চলিবে, এটুকু বলিয়া দিবার ইচ্ছাটা পর্যন্ত সে সম্বরণ করিতে পারে না।

বৌদি কাঁদো কাঁদো হইয়া ভূপেনের কাছে নালিশ জানায়, 'প্রভা আমায় এমনি করে অপমান করবে ঠাকুরপো ?'

ভূপেন বলে, 'বেশ করেছে! ফোন করতে গিয়েছিলে কেন ? রান্না হয়েছে ?'

বৌদি বলে, 'এই হল !'

ভূপেন গর্জন করিয়া উঠে, 'এই হ'ল ! আপিস যাব না আমি ?'

বৌদি ভয়ে ভয়ে বলে, আপিস আছে নাকি ? আমি ভাবছিলাম আজও ছুটি। কিছু তো বলনি ঠাকুরপো ?'

'বলতে হবে কেন ?'

আপিসের কথা ভূপেনের নিজেরও মনে ছিল না। এতক্ষনে মনে পড়িয়াছে, সাড়ে দশটার সময়। কবে ছুটির শেষ হয়, কখন আপিসের বেলা হয়, মনে করিয়া দিবার কেউ নাই। সমস্ত জগৎ যেন তার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছে।

সরমা যেন জীবনের আধারটা তোবড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে। কোনমতে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না, কোথাও থাকিতেছে ফাঁক, কোথাও লাগিতেছে খোঁচা।

খাইতে বসিয়া তাড়াতাড়িতে খাওয়াটা ভূপেনের বেশী হইয়া যায়। সকলে যেন তাকে পীড়ন করার জন্যই আজকাল বেশী বেশী এটা খাও ওটা খাও বলে। সরমাই তার খাওয়ার হিসাব জানিত, সরমাই শুধু সাহস করিয়া তাকে বলিতে পারিত, রাবড়িটা থাক, ওবেলা খেও। ভরপেটে দুবার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া হাঁপ ধরিয়া গেলে গাড়িতে উঠিবার সময় হঠাৎ তার মনে পড়িয়া যায়, এও অন্যায়। দরকারী কিছু ফেলিয়া ঘরের বাহির হওয়ার আগেই সরমার মত কেউ মনে পড়াইয়া দেয় না। সকলে মিলিয়া এমনভাবে তার মনটা বিগড়াইয়া দিয়াছে যে দু'বার সিঁড়ি ভাঙ্গার আগে খেয়াল হয় না, সে একটা হুকুম দিলেই দশবার সিঁড়ি ভাঙ্গিবার অনেক লোক তার বাড়ীতে আছে।

গাড়ীর চলনটা পর্যন্ত খাপছাড়া মনে হয়। ছোকরা চালকটির ছাঁটা ঘাড়ে অনেক উঁচু পর্যন্ত চামড়া বাহির হইয়া আছে। জগতের সমস্ত মানুষের উপর এতক্ষণ যে ক্রোধ ও বিরক্তি ভূপেনের মনে গুমরাইতেছিল, এই ছাঁটা ঘাড়ের ঔদ্ধত্য যেন তার সবটুকু আকর্ষণ করিয়া নেয়।

'গরুর গাড়ী চালাচ্ছ না কি ?'

গাড়ীর স্পিড বাড়িবামাত্র কিন্তু আতঙ্ক জন্মে। রাস্তায় মানুষ ও গাড়ীর ভিড়, যদি অ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়া যায় ?

'কত জোরে চালাচ্ছ ? মাথা খারাপ নাকি তোমার ?'

গাড়ী আস্তে চলিতে থাকে। ছাঁটা ঘাড় হইতে ভূপেন যেন চোখ ফিরাইতে পারে না। একবার জোরে, একবার আস্তে—ছাঁটা ঘাড়ের ওপাশে কি হাসি ফুটিয়াছে ছোকরার মুখে ?

আপিসে ঢুকিবামাত্র কিন্তু ভূপেন গভীর আরাম বোধ করে। এখানে কোন পরিবর্তন নাই। কোন নিয়ম, কোন বন্ধন, কোন দায়িত্ব এখানে শিথিল হয় নাই, নূতন রূপ নেয় নাই। গভীর স্বস্তির সঙ্গে ভূপেন ঘণ্টা বাজায়, কলম নাচায়, নাম সই করে, ধমক দেয়, পরামর্শ করে, প্রায় সমবয়সী ও প্রায় সমপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে ইয়ার্কি দেয়।

আপিস হইতে বাহির হইয়া আপিসের বাহিরের বিপর্যস্ত জীবন ভাল করিয়া তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার আগেই সে সোজা গিয়া হাজির হয় প্রভার কাছে।

ডাক্তারি ব্যাগের মুখ আটকাইয়া প্রভা বলে, 'আমি যে বেরিয়ে যাচ্ছি? ডেলিভারি কেস,—এখুনি যেতে হবে? কি ছেলেই বিয়োতে পারে বোগুলো! আর যেন তাদের কাজ নেই।'

প্রভাকে বড় শ্রান্ত মনে হয়।

'কতকাল থেকে ছেলে বিয়োনো দেখছি! জন্মেই ছেলেগুলো কাঁদে,—না কাঁদলে কাঁদাতে হয়। আর কি মনে হয় জানো? একটা ছেলে জন্মে যদি একটু হাসত!'

'তোমার ছেলে হয় তো—'

প্রভা চোখ বড় বড় করিয়া বলে, 'আমার ছেলে? ওসব পাবে না আমার কাছে। সময় মত ছেলে হলেই টিঁকতাম কি না সন্দেহ, এই বয়সে ছেলে বিয়োতে হলেই হয়েছে।'

প্রভা ডাক্তার। প্রভা সব জানে।

ভূপেন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। আবার এক অন্ধ আশংকা তার ভীরু মনের গভীরতায় লাফ দিয়া ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। প্রভা সরমার অভাব মিটাইতে পারিবে না। প্রভার কাছে সে তা চায় না। কিন্তু নন্তুকেও সে ফিরিয়া পাইবে না? নন্তুকে আনিয়া দিতে হইলে নিজেকে প্রভার মারতে হইবে?

আট বছর প্রভার সঙ্গে যে সম্পর্ক সে মানিয়া আসিয়াছে, যার মধ্যে সে পাইয়াছে মনের বিশ্রাম, জীবনের বৈচিত্র্য, কল্পনার আশ্রয়, তার সমাপ্তির সম্ভাবনাতেই ভবিষ্যৎ তার কাছে কেমন যেন নীরস হইয়া গিয়াছে। প্রভার সঙ্গে এক বাড়িতে দিন আর এক শয্যায় রাত্রি কাটানোর কল্পনা পর্যন্ত তেমন উল্লাস ও উত্তেজনা জাগাইতে পারিতেছে না। নন্তুর মত আরেকজনকে পাওয়ার আশা প্রভার কাছে করা চলিবে না ভাবিয়া ভূপেন আরও বিষণ্ণ হইয়া যায়। এ যেন আর একটা প্রমাণ যে আট ন' বছর যেভাবে তারা কাটাইয়াছে তার পরিবর্তন তাদের সহিবে না। লাভ হইবে না কিছুই, নষ্ট হইয়া যাইবে তাদের অমূল্য বন্ধুত্ব।

প্রভাও মুখ নীচু করিয়া ভাবিতেছিল, মৃদুস্বরে সে বলিল, 'এই একটা অসুবিধা আছে।'

ভূপেন বলিল, 'তুমি কি সেইজন্য সেদিন বলেছিলে, তোমার ভয় করছে?'

'ঠিক এইজন্য নয়। কি হবে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা যদি মানিয়ে চলতে না পারি?'

আগে ভূপেন হয়তো সঙ্গে সঙ্গে এ কথার প্রতিবাদ করিত হাসিয়া উড়াইয়া দিত কথাটা। তারা মানাইয়া চলিতে পারিবে না সে আর প্রভা! এখন সে জোর করিয়া কিছু বলতে পারিল না, দ্বিধা ভরে শুধু বলিল, 'ঝগড়া আমাদের কখনো হবে না প্রভা।'

প্রভা একটু হাসিল, 'ঝগড়া? ঝগড়ার কথা কে ভাবছে? ঝগড়া হবে বৈ কি—

হওয়াই ভাল। আমি ভাবছি অন্য কথা। মনে মনে হয়তো দুজনেই বিরক্ত হব, হয়তো মনে হবে বেশ ছিলাম আমরা—

দুজনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। দুজনের মনেই যে আশঙ্কা পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, ভাষার মধ্যে স্পষ্ট হইয়া এতদিনে প্রকাশ পাইয়াছে। অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই তুচ্ছ করিবার উপায় নাই।

অনেকক্ষণ পরে ভূপেন বলিল, 'ওসব ভয় সবারি হয় প্রভা। হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রভা বলিল, 'আগে হলে সব ঠিক হয়ে যেত। আমরা যে বুড়ো হয়ে গেছি।'

একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুজনে তারা সত্যই বুড়ো হইয়াছে! নূতন অ্যাডভেঞ্চার সুরু করিবার বয়স তাদের আর নাই। তীব্র জ্বালা বোধের সঙ্গে ভূপেনের মনে হয়, তাদের এত ভয় ভাবনার কারণও হয়তো তাই। জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা হাতের মুঠোয় আসিয়া পড়িলেও গ্রহণ করিতে তারা যে ইতস্তত করিতেছে, হিসাব করিতে বসিয়াছে ভবিষ্যতে কতখানি লাভ আর কতখানি লোকসান দাঁড়াইবে, সে শুধু বয়স তাদের বেশী বলিয়া।

'ওসব ভাবনা চুলোয় যাক প্রভা! যা ঘটবার ঘটবে, এখন থেকে ভেবে কোন লাভ নেই।

'তুমি তো বলছ লাভ নেই। আমি যে না ভেবে পারি না!'

কথাটা ভূপেনকে আঘাত করে। এতক্ষণে তার যেন খেয়াল হয়, ভয় ভাবনা শুধু তার একার নয়, প্রভার মনেও তারই মত দ্বিধা জাগিয়াছে। নিজের পক্ষে তার কাছে যা ছিল একান্ত ন্যায়সঙ্গত চিন্তা, প্রভার মনে তার অস্তিত্ব তার অন্যায় মনে হয়। আনন্দে অধীর হইয়া দিন গোনার বদলে প্রভা তবে হিসাব করিতেছে সুবিধা ও অসুবিধা? তার কথা আলাদা। তার সরমা ও নন্তু ছিল, বহুদিন সে বাধ্য হইয়া একটা বিশেষ জীবন যাপন করিয়াছে, প্রভার সঙ্গে আবার সেই পুরাণো ধাঁচের জীবন নূতন করিয়া আরম্ভ করিবার আগে নানা কথা মনে আসার তার যুক্তি আছে। প্রভার কেন ভয় হইবে, ভাবনা জাগিবে? এতকাল একা একা নিজের ব্যর্থ অসম্পূর্ণ জীবন টানিয়া চলিয়া তার যখন সার্থকতার পরিপূর্ণতার সময় আসিয়াছে?

'তোমার ভাবনার কি আছে বুঝতে পারি না প্রভা।'

'বুঝতে পারবে না। তুমি শুধু নিজের কথা ভাবছ।'

'হঠাৎ রাগ হল কেন?'

'রাগ নয়। সেদিন রাগ হয়েছিল, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ সেদিন এসে বলেছিলে, একমাসের মধ্যে বিয়েটা সেরে ফেলি এসো। ও বিষয়ে যেন আমার কিছু বলারও নেই, করারও নেই। আমার মত আছে কিনা জিজ্ঞেস করারও দরকার মনে করনি।'

'আমি ধরে নিয়েছিলাম তোমার মত আছে প্রভা।'

'তা জানি। তাই তো রাগটা কমে গেল। কিন্তু ওরকম ধরে নেবে কেন? তুমি নিজের দিক থেকে সব কথা ভাব, আমার কথা ভাব না।'

কব্জিতে বাঁধা ছোট ঘড়িটার দিকে চাহিয়া প্রভা চমকাইয়া উঠিল।

'ইস, কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল।

ভূপেন বলিল, 'যেওনা প্রভা! আরও কথা আছে।'

'পরে কথা হবে। এখন সময় নেই।'

সময় নাই। একটি নারী বিপজ্জনক অবস্থায় ব্যথায় কাতর হইয়া পথ চাহিয়া

আছে, তার সঙ্গে কথা বলিয়া সময় নষ্ট না করাই প্রভার কর্তব্য। ভূপেন তা স্বীকার করে। বাড়ী ফিরিবার পথে সে তাই ভাবিতে থাকে, দু'হাতে সে যখন প্রভাকে বুকে বাঁধিয়া রাখিবে তখনও প্রভা কি উৎকর্ণ হইয়া থাকিবে যখন টেলিফোনের ঘণ্টা বাজে? অন্য এক নারীর সন্তান প্রসবে সাহায্য করিবার আহ্বান আসিলে মিলন স্থগিত রাখিয়া সে কি বলিবে, পরে আদর কোরো, এখন সময় নেই?

পাঁচ

শীত শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কদিন হঠাৎ গরম পড়িয়াছে। হঠাৎ বলিয়া গরমটা অসহ্য মনে হইতেছে। শরীর কেমন জ্বালা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বপ্নময় ঘুমে বিশ্রাম না পাওয়ায় ভোঁতা আলস্য শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে।

স্বর্ণের গায়ের রং আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ সময়েই সেমিজ সে গায়ে রাখিতে পারে না। গরমে এখন হাঁসফাঁস করে যে শাড়ীখানি খুলিয়া রাখিতে পারিলেও যেন বাঁচে। মোটা হওয়ার আগে সে যে কি ভয়ঙ্কর রূপসী ছিল ভাবিলেও মাথা ঘুরিয়া যায়। ভূপেন অবশ্য সে সময় তাকে দেখিয়াছিল কিন্তু আজ কোনমতেই একযুগ আগের স্বর্ণকে সে স্মরণ করিতে পারে না। তার মনে হয় স্বর্ণ যেন চিরদিন এমনি ছিল, অবিন্যস্ত একস্তূপ রূপলাবণ্যের মত।

একটি মেয়ে একদিন জড়িত পদে ভূপেনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, অনেকদিন আগেকার স্বর্ণ বলিয়া যাকে ভাবিলেও ভাবা যাইতে পারে। চোখ দুটি কেবল তার খুব বড় বড়, সরমার যেমন ছিল।

মেয়েটিকে দেখিবার জন্যই সে যে এ বাড়িতে আসিয়াছে, ভূপেনের তা জানা ছিল না। একটা বাজে অজুহাত দিয়া অজিত তাকে এখানে ধরিয়া আনিয়াছে। বাড়ির লোকের কথাবার্তা চালচলন আর অতিরিক্ত আদর যত্নের ভূমিকা প্রথমে তার শুধু একটু খাপছাড়া মনে হইয়াছিল। তারপর ছোট একটি ছেলের সঙ্গে চিরপ্রচলিত প্রথায়, কোনরকম সাজগোজ না করার সাজ করিয়া, মেয়েটি যখন নতমুখে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া ঘরে আসিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন সে বুঝিতে পারিল কি ঘটিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা এমন হাস্যকর মনে হইতে লাগিল তার! অজিতও জানে না, এ বাড়ির উৎসুক মেয়ে পুরুষেরাও জানে না, কত বছর ধরিয়া কনে তার ঠিক হইয়া আছে, কে তার ভবিষ্যৎ বধূ। জানিলে এই কিশোরীকে যাচাই করিবার জন্য সামনে ধরিয়া দিত না।

অজিতকে বলিলে কি চমকটাই তার লাগিবে!

কৌতুকে অনুভূতি কিন্তু তার অল্পক্ষণেই মিলাইয়া যায়। মেয়ে দেখা আর মেয়ে দেখানোর পুরাণো রীতিগুলি চোখের সামনে ঘটিতে ঘটিতে তার মনে পড়াইয়া দেয় বহুকাল আগে সরমাকে দেখিতে যাওয়ার কথা। মনে পড়ে, সেদিনও অজিত তার সঙ্গে ছিল। ঘরের আসবাব ও বসিবার ব্যবস্থাও প্রায় ছিল এই রকম, এমনিভাবে ঘরে ঢুকিয়া পুতুলের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া বসিতে বলার পর এমনি সন্তর্পণে সরমাও সেদিন জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল! মুখ তুলিতে বলিলে এমনিভাবে ধীরে ধীরে সরমা মুখ তুলিয়াছিল, নাম জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতে গিয়া সরমার গলাও জড়াইয়া গিয়াছিল।

বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়াছিল সরমার মুখে? ভূপেনের মনে নাই। মেয়েটি ঘামিয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের পর কতদিন সরমা নিজেকে দেখানোর এই অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছে। কিভাবে বুক ঢিপ ঢিপ করে, মাথা ঝিম ঝিম করে, দম আটকাইয়া আসে কিন্তু জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতে ভয় হয়।

'তোমায়? মাগো তখন আবার তোমায় দেখব! আমি তখন শুধু ভাবছি, কতক্ষণে শেষ হয়, কতক্ষণে শেষ হয়।'

শান্তির জন্য ভূপেন মমতা বোধ করে।

'এবার ছেড়ে দাও, অজিত।'

গাড়িতে উঠিয়া অজিত জিজ্ঞাসা করিল, 'পছন্দ হল না? একে যদি তোমার পছন্দ না হয়—'

'পছন্দ হয়েছে বৈ কি।'

'হতেই হবে! এ শর্মার আবিষ্কার তো।'

'এমন সুন্দরী মেয়ে খুব কম দেখা যায়।'

'ও বাবা, এর মধ্যে মজে গেছ?'

'মজবার কথা নয়? টুকটুকে আঙুল দিয়ে কখন পাকা চুল তুলে দেবে ভেবে ধৈর্য ধরছে না ভাই।'

'ও, তামাসা হচ্ছে! তারপর?

'তারপর আর কি। ওরা জিজ্ঞাসা করলে বলে দিও, মেয়ে পছন্দ হয়েছে, কিন্তু পাত্র নেই। আমার ভাইপো'টির বয়েস মোটে ন'বছর।

অজিত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'আধবুড়ী লেডী ডাক্তার ছাড়া তোমার পছন্দ হবে না জানলে ওদের কথা দিতাম না।'

'তাই উচিত ছিল।'

'তোমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারছি। একটা কথা বলি শুনে রাখো। আমি এখনো মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ফুর্তি করে রাত কাটাই তবু বাড়িতে আমার সুখ-শান্তি আছে, তোমার যা কস্মিনকালেও থাকবে না। তার কারণটা কি জানো? পারিবারিক জীবনে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলি, সুখী হতে হলে সব শালাকে যে নিয়ম মানতে হয়। আরে রাখো তোমার তর্ক, ওসব জানা আছে আমার। কোথায় কি খাটে সে জ্ঞান তোমার আদৌ নেই। একটা কথার জবাব দাও তো আমার, খাওয়ার অনিয়ম করলে ক'দিন তোমার পেট ঠিক থাকে? বাড়ির জীবনটা ডাল ভাত খাওয়ার সামিল, রোজ পোলাও মাংস চলে না। সংসারী হওয়ার জন্য বিয়ে করবে, ঘরে আনবে একটা ত্রিশ বছরের লেডী ডাক্তার! তার কোন মানে হয়? অন্য উদ্দেশ্যে বিয়ে করলে কোন কথা ছিল না। প্রথম সংসার সুরু করলেও নয় বুঝতে পারতাম যাকে নিয়ে যেমন সংসার হোক খাপ খেয়ে যাবে। আনতে চাইছ নন্তুর মার জায়গায় আরেকজনকে, যাকে আনছ তিনি একরম অন্য রকম। ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ?'

ভূপেন কথা না বলায় অজিত একটু নরম গলায় বলিল, 'প্রভার নিন্দে করছি না ভাই। ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে ডাক্তারি করে, সেটা দোষের কথা নয়, আমার পিসীর বয়স সাতচল্লিশ, তিনিও লেডী ডাক্তার। তবে যে যা, সে তা। তার তো কোন উপায় নেই। তোমাদের বনবে না এই হল আসল কথা।'

বাড়ি ফিরিতেই স্বর্ণ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন দেখলে ঠাকুরপো মেয়েটাকে ? ওকে দেখলে আমার কান্না আসে ঠাকুরপো।'

'কান্না আসে ?'

'আমার তো জানাশোনা, আমি জানি। ওর চালচলন কথাবার্তা সব যেন তার মত, স্বভাবটি পর্যন্ত। কোথায় গেল কে জানে!'

দেখিতে সরমার মত নয়, সে রকম হওয়া এ জগতে কোন মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়, তবে চালচলন, কথাবার্তা স্বভাব সব সরমার মত। ভূপেন আশ্চর্য হইয়া যায়।

প্রভাকে বিবাহ করার কথা ভাবা যায়, কিন্তু সরমার বিনিময়ে তাকে বাড়িতে আনিবার কথা সত্যই কল্পনা করা যায় না। এই মেয়েটিকে কিন্তু সেভাবে ভাবা চলে। বাড়ির সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবে, খালি পায়ে নিঃশব্দে ঘরের কাজ করিয়া বেড়াইবে, খাটে গদির বিছানা থাকিতে দুপুরবেলা মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইবে, নিজেকে একেবারে লোপ করিয়া ধরা দিবে ঠিক সরমার মত! প্রভা নয়, ঠিক এই মেয়েটির পক্ষেই যেন তা সম্ভব।

'ঠাকুরপো, সে গিয়ে অবধি সবার বুক খালি, ঘর খালি। তার অভাব তো আর কাউকে দিয়ে পূর্ণ হবার নয়, তবু শান্তিকে তুমি ঘরে আনো, আমাদের প্রাণ একটু হালকা হোক।'

বৌদি ঘন ঘন চোখ মুছিতে থাকে।

সন্ধ্যার পর ভূপেন প্রভাকে একবার ফোন করিল। প্রভার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিবার জন্য মনটা তার উতলা হইয়া উঠিয়াছিল। প্রসন্ন খবর দিল প্রভা বাড়ি নাই, সকালে দশটার সময় বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনো ফেরে নাই। বিকালে বাড়িতে প্রভা একবার ফোন করিয়া জানাইয়া দিয়াছে, কখন সে বাড়ি ফিরিতে পারিবে কিছুই ঠিক নাই। একটা জরুরী কেসে সে আটকা পড়িয়া গিয়াছে।

প্রসন্নর কাছে নম্বর জানিয়া ভূপেন রোগীর বাড়িতে প্রভাকে ফোন করিল। প্রভা বলিল, 'কি করে ফিরব ? রোগীর আমার এখন তখন অবস্থা। কি কষ্ট যে পাচ্ছে বৌটা দেখলে তোমাদের পুরুষ-মানুষদের অভিশাপ দিতে ইচ্ছা হয়।'

খট্ করিয়া প্রভার সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গেল।

ঘরে বসিয়া ভূপেন ভাবিতে থাকে এবারে কি করা যায়। কাজ করিতে, বই পড়িতে ভাল লাগে না, বন্ধুদের সঙ্গে গিয়া গল্প-গুজবে সময় কাটানোর চিন্তাটাও সে বাতিল করিয়া দেয়। সিনেমায় যাইতে সে ভালবাসে না।

কিছু ভাল লাগে না। বড় একা মনে হয় নিজেকে। সময় বুঝিয়াই যেন অভাববোধের পীড়নটা আরও জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। কাজের মধ্যে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করিবে ভাবিয়া কাজের ঘরে যাওয়ার জন্য জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার সে মত পরিবর্তন করে। জানালায় দাঁড়াইয়া সহরের আলোকমালার দিকে চাহিতে অল্প দূরে অন্য বাড়ির একটি আলোকিত ঘরের ভিতরে তার চোখ আটকাইয়া যায়। ক্যাম্প চেয়ারে কাত হইয়া একটি লোক চুপ করিয়া আছে, মেঝেতে পা রাখিয়া খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে একটি মেয়ে। তার প্রসারিত হাতের কনুই পর্যন্ত দেখা যায়, পুতুলের বালিশের মত ছোট একটি বালিশে কনুই রাখিয়া কি যেন করিতেছে মেয়েটি। ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছে নিশ্চয়। ছোট বালিশের ওপাশে নিশ্চয়

একটি শিশু শুইয়া আছে, পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে তাকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে দেয়ালের দিকে খাটের শেষ প্রান্তে।

কেউ নড়ে না। না পুরুষটি, না তার বৌ। আট দশ মিনিট পরে বৌটি সোজা হইয়া দাঁড়ায়, ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক একটু নড়াচড়া করিয়া বাহিরে চলিয়া যায়— দুজনের মধ্যে একটি কথাও হয় না। পুরুষটি তেমনি ভাবে পড়িয়া থাকে, একটা সিগারেট ধরাইয়া অর্ধেক টানিয়া নিভাইয়া রাখে। কিছুক্ষণ পরে বৌটি আসিয়া এক কাপ চা লোকটির হাতে দিয়া আবার চলিয়া যায়, দাঁড়ায় না, গল্প করে না, ফিরিয়া তাকায় না! তারপর বহুক্ষণ সময় কাটিয়া যায়, বৌটি আসে না! চা শেষ করিয়া পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া লোকটি আবার সেই আধখানা সিগারেট খায়, মাঝে মাঝে উঠিয়া খাটে উপুড় হইয়া বোধ হয় ছেলেকেই একটু থাপড়াইয়া আবার ক্যাম্প চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এমন চুপচাপ বিনা কাজে মানুষ একা কি করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে ভাবিয়া ভূপেন অবাক হইয়া যায়। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তার পায়ে ব্যথা ধরিয়া যায় তবু সে জানালা ছাড়িয়া নড়িতে পারে না। খারাপ লাগে না লোকটার? একা মনে হয় না নিজেকে? একটা বইয়ের পাতা উল্টানোর প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না?

বহুক্ষণ পরে একটা ছোট বাটি হাতে বৌটি ঘরে আসে। ছেলেকে খাওয়ানোর জন্য দুধ আনিয়াছে বুঝিতে কষ্ট হয় না। কি যেন সে বলে লোকটিকে, সে কথা বলে না কিন্তু মুখে তার হাসি দেখা দেয়।

প্রতিদিন হয়তো এমনিভাবে লোকটি সন্ধ্যা যাপন করে, চুপচাপ একা বসিয়া ছেলেকে পাহারা দেয়। বন্ধু, কাজ, বই কিছুই তার দরকার হয় না। এতক্ষণে ভূপেন তা বুঝিতে পারিয়াছে। একাকীত্বের অনুভূতি লোকটির জাগে না। ছেলে তার সামনে খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছে, কখন ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁদিয়া উঠে ঠিক নাই। বৌ তার ঘরের কাজ করিতেছে, কখন ঘরে আসে ঠিক নাই। নাও যদি ঘরে আসে যখন খুসী নাম ধরিয়া ডাকিলেই আসিবে। না ডাকিলেও কাজ শেষ করিয়া বাহিরের সব প্রয়োজন মিটাইয়া সমস্ত রাত্রির জন্য সে তো আসিবেই— যত সময় যায় ততই তার সেই আসিবার সময় কাছে আসে। সারাদিন হয়তো সে আপিসে খাটিয়াছে, ক্যাম্প চেয়ারে গা এলাইয়া মনকে শিথিল করিয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকাই লোকটির কাছে পরম উপভোগ্য বিশ্রাম। সময় কাটানোর কোন উপলক্ষ্যই সে চায় না। একাই সে থাকিতে চায়।

তাই বটে। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত সরমা যদি না আসিত এরকম একা কি মনে হইত তার নিজেকে? সরমা বাড়িতে আছে, কাজ অথবা গল্পে ব্যস্ত হইয়া আছে, নন্তুকে লইয়া জ্বালাতন হইতেছে, শুধু এইটুকু জানা থাকিলে কি এই একাকীত্বের ভার অনেকটা হাল্কা হইয়া যাইত না? ওই লোকটির মত চুপচাপ হয়তো বসিয়া থাকিতে তার ভাল লাগিত না, নন্তুকে পাহারা দিয়াও নয়, কিন্তু এমন ভোঁতা যন্ত্রণাদায়ক বিষাদ তার জাগিত না নিশ্চয়।

ঘরের দেয়ালে সরমার প্রকাণ্ড একটি ফটো টাঙ্গানো আছে। তার পাশে নন্তুর ছোট একটি ফটো। শোয়ার ঘরে ভূপেন খুব কম আসে। সরমার ফটোর দিকে সে তাকায় না, ইচ্ছা করিয়াই তাকায় না। আজ জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে বহুক্ষণ সে সরমার ফটোর দিকে চাহিয়া রহিল। না, সরমাকে সত্যই সে ভালবাসে নাই, প্রভাকে যেমন ভালবাসে। কিন্তু সরমা তার জীবনের অনেকখানি

জড়িয়া ছিল। তার দৈনন্দিন ধরা-বাঁধা জীবনে অতখানি অধিকার বিস্তারের ক্ষমতা প্রভারও কোনদিন হইবে না।

অনিবার্য অবিরাম মোহের মত প্রভা তার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, প্রভা আজ মরিয়া গেলে তার জীবনী-শক্তি ঝিমাইয়া পড়িবে, চেতনা স্তিমিত হইয়া আসিবে। সরমা মরিয়া যাওয়ায় তার কষ্ট হইতেছে, অসহ্য কষ্ট হইতেছে। দিনান্তে একত্র বসিয়া প্রভার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলিতে না পারিলে সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সরমাকে সর্বদা কাছে না পাওয়ায় জীবনটাই তার দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভা সরমা হইতে পারিবে না। ওই অজানা অচেনা শান্তি মেয়েটি হয়তো সরমাকে নকল করিতে পারে, প্রভা পারিবে না।

কাজের ঘরে যাওয়ার জন্য বারান্দায় আসিতেই সংসারের বিচিত্র কলরব ভূপেনের কানে আসে! পিসী কাকে বকিতেছে। রমলা শিখিতেছে গান। পাশের ঘরে বিমলা আর স্বর্ণ কথা বলিতেছে। নীচের ঘরে ছোট ছেলেমেয়েরা গোলমাল করিতেছে। মা ঠক ঠক করিয়া হামান দিস্তায় গুঁড়া করিতেছেন পানের মসলা। রান্নাঘর হইতে শব্দের বদলে ভাসিয়া আসিতেছে সম্ভারের তীব্র সুবাস। উপেনের সিগারের কড়া গন্ধও সেই ঝাঁঝালো সুবাসের নীচে প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

নিয়ম আছে। সুখের সংসার পাতিবার কতগুলি নিয়ম আছে, চোখ কান বুজিয়া সেগুলি মানিয়া চলিতে হয়। অজিত এই কথা বলিয়াছিল। বলিয়াছিল, নিয়মগুলি সে সাধনার মত মানিয়া চলে বলিয়া সে সুখী। সাংসারিক সুখশান্তির আতিশয্যে অজিতের যে সত্যই ছোটখাট একটি ভুঁড়ি গড়িয়া উঠিতেছে তাও চোখ মেলিয়া চাহিলেই দেখা যায়। তার কথাই কি ঠিক? সুখী হওয়া কি এত কঠিন আর সহজ? আট ন' বছর ধরিয়া ভালবাসার ব্রত পালন করিবার পরেও যাকে ভালবাসা যায় তাকে লইয়া সংসার পাতিয়া সুখী হওয়া যায় না, অজানা অচেনা শান্তিকে লইয়া অনায়াসে পাতা যায় সুখের সংসার?

হয়তো তাই। সংসারে ভালবাসার স্থান নাই। সুখ-শান্তির সঙ্গে সম্পর্ক নাই ভালবাসার।

হঠাৎ-পড়া গরমের পর দু'দিনের জন্য বসন্তের নাতিশীতোষ্ণ বাতাস বহিতে সুরু করিল। যার বসন্ত শুধু তাকে তোলা কাব্যের পাতায় থাকে, তাকেও স্বীকার করিতে হইল বসন্তের বাতাসে দেহ মনের কমবেশী কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মন উড়ু উড়ু না করুক, অন্ততঃ ক্ষুধা আর উৎসাহ যে একটু বাড়িয়াছে বেশ বুঝা যায়।

বিকালে প্রভা নিজেই ভূপেনকে তার বাড়ি যাইতে বলিয়াছিল। বিকালে ভূপেন গিয়া শুনিল, দুপুরে সে কোথায় বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যার আগেই ফিরিবে।

প্রসন্ন বলিল, 'তোমায় বসতে বলে গেছে।'

ভূপেন বলিল, 'আসতে না বললেই হত!'

প্রসন্নও মুখ ভার করিয়া বলিল, 'ওর ওই রকম স্বভাব।'

প্রসন্ন নিন্দা করায় ভূপেন তখন প্রভাকে সমর্থন করিয়া বলিল, ডাক এলে না গিয়ে তো উপায় নেই। রোগীর কথা আগে ভাবতে হবে বৈ কি।'

প্রসন্ন একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। সে বড় আশ্চর্য নিঃশ্বাস, এত বেশী ক্ষোভ ভরা যে শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় নিঃশ্বাসটা, ক্ষোভের, হতাশায় নয়।

'ওকে ডাক্তারি পড়িয়েই ভুল করেছি ভাই। তাই বিগড়ে যায় সেটা তেমন লাগে না,

সে ব্যাটাছেলে। বোন যা খুসী তাই সুরু করলে সয় না। কিছু বলারও উপায় নেই। নিজে রোজগার করে, কারো অধীন তো নয়!'

ভূপেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকে। তার কাছে প্রসন্ন প্রভার সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে পারে, কানে শুনিয়াও তার বিশ্বাস হইতে চায় না।

প্রসন্ন ধীরে ধীরে কামানো চিবুকে হাত বুলায়, বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে অনেককথা স্বগতোক্তির মত বলে, 'ভাবি আর আপশোষ হয়, সময় মত বিয়ে দিয়ে ওকে যদি সংসার পেতে সুখী হবার সুযোগ দিতাম! এসব বিকার জন্মে জীবনটা ওর মাটি হয়ে যেত না। ধীরেন মিত্রের সঙ্গে কি সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে আবার। একটা মাতাল গুণ্ডা লোক, আত্মীয়স্বজন যাকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না, তার সঙ্গে মাখামাখি সুরু করলে দশজনে বলবে না দশ কথা! তোমায় বলব কি ভাই, মানুষকে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করে।'

'কি বলছেন প্রসন্নদা? কিছুই বুঝতে পারছি না তো?'

'থাকগে, বলে কাজ নেই। এতকাল চুপ করে আছি, চুপ করে থাকাই ভালো।'

প্রসন্নের উদ্দেশ্য ভূপেন বুঝতে পারে না। এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা না করিলেও প্রসন্ন নিশ্চয় অনুমান করিতে পারিয়াছে অল্পদিনের মধ্যেই প্রভাকে সে বিবাহ করিবে। এ সময় প্রভার বিরুদ্ধে এ সব বিশ্রী কথাগুলি তাকে জানানোর মানে কি?

প্রভার সম্বন্ধে সে কি তাকে সাবধান করিয়া দিতে চায়? বলিতে চায়, আমার বোনটি অতি খারাপ মেয়ে, তাকে নিয়ে তুমি বিপদে পড়বে, অতএব বুঝেশুঝে কাজ কোরো? নিজের বোনের ক্ষতি করিয়া তার ভাল করার জন্য প্রসন্নের এতখানি আগ্রহ অতি খাপছাড়া মনে হয় ভূপেনের। সে অবশ্য বিশ্বাস করে না এসব কথা, প্রভার সঙ্গে তার দু'দিনের পরিচয় নয়, তবু এইরকম ধারণাই যদি বোনের সম্বন্ধে প্রসন্নের হইয়া থাকে, চুপ করিয়া থাকাই তো তার উচিত ছিল। সময়মত বিবাহ দিয়া বোনকে সংসারী ও সুখী করে নাই বলিয়া যদি তার আপশোষ, আজ বোনের সংসারী ও সুখী হওয়ার সম্ভাবনা যখন দেখা দিয়াছে, সে সম্ভাবনাকে প্রসন্ন নষ্ট করিয়া দিতে চায় কেন?

তাছাড়া প্রসন্ন কি ভুলিয়া গিয়াছে আজ কতকাল প্রভার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, প্রভার সম্বন্ধে কিছুই তার অজানা নাই?

মুখ গম্ভীর করিয়া ভূপেন বলিল, 'প্রভার যা প্রফেসন, তাতে ভালমন্দ সবরকম লোকের সঙ্গেই ওকে মিশতে হয় প্রসন্নদা। কে কেমন মানুষ, অত হিসাব করে ডাক্তারি চলে না।'

'তা কি আমি জানি না ভাই? সে রকম হলে তো কথাই ছিল না। পরশু ধীরেন মিত্রের বাগান-বাড়ীতে রাত একটা পর্যন্ত কাটিয়ে এল।'

'কি বলছেন পাগলের মত?'

'পাগলের মতই বলছি ভাই। পাগল না হলে বোনের নামে এমন কথা কেউ বলতে পারে? তুমি পর নও ভূপেন, তুমিও ওর দাদার মত। আমায় ও মানে না, কিন্তু তোমায় শ্রদ্ধা করে, তোমার কথা শোনে। তুমি চেষ্টা করে হয়তো ওকে শুধরে নিতে পার।'

'প্রভা তো ছেলেমানুষ নয় প্রসন্নদা। ওর প্রায় ত্রিশ বছর বয়স হতে চলল।'

'এ্যাঁ? তা বটে। সে কথা মিথ্যে বলনি। কি জান ভূপেন, কথাটা আমি

ভুলেই যাই। এখনো মনে হয় ও যেন ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। যাই হোক, তুমি যেন ওকে বলো না, আমি তোমায় কিছু বলছি। রাগ হলে ওর আবার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

প্রসন্ন উঠিয়া যায়। ভূপেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রভা তাকে শ্রদ্ধা করে, তার কথা শোনে। সে পর নয়, প্রভার সে দাদার মত। সে চেষ্টা করলে এখনো প্রভাকে শুধরাইতে পারে। এ সব ভাবিয়াই কি প্রসন্ন প্রভার সম্বন্ধে বিশ্রী কথাগুলি তাকে জানাইয়াছে? সে কি তবে জানে না তার আর প্রভার মধ্যে কি বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে?

আধঘণ্টা পরে প্রভা আসিল, তথাকথিত ধীরেন মিত্রের গাড়ীতে স্বয়ং ধীরেন মিত্রের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির হইবে জানিয়াই যেন প্রসন্ন ঠিক সময় বুঝিয়া প্রভার নামে তার অভিযোগগুলি ভূপেনকে জানাইয়া দিয়াছিল। প্রসন্ন কি জানে না পুরুষের মন কি রকম সন্দেহ-প্রবণ! তার কাছে অত কথা শোনার পর একেবারে চোখের সামনে ধীরেন মিত্রের দামী মোটর গাড়ী হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলে ভূপেনের মনটা যদি বিগড়াইয়া যায়, প্রসন্নর আগামী বিপদটাও হয়তো ফসকাইয়া যাইতে পারে।

ধীরেন বলিল, 'কেমন আছেন ভূপেনবাবু?'

'ভাল আছি।'

ভূপেনকে প্রভা কিছুই বলিল না। ব্যস্তভাবে ভিতরে যাইতে যাইতে ধীরেনকে শুধু বলিয়া গেল, 'একটু বসুন ধীরেনবাবু, আসছি।'

দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমানোর চেষ্টা ধীরেন আর করে না। ভূপেন সত্যই বড় আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ জোরালো হইয়া উঠিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভার ব্যবহারের ক্রুদ্ধ অসমর্থনে পরিণত হইয়া যাইতেছিল। সত্যই এটা তো উচিত নয় প্রভার। প্রভাকে সে সন্দেহ করে না বটে কিন্তু ধীরেনের মত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করাই তো তার উচিত নয়। এবং কারো বলিয়া দিবার অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেরই তার এটা বুঝা কর্তব্য ছিল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যাকে এড়াইয়া চলে তার সঙ্গে মোটরে চাপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে যে মানুষ সত্যসত্যই নিন্দা করিবে একটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি প্রভার নিশ্চয় আছে।

প্রভা নামিয়া আসিয়া এক টুকরা কাগজ ধীরেনের হাতে দিল, তাপর মৃদুস্বরে কথা বলিতে বলিতে ধীরেনের সঙ্গে আগাইয়া গেল বাহিরের বারান্দা পর্যন্ত।

ভূপেন জানে এসব কিছু নয়। কিন্তু জানিয়াও মনটা তার কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ধীরেনকে প্রভার এমন নির্বিকারভাবে গ্রহণ করা, ধীরেনের সঙ্গে তার এমন সহজ সম্পর্ক বজায় রাখা তার কাছে প্রভার স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে থাকে। প্রভার এই ব্যক্তিত্বই ধীরেনের সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে হয়। ধীরেনের দুর্নাম আছে কি নাই, প্রভা হয়তো তা গ্রাহ্যও করে না। নিজে যদি সে মনে করে ধীরেনের সঙ্গে মেলামেশা চালিতে পারে, ধীরেনের সঙ্গে মেলামেশা সে করিবেই।

ধীরেনের বাগানবাড়ীতে প্রভার রাত্রিযাপনের কথাটা ভূপেন মনের তাকে তুলিয়া রাখিয়াছিল, কথাটা বিশ্বাস করিবে কি অবিশ্বাস করিবে কিছু ঠিক করে নাই। কথাটা সত্য হইলেও তার মানে কি দাঁড়ায় ভাবিবার চেষ্টা সে করে নাই। ধীরেনের সম্পর্কে

ওদিক দিয়া কোন পীড়াদায়ক চিন্তা মনে আনিবারও যে প্রয়োজন নাই, এ ধারণা ভূপেনের নাড়া খায় নাই। তার বৌ হওয়ার আয়োজন করিতে করিতে প্রভা আরেকজনের বাগানবাড়িতে সখ করিয়া রাত কাটাইতে যাইবে এ চিন্তা মনে আনাও ভূপেনের হাস্যকর মনে হয়।

তবে প্রভাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার কি হইয়াছিল শুধু কৌতূহল মেটানোর জন্য জিজ্ঞাসা করা, আর কিছু নয়।

'পরশু রাত্রে কোথায় ছিলে প্রভা ?'

'একজনকে ছেলে বিয়োতে হেলপ্ করছিলাম। আমার আর কাজ কি! প্রভা হাসিল, বলিল, 'চলো, ওপরে যাই।'

প্রসন্নই তবে মিথ্যা বলিয়াছে। প্রভা রোগীর বাড়িতে ছিল, ধীরেনের বাগানবাড়িতে নয়। হয়তো কিছু না জানিয়াই প্রসন্ন ধরিয়া লইয়াছে যে রাত্রে প্রভা ধীরেনের বাগানবাড়িতে ছিল। নয়তো প্রভাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ধরা পড়িয়া যাইবে জানিয়া তার কাছে সে মিথ্যা বলিবে কেন ?

উপরে গিয়া ভূপেনকে ঘরে বসাইয়া প্রভা হঠাৎ বলিল, 'পরশু রাত্রির কথা জিজ্ঞেস করলে কেন ? ধীরেন বাবুর বাগানবাড়িতে ছিলাম শুনেছ বুঝি ?

ভূপেন নীরবে সায় দিল।

'তবে যে জিজ্ঞেস করলে কোথায় ছিলে ?'

'বাগানবাড়িতে ছিলে বিশ্বাস হয় নি।'

'বিশ্বাস হয় নি ? ও!'

প্রভা স্থির দৃষ্টিতে ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, দ্বিধা আর প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে। কি যেন বুঝিতে চাহিয়া সে বুঝিতে পারিতেছে না।

'ধীরেনবাবুর বাগানবাড়িতেই ছিলাম।'

'কোন কারণ, ছিল নিশ্চয়।'

'কি মানুষ তোমরা! তবু কিছুতে স্বীকার করবে না মনে খটকা বেধেছে ? আমি পাছে কিছু মনে করি তাই সন্দেহ করতে ভয় হচ্ছে, না ?'

'অত হিসাব করে কেউ সন্দেহ করে নাকি প্রভা ? সন্দেহ, অবিশ্বাসের কথা আমি ভাবিনি, ওসব বাদ দাও। তবে কাজটা তুমি সত্যি খুব অন্যায় করেছ।'

'সব না শুনেই বলছ অন্যায় ?'

'শুনেও তাই বলব।'

'বেশ, আগে শুনে নাও। ধীরেনবাবু ওখানে একটি মেয়েকে রেখেছেন। ভগবান জানেন কার মেয়ে, কোথা থেকে জুটিয়েছেন। পরশু সারারাত কষ্ট পেয়ে কাল ভোরে ওই মেয়েটার একটা ছেলে হয়েছে। ন'টা দশটার সময় আমি গিয়েছিলাম, তারপর আর ফিরে আসার উপায় ছিল না। আমি ফেলে চলে এলে মেয়েটা মরেও যেতে পারত।— অন্যায় করেছি ?'

'নিশ্চয়। একজন পুরুষ ডাক্তারকে ডাকিয়ে তুমি অনায়াসে চলে আসতে পারতে।'

'কেন ? নিজের রোগীকে অন্য ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসব কেন ?'

'সংসারে থাকতে হলে কতগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয় প্রভা। এমনি কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে দরকার মত সারারাত থেকে এলে কেউ কিছু বলবার সুযোগ পায় না। কিন্তু ধীরেন মিত্তিরের বাগানবাড়িতে তুমি রাত কাটিয়েছ শুনলে লোকে

কি বলবে ভেবে দেখেছ? ব্যাপারটা এমনিই তো কুৎসিৎ, তাছাড়া চাপা দেবার চেষ্টাও করা হয়েছে নিশ্চয়? তুমি ছাড়া আর যদি অন্য ডাক্তার না পাওয়া যেত তবে অন্য কথা ছিল। ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয়, সেজন্যই তো ধীরেন তোমাকে নিয়ে গেছে।'

'আমার অতসব ভাববার তো দরকার নেই। ডাক্তার হিসেবে আমায় ডেকেছে, ডাক্তার হিসেবে আমি গেছি। কে ডেকেছে, কোথায় ডেকেছে, আমার তা দেখবার দরকার নেই।'

'গয়না কেড়ে নেবার মতলবে একটা গুণ্ডা যদি তোমায় ডাক্তার হিসাবে ডাকে, জেনে শুনেও যাবে তুমি?'

'ছেলেমানুষের মত কথা বলো না।'

প্রভা উঠিয়া যায়। ভূপেন জানে, সে এখনই ফিরিয়া আসিবে, শুধু আলোচনাটা বন্ধ করিবার জন্য সে উঠিয়া গেল। আসিয়া হয়তো বলিবে, তোমার জন্য চা আনতে বলেছি, চা খাবে তো এখন? বলিয়া এতক্ষণের তর্ককে একেবারে বাতিল করিয়া নূতন বিষয়ে কথা আরম্ভ করিবে।

যতক্ষণ প্রভা সামনে বসিয়া কথা বলিতেছিল প্রতি মুহূর্তে তার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছে, ভূপেন স্পষ্ট অনুমান করিয়া যাইতেছিল। আগেও এটা সে খেয়াল করিয়াছে। প্রভা কি বলিবে, তার কথা শুনিয়া প্রভার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া জাগিবে, আগে হইতেই সে যেন তা জানিতে পারে। সব দিন নয়, মাঝে মাঝে। যেদিন প্রভার সঙ্গে কোন বিশেষ কথা আলোচনা করিবার থাকে অথবা যেদিন প্রভাকে দেখিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সেদিন। হয়তো এইসব বিশেষ দিনে তার মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমস্ত জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রত্যাহার করিয়া শুধু প্রভাকে আশ্রয় করে বলিয়া এটা সম্ভব হয়, প্রভার চোখের পাতা একটু কাঁপিয়া গেলে, অধরোষ্ঠের মিলন রেখার তুচ্ছ একটু ব্যতিক্রম ঘটিলে তাও তার চোখ এড়ায় না, সে মানে বুঝিতে পারে। এমনি ভাবে কিছু না জানিয়াও সে জানিতে পারিয়াছিল প্রভা তাকে ভালবাসে। এমনভাবে জানিতে পারিয়াছিল যে মাঝে মাঝে তার মনে হইতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষও বুঝি জানিতে পারিয়াছে তার ভালবাসার কথা এত স্পষ্ট ছিল প্রভার নিঃশব্দ ভাষাহীন ঘোষণা।

আজ আগাগোড়া ভূপেনের মনে হইতেছিল, প্রভা তাকে কি যেন একটা আঘাত দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। এখন একা বসিয়া এই আশঙ্কাটাই তার প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। কোন দিক দিয়া কিভাবে আঘাতটা আসিবে সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাকে যে মর্মাহত হইতে হইবে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়া থাকে। অজানা বিপদের প্রতীক্ষা করার মন লইয়া সে প্রভার ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

প্রভা ফিরিয়া আসিয়া বলে, 'চা আনতে বললাম আর সন্দেশ। বাড়িতে তৈরী!'

ভূপেন বলিল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। সন্দেশের কথাটা বাদে।'

প্রভা বলিল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে আমার।'

ভূপেন বলিল, 'আমি তাও ভাবছিলাম প্রভা।'

বাহিরের শান্ত ভাব বজায় রাখিয়া ভূপেন উদ্বেলিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে। ছোট টিপয়টিতে প্রভা হাত রাখিয়াছে, তার হাতের আঙুলগুলি আশ্চর্যরকম কোমল। কে বলিবে হাতটি একজন ডাক্তারের, অতি অনমনীয় কঠোর প্রকৃতির ডাক্তারের, যে স্ত্রীলোক হইয়াও স্ত্রীলোক নয়।

প্রভা চুপ করিয়া আছে দেখিয়া ভূপেন একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। আঘাত দিতে সে তো কখনও ইতস্তত করে না।

'কি বলছিলে প্রভা ?'

'বলছিলাম, আমাদের ওটা ছ'মাস এক বছর পেছিয়ে দেওয়া যাক। তাড়াতাড়ি করার কি আছে!'

তাড়াতাড়ি। আট বছর অপেক্ষা করার পরেও প্রভার আজ তাড়াতাড়ি মনে হইতেছে। রাগ করিবে ভাবিয়াও কিন্তু ভূপেন রাগ করিতে পারে না। একটু অভিমান পর্যন্ত তার জাগে না। প্রভার কথা শুনিয়া তার অনুভূতির জগতে হঠাৎ এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়া যায়, কতগুলি অনুভূতি যেন বাঁধা তারের মত অতিরিক্ত মোচড়ে টন টন করিতেছিল, হঠাৎ ঢিল হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন হইতে একটা যে অস্বাভাবিক উত্তেজনা তাকে পীড়ন করিতেছিল, সর্বদা শ্রান্তি আর বিরোক্তিবোধ মেজাজ খারাপ করিয়া রাখিয়াছিল, সমস্ত মিলাইয়া গিয়া সে শুধু অনুভব করে অবসন্নতা। বার বার মনে হইতে থাকে, আরও ছ'মাস একবছর কোন পরিবর্তন দরকার হইবে না, আরও কিছুকাল প্রভাকে আগের মত কাছে পাওয়া যাইবে।

সেও কি বিবাহের দিন পিছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল? প্রভা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিয়াছে, সে শুধু ইচ্ছাটা মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল?

'বেশ তাই হবে।' ভূপেন বলে।

তুমি এত সহজে রাজী হবে ভাবি নি। রাগ করবে না?

'না। তোমার ওপর কখনো রাগ করেছি প্রভা?'

'একটা শুধু ভয় আছে আমার। আবার পাগলামি করবে না তো, যেমন আরম্ভ করেছিলে?'

ভূপেন মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িল।– এইজন্যে তুমি রাজী হয়েছিলে, না? আমাকে বাঁচাবার জন্যে?'

'শুধু ওই জন্যে নয়।'

ঠাকুর চা, সন্দেশ আর জলের গ্লাস রাখিয়া গেল। ভূপেন খেয়াল করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল জীবনের এমন গুরুতর ব্যাপারের যখন নিষ্পত্তি হইতে থাকে তখনও পেটের তাগিদ চাপা পড়ে না, তার রীতিমত ক্ষুধা পাইয়াছে।

মুখে তুলিবার জন্য সন্দেশের প্লেটের দিকে সে হাত বাড়াইতে যাইতেছে, প্রভা উঠিয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া নিজেই তার মুখে সন্দেশ তুলিয়া দিল।

ঠাকুর তখন চলিয়া গিয়াছে।

শুধু ওই জন্যে নয়। কি যে হয়েছে আমার, ভাল বুঝতে পারি না। তোমায় নিয়ে কতরকম স্বপ্ন দেখি, কত কল্পনা করি, কিন্তু সত্যি সত্যি সব ঘটবে ভাবতে গেলেই কেমন ভয় হয়। মনে হয়, যেমন ভাবি সে রকম কিছুই হবে না, বিশ্রী লাগবে শেষ পর্যন্ত।'

চেয়ারের পিছনে সরিয়া গিয়া প্রভা ভূপেনের কাঁধে দুটি হাত রাখে। 'আমি ভাবছি, বিয়েতে কাজ নেই। অত ধরা-বাঁধার মধ্যে আমরা যেতে পারব না। তার চেয়ে বরং—

'তাও আমরা পারব না প্রভা।'

কপালে হাত রাখিয়া ভূপেনের মাথা নিজের শরীরে চাপিয়া রাখিয়া প্রভা অনেকক্ষণ তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর অতি ক্লান্ত অতি মৃদু স্বরে বলিল, 'তা জানি।

কিন্তু থাকতে পারছে না বলে তুমি যে পাগলামী সুরু করে দিয়েছিলে। আবার কি ঝোঁক চাপবে তোমার কে জানে। তার চেয়ে সবকিছুই ভাল।'

'আর পাগলামী করব না প্রভা।'

কানের কাছে মুখ নামাইয়া প্রভা ফিস ফিস করিয়া বলিল, 'শোন। তোমায় জানিয়ে রাখি। আজ থেকে আমি তোমার হয়ে রইলাম। যেদিন খুসী, যখন খুসী, আমাকে চাইলেই পাবে। রাত দুটোর সময় তুমি যদি আমায় ফোন করে ডাকো, ট্যাক্সি না পাই পায়ে হেঁটে আমি তোমার কাছে চলে যাব। তুমি কিন্তু শান্ত হয়ে থাকবে, নিজেকে ধ্বংস করতে পারবে না। কেমন ?'

ছয়

জীবনে যতদিন স্বাদ গন্ধ থাকে, মানুষের মনে হয় জীবনকে সে আয়ত্ত করিয়াছে, জীবন-কাব্যের সেই কবি। যে রকম স্বাদগন্ধই থাক, কটু অথবা মধুর, পাঁকের অথবা গোলাপের। স্বাদগন্ধ যখন উপিয়া যায়, প্রত্যাশা অথবা বিস্ময়ের দিন হয় শেষ, তখন মানুষেয় খেয়াল হয় জীবন তার অধিকারের বাহিরে, নিজের জীবনে নিজে সে কিছুই নয়।

প্রভার সঙ্গে শেষ বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। বুঝিবার বা বুঝাইবার আর কিছুই বাকি নাই। স্বপ্ন আর কল্পনা সৃষ্টির কারখানায় বিচিত্র উপাদান সর্বহারের খেলা পরামর্শ করিয়া দুজনে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্ভাবনাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে একটি মাত্র বাস্তব ও নির্দিষ্ট সম্ভাবনায় ! যেদিন খুসী, যখন খুসী, চাহিলেই প্রভাকে পাওয়া যাইবে। চাহিবার সংকোচ জয় করিতে হইবে না, না পাওয়ার ভয়ে কাতর হইতে হইবে না, প্রতীক্ষায় অধীর হইতে হইবে না, কোন আয়োজন করিতে হইবে না। এখন শুধু আছে চাওয়া এবং পাওয়া। তাছাডা সমস্তই বাহুল্য, অনাবশ্যক। দুজনের মধ্যে সব ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে ছড়ানো দিগন্তের যেদিকে খুসী মুখ করিয়া রওনা হওয়া, কাছে আসা আর দূরে যাওয়া, পথ ভোলা আর পথ খোঁজা, নদী মাঠ বন উপবন সাগর ও পাহাড় পার হওয়া, এ সবের আর প্রয়োজন নাই, তার আর প্রভার মধ্যে সোজা লাইন পাতা হইয়া গিয়াছে।

ভূপেন ভাবিতেও পারে নাই, এত সব রোমাঞ্চকর সম্ভাবনার এমন ভোঁতা পরিণতি হইবে! তার জানাও ছিল না প্রেম বাড়ে কমে, বাঁচে মরে। সেদিন প্রভার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার সময়ও সে কিছু টের পায় নাই। একটা গুরুতর জটিল সমস্যার অতি সহজ ও সুন্দর মীমাংসা হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া তখন কেবল নিশ্চিন্ত হওয়ার শান্তিই সে অনুভব করিয়াছিল। সেই সঙ্গে ছিল প্রভার সঙ্গে সমস্ত বিরোধের অবসান ও সর্বাঙ্গীন বুঝাপড়ার আনন্দ। শান্ত মধুর এক অনির্বচনীয় পুলকের মধ্যে কয়েকটা দিন তার কাটিয়া গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল পৃথিবী কি সুন্দর, গৃহ কি মনোরম, বাঁচিয়া থাকা কি সুখের। তারপর শীতল জলে স্নানের প্রভাবের মত কি ভাবে যেন উপিয়া যাইতে লাগিল সেই অস্থায়ী আবেশ, ধীরে ধীরে মিথ্যা হইয়া যাইতে লাগিল সাময়িক সত্য। রসালো দিনগুলি হইয়া উঠিল নীরস দীর্ঘ সময়।

পাখা মেলিয়া উড়িতে উড়িতে এক সময় তার আকাশটি পর্যন্ত রহিল না, পাখা গুটাইয়া ভারাক্রান্ত দেহে অবসন্ন মনে নামিয়া আসিতে হইল পাথর ঢাকা মাটির প্রলেপ বিছানো কাঁকরে।

ভূপেনের মানসিক স্থবিরত্বের সুযোগে সংসার ধীরে ধীরে তার মনোযোগ নিজের দিকে টানিয়া লইতে লাগিল। এতদিন সংসারের কোন বিষয়ে কেউ কিছু বলিতে আসিলেই ভূপেন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, এখন ছোট বড় সব বিষয়েই তার পরামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া যাইতে লাগিল। স্বর্ণের সাহস সকলের চেয়ে বেশি, সংসার পরিচালনার দায়িত্বটাও তার, ভয়ে ভয়ে সেই প্রথমে দুটি একটি সমস্যা তার দপ্তরে হাজির করিতে লাগিল। তারপর জানাজানি হইয়া গেল মেজাজ ভূপেনের ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, কথায় কথায় অকারণে সে আর চটিয়া উঠে না। তখন সাহস পাইয়া সকলে ঘেঁষিয়া আসিল তার কাছে, জানাইতে লাগিল অসংখ্য দাবী ও প্রার্থনা। ভীরু রমলা পর্যন্ত স্বর্ণের রায়ের বিরুদ্ধে তার কাছে আপীল পেশ করিতে গেল, তার গান শেখার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া না দিলে সে কিন্তু প্রয়োপবেশন আরম্ভ করিবে, হ্যাঁ।

বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মত স্থগিত করা দায়িত্ব ও কর্তব্য ভূপেনকে ভাসাইয়া নেওয়ার উপক্রম করিল। কত কি যে তাকে করিতে হইবে তার ঠিক ঠিকানা নাই। পিসীর বড় মেয়েটার বিবাহ না দিলে নয়, পুরী যাওয়ার জন্য মা উতলা হইয়া পড়িয়াছেন, নৃপেন ম্যাট্রিক পাশ করিয়া এবার কোন কলেজে কি পড়বে ঠিক করা দরকার, বিমলার ফিটের অসুখের বাড়াবাড়ি সুরু হইয়াছে, ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত, বাড়ীর প্রায় সকলের জন্য জামা-কাপড় কিনিতে এ মাসে বেশী টাকা দরকার, দু'বছর বাড়ীর কলি ফিরানো হয় নাই, মণ্টুর গায়ে ফোঁড়া উঠিয়াছে, খুকী সর্বদা নখ কামড়ায়, আরও কত কি।

আগে এসব সরমার মারফতে তার কাছে পেঁীছিত। এতটুকু ব্যস্ততা বা উদ্বেগ সরমার দেখা যাইত না, ধীরে সুস্থে একে একে সমস্ত দরকারী অ-দরকারী খবরগুলি তাকে শুনাইয়া যাইত, যেখানে ব্যাখ্যা প্রয়োজন নিজেই ব্যাখ্যা করিত। কোন বিষয়ের গুরুত্ব কতখানি নিজে নিজে স্থির করিবার কি আশ্চর্য ক্ষমতাই সরমার ছিল। শুধু তার বলিবার ধরণেই সব বিষয়ে ভূপেনেরও স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়া যাইত, মনে হইত কিছু না বলিয়াও সরমাই যেন তাকে বলিয়া দিয়াছে কোন বিষয়ে কি তার করা উচিত। এমন সোজাসুজি সংসারের বহুমুখী জটিলতার সংস্পর্শে আসিয়া মাঝে মাঝে ভূপেনের ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়, নিজেকে অসহায় মনে হয়। সরমার জন্য তখন মন কেমন করতে থাকে। সরমা থাকিলে আজ তার ভাবনা ছিল না। সমস্ত জটিলতা সরমা সরল করিয়া দিত, বসিয়া বসিয়া তার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হইত না।

যে সব ব্যাপারে কর্তব্য ঠিক করিতে তার এত ভাবিতে হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করার পরেও দ্বিধা সন্দেহে মন ভরিয়া থাকে, সরমা কেমন করিয়া সে সব ব্যাপারের মূল কথাটি এত সহজে ধরিতে পারিত? নিজেদের প্যাঁচালো বুদ্ধিতে জটিল যুক্তি তর্ক খাড়া করিয়া তারা যে বিষয়ে ঘোরালো করিয়া তোলে সরমার মত মেয়েদের সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় সে সব সহজ ভাবেই ধরা পড়ে।

অনেক মেয়ের হয়তো এই স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। যেমন শান্তি। বাঙালী পরিবার যেমন এক ছাঁচে ঢালা তাতে শান্তি ও সরমা একই আবেষ্টনীতে মানুষ হইয়াছে মনে করা চলে। সরমার মত সেও হয়তো পাইয়াছে সহজ সরল বুদ্ধি। তবে সরমার অভিজ্ঞতা তার নাই, স্বামী পুত্র আর স্বামীর আত্মীয় পরিজনের বৃহৎ সংসারে কয়েকটা

বছর কাটানোর আগে সে সব বেচারী পাইবেই বা কোথায়। বিবাহের সময় সরমা যেমন ছিল, লাজুক আর দিশেহারা, ও এখন সেই স্তরে আছে। সরমার মত হইয়া উঠিতে ওর অনেক সময় লাগিবে, অনেক।

কাজ আর সংসারের দায়িত্ব আশ্রয় করিয়া ভূপেন নিজেকে ভুলিবার চেষ্টা করে এবং এত সহজে নিজেকে ভোলা যায় দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে মূল্য দিলেই জগতের তুচ্ছ অবলম্বনও মূল্যবান হইয়া উঠিতে পারে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে নিজের বাড়ীর মানুষগুলির সম্বন্ধে সে এক নূতন সত্য আবিষ্কার করে, বিভিন্ন স্বার্থ আর প্রকৃতি কতটুকু মমতাকে আশ্রয় করিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারে। হিংসা বিদ্বেষ, কলহ বিবাদ ওই সামান্য প্রীতির বাঁধনটুকু ছিঁড়িতে পারে না, কলহের শেষে আবার অনায়াসে গলাগলি ভাব হয়। এটা সম্ভব হয় শুধু বাস্তবতার ভিত্তিতে তাদের সম্পর্ক দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া। ছাড়াছাড়ি হওয়াটা তাদের কাছে মর্মান্তিক কিছু নয়, তবু ছাড়াছাড়ি হয় না। কারণ তার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ মিলিয়া মিশিয়া আনন্দেই সকলে দিন কাটায়।

এভাবে জীবন কাটাইতে দোষ কি? কারো সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়িয়া তোলার প্রয়োজন কি, যে সম্পর্ক চুকিয়া গেলে বাঁচিয়া থাকাটাই ভয়াবহ শাস্তিতে পরিণত হয়?

যত দিন যায়, প্রভার বিরুদ্ধে একটা জোরালো অভিযোগ ভূপেনের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। দুজনের সম্পর্ক সহজ করিয়া দেওয়ার প্রথমে প্রভার কাছে তার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না, তারপর ভীরু সন্দেহের মত ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ মনে জাগিয়াছিল যে প্রভা কি সত্যই খুব বেশী উদারতা দেখাইয়াছে? হতাশ অবসন্নতার ভাব কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে জীবনের অপার শূন্যতা পীড়ন আরম্ভ করিলে এই প্রতিবাদের ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কেবলি মনে হইতেছে, তার দিক ভাবিয়া তো শুধু নয়, নিজেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রভা তাকে মুক্তি দিয়াছে। প্রভা রেহাই চাহিয়াছিল। এমন অন্ধ আবেগের সঙ্গে রেহাই চাহিয়াছিল যে, ভবিষ্যৎ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা পর্যন্ত ঘুচাইয়া দিয়া তাদের ভালবাসাকে সে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। প্রভা জানে বাসন্তী পূর্ণিমা রাত্রের অনির্দিষ্ট কামনা তার নয়, প্রতিদিন সে তাকে চায় জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সাথী হিসাবে। জানিয়া শুনিয়া এ উদারতা দেখানোর কি মানে হয়, আমাকে চাহিলেই তুমি পাইবে। কি করিয়া প্রভা মনে করিতে পারিল ওভাবে সে তাকে কোনদিন চাহিতে পারে?

সমস্ত কি ছল প্রভার, তাকে ঘিরিয়া স্বপ্ন রচনার সেই কথা? স্বপ্ন কি প্রভা রচনা করিতে জানে? তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হয়তো প্রভা ওকথা বলিয়াছে। অনেক দিনের বন্ধু সে, অনেকদিন হইতে তার প্রেমে উন্মাদ, সুতরাং উদারভাবে তাকে কতগুলি রোমাঞ্চকর কথা তো অন্ততঃ বলা উচিত, নিজেকে যখন দেওয়া চলে না। একটু শান্ত করা উচিত মানুষটার মন। তার জন্যই মন যখন তার এত উতলা হইয়াছে। প্রভা ডাক্তার, রোগীকে সে ওষুধ দেয়, আশা দেয়, তারও প্রেমোন্মাদনার চিকিৎসাই হয়তো প্রভা করিয়াছে।

চাহিলেই আমাকে পাবে, একথাও হয়তো প্রভার মিথ্যা। সে কোনদিন চাহিবে না জানিয়াই ওকথা প্রভা বলিতে পারিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে একদিন প্রভাকে আঘাত করিবার দুরন্ত ইচ্ছা জাগে ভূপেনের, কোনমতে এ ইচ্ছা সে দমন করিতে পারে না। প্রভার মিথ্যা ধরাইয়া দিতে হইবে, বুঝাইয়া দিতে হইবে, ছেলে-ভুলানো কথায় ভুলিয়া থাকিবার মানুষ সে নয়। প্রভাকে

এভাবে জব্দ করিয়া তার লাভ কি হইবে ভাবিয়া দেখিবার অবসর ভূপেন পায় না, ঝোঁকের মাথায় সন্ধ্যার পর সে প্রভার বাড়ি যাওয়ার জন্য বাহির হইয়া পড়ে। মন তার ভরিয়া থাকে গভীর বিষাদে, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের কথা সে ভাবে না।

সারাদিনের গরমের পর এখন পরম উপভোগ্য বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। ভূপেন হাঁটিয়াই প্রভার বাড়ির দিকে চলিতে থাকে। তাড়াতাড়ি করিবার কিছু নাই, উৎকণ্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষা তো কেউ করিতেছে না তার জন্য। ফিরিয়া তার আসিতে হইবে, দু'দণ্ডের জন্য বিব্রত প্রভার মুখখানি দেখিয়া, প্রভার মনকে শেষ জানা জানিয়া।

বাহিরের বসিবার ঘরে কেউ ছিল না, একটি স্তিমিত আলো জ্বলিতেছে। উপর হইতে কয়েকটি মানুষের কথা ও হাসি ভাসিয়া আসিতেছিল। ভূপেন একটা খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। প্রভার কয়েকটি বন্ধু আসিয়াছে, দোতলায় প্রভার ঘরে তারা সানন্দে কলরব করিতেছে। প্রভার গলা শোনা গেল, কথাগুলি বুঝিতে পারা গেল না, তারপর কানে আসিল প্রভার উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ। এখনো সে হাসিতে ভুলিয়া যায় নাই। জীবন যাদের আনন্দে ভরপুর, ভিতরের হাসি যাদের শব্দে ফাটিয়া পড়ার জন্য সর্বদা উদ্যত হইয়া আছে, তাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সন্ধ্যাটি প্রভা উপভোগ করিতেছে।

ভূপেন ঈর্ষা বোধ করে না, সে শুধু আশ্চর্য হইয়া যায়। প্রভার জীবনেও হাসি ও আনন্দ আজ এত সুলভ! নিজে সে তবে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে কেন? এ দোষ তো তার নিজের। প্রেমকে এত বড় করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন তো তার ছিল না, ব্যর্থতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে কেউ তো তাকে অনুরোধ করে নাই। সরমা আর নন্তুর জন্য শোক যদি তার হইয়া থাকে, হোক, প্রভা যদি স্বপ্ন আর কল্পনার জগৎকে অনুর্বর মরুভূমি করিয়া দিয়া থাকে, দিক। আরও তো অনেক কিছু আছে জীবনে, সে সব অস্বীকার করিবার কোন কারণ তো নাই। হাতের খেলনা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে বলিয়া অবোধ শিশু ঘরের আসবাব ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। সে তো শিশু নয়।

প্রভার সঙ্গে আবার আরেকটা বুঝাপড়ার মতলব ভূপেনের কাছে হাস্যকর ছেলেমানুষী হইয়া যায়। কি হইবে প্রমাণ করিয়া প্রভার মনে কি ছিল আর কি ছিল না? তার চেয়ে প্রভাকে হাসিতে দেওয়াই ভাল।

প্রতিবিম্ব

বেশী না হোক, বাপ প্রতি মাসে পেন্‌সন্‌ পান। বাড়ি-ঘর আছে, জমি-জমা থেকেও বছরে শ' দুই টাকা আয় হয়। দাদা বৌদি নিয়ে সাত বছর দেশ ছাড়া, দু'তিনখানা পত্রাঘাত করলে সেও কিছু টাকা পাঠায়। মনিঅর্ডারের কুপনে বাপের স্নেহ-দুর্বলতাকে আক্রমণ করে মন্তব্য থাকে: তারক কি করছে? ছাব্বিশ সাতাশ বছরের জোয়ান মদ্দ ছেলে কেন বাড়ি বসে অন্ন ধ্বংস করবে? স্নেহান্ধ বাপ মা'র দোষেই বাঙ্গালী ছেলে এভাবে নষ্ট হয়। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে না।

আরও অনেক আদর্শ বুলি।

বৌদি অনেক বুঝিয়ে অনেক উপদেশ দিয়ে দেবরকে চিঠি লেখেন। একি ঘেন্নার কথা যে বাবা চিরদিন এক ছেলের কাছেই হাত পাতবেন? তারকের দাদা হলে লজ্জায় কবে গলায় দড়ি দিতেন। চিরকাল একা তাদের সাহায্য করবার মত অবস্থাও তার দাদার নয়। সবাই মাইনেটার দিকেই তাকায়, বিদেশে কত যে খরচ সে কথা কেউ ভাবে কি? লেখাপড়া শিখেছে, মানুষ হয়েছে, এবার তারক কিছু করুক।

আরও অনেক ন্যায্য কথা।

শেষের দিকে বিশেষ বুদ্ধি খাটিয়ে বৌদি টুকটুকে একটি বৌয়ের কথাটাও উল্লেখ করেন। কবে চাকরী হবে, কবে বৌ আসবে ভেবে সেই আটশো ন'শো মাইল দূরে বৌদির না কি ছটফটানির সীমা নেই।

বড় ছেলের গঞ্জনায় হঠাৎ চারিদিকের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে বাপের মেজাজ যায় খিঁচড়ে। বাপ ছেলেতে বেধে যায় কলহ। প্রথম দিকে কলহটা করেন বাপ একাই। খুব এক চোট গালাগালি দিয়ে ছেলেকে দূর হয়ে যেতে বলেন বাড়ি থেকে। কিন্তু যতই অনুপযুক্ত হোক, ছাব্বিশ বছরের শক্ত সমর্থ যুবক তো ছেলেটা, একটা অনির্দিষ্ট আশংকায় বাপকে থেমে গিয়ে সুর পাল্টাতে হয়।

'জবাব দিস্ না যে কথার?'

'কোন কথার? শুধু তো গালাগালি দিলে এতক্ষণ। ঠাণ্ডা হয়ে কথা বলো, জবাব দিচ্ছি।'

'চাকরী বাকরী করবি নে তুই?'

'পেলেই কর। চাকরী কই? দাদাকে লেখো না চাকরী করে দিতে?

কিছুক্ষণের জন্য বাপকে একটু অসহায়, উপহাস্য মনে হয়। দাদাকে চাকরীর জন্য লেখা হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু অতদূর থেকে বাঙ্গলা দেশে ভাই-এর চাকরী সে করে দেবে কি করে? দাদা যে দেশে থাকে সে দেশেই একটা কিছু জুটিয়ে দেবার জন্য পত্র লেখায় দাদা জবাব দিয়েছিল, বিদেশে সামান্য চাকরীতে তারকের নিজের খরচই চলবে না। বাবা তো জানেন না বিদেশে কি খরচ, বাড়িতে টাকা পাঠাতে কেন তার এত অসুবিধা হয়। যাই হোক, সে চেষ্টা করবে, যথাসাধ্য চেষ্টাই করবে, যদি জুটে যায়। তবে কি না বিদেশে এসব ছেলের চাকরী হওয়া বড় কঠিন।

দাদার চেষ্টায় এ পর্যন্ত কোন ফল হয়নি। স্পষ্টই বোঝা যায় অপদার্থ ভাইকে কাছে টানতে সে ইচ্ছুক নয়। বিদেশে বাড়ি ঘর, বিদেশে সব, দেশে ফিরলেও দেশের বাড়িতে বাস করতে যাবে না, কাজ কি ভায়ের সাথে জড়াজড়ি মাখামাখি করে।

তারক মাঝে মাঝে দাদাকে উপদেশ দিয়ে পত্র লেখে যে বাপের সঙ্গে ছলনা করা কি তার দাদার মত মহানুভব ব্যক্তির উচিত, বাপের কাছে ভাণ করা? সোজাসুজি লিখে দিলেই হয় তারকের জন্য কিছু সে করতে পারবে না. কারণ, চাকরী করে না দিতে পারুক, তারক যে বার বার ব্যবসা করার জন্য হাজার খানেক টাকা চাইছে, সেটা তো দিতে পারে দাদা হাজারের কাছাকাছি যার মাইনে!

দাদা জবাব দেয় না।

বাপ তাই হঠাৎ পক্ষ পরিবর্তন করে বলেন, 'দাদা! দাদা! দাদার ভরসাতেই থাকো তুমে। বাপ ভায়ের জন্য কত দরদ সে বৌ-পাগলা হারামজাদার! যার দাদা নেই, সে বুঝি আর চাকরী করে না? তোর দাদাকে কে চাকরী দিয়েছিল? নিজের চেষ্টায় জুটিয়ে নিতে পার না নিজের চাকরী?'

'দরখাস্ত তো করছি গাদা গাদা। জবাব পর্যন্ত দেয় না।'

সে কথা মিথ্যে নয়। খবরের কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে বাবা নিজেই ছেলের জন্য বহু সম্ভাব্য চাকরী এ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন এবং ছেলেকে দিয়ে দরখাস্তও পাঠিয়েছেন। কিন্তু এমনি বিস্ময়কর মন্দ কপাল তারকের যে আজ পর্যন্ত একটা জবাবও আসেনি সে সব দরখাস্তের। ছেলের বেকার অবস্থার জন্য তাই বাপের একটা গোপন সহানুভূতি বরাবর ছিল। চাকরী-দাতারা সবাই এমন বিরূপ হলে ও বেচারার কিইবা করবার আছে!

'কি সব দলেটলে মিশিস্, সেজন্য নয় তো?

'তোমার যেমন কথা। কোন দলে আমার নাম আছে না কি?

দরখাস্ত সম্পর্কিত আসল ব্যাপারটা সম্প্রতি জানা গেছে। দরখাস্ত তারক একখানাও পাঠায়নি। পাঠাবার খরচটা লাগিয়েছে হাত খরচে। মহকুমা সহরের গাঁ-ঘেসা গ্রাম,—পোস্টাপিস শহরে। পোস্টাপিসে কিছু রেজেস্ট্রী করলেই রসিদ পত্র পাওয়া যায়, দরখাস্তের পেঁছান সংবাদ আনাবার ব্যবস্থাও করা যায়। কিন্তু সকালে সহরে গিয়ে অধিকাংশ দিন চিঠিপত্র তারক নিজেই নিয়ে আসে। দুপুরে যদি সে ঘুমোয়, ঘুমোয় বৈঠকখানায়। পিয়ন ডাক দিয়ে যায় তারই কাছে।

হয়তো বাপ কোনদিন প্রশ্ন করেছেন, 'দরখাস্তটা পেঁছিল কি না—'

'হ্যাঁ, পেঁচেছে। কাল এ্যাকনলেজমেণ্ট এসেছে।'

বাপ তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ঘুরে ফিরে আড্ডা দিয়ে কর্মহীন জীবনযাপন করুক, ছেলে তার কোনদিন মিথ্যা বলেনি, প্রবঞ্চনা করেনি। সেই ছেলের এতদূর অধঃপতন হয়েছে কে ভাবতে পারত।

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে নালিশের বোঝা হাল্কা করতে করতে বাপ কাঁদতে লাগলেন। কিছু না জেনে ও না বুঝে মাও তাতে যোগ দিলেন। গাঢ় চটচটে স্নেহের কবল থেকে মুক্তি পেতে তারক সবে মুখ তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অনিশ্চিত আদর্শের টানে বাইরে একটা এলোমেলো দিশেহারা জীবন গড়ে তুলবার চেষ্টা আর কতগুলি বই পড়া বিদ্যা দিয়ে বাঙ্গালী বাপ মা'র একেবারে বুকের তল থেকে উৎসারিত এই সর্বনেশে লাভা-প্রবাহ ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা তারকের জন্মায়নি। সেও তাই অনিচ্ছায় কাঁদ কাঁদ হয়ে গেল।

'তোমায় ঠকাইনি বাবা। শোন বাবা শোন, জোচ্চুরি করার এ্যাতটুকু ইচ্ছে আমার ছিল না। আরে, কথাটা শোনই না আমার আগে!'

তারকের ব্যাকুলতা দেখে বাপ-মা চুপ করে গেলেন। তারক মন খুলে সব কথা তাদের বুঝিয়ে বলল।

বাপের মনে কষ্ট না দিয়ে নিজের ইচ্ছা বজায় রাখার জন্য সে এই প্রবঞ্চনাটুকু করেছে। আর কি উপায় ছিল তার বলুক তার বাপ-মা? দরখাস্ত একটা লেগে গেলে তার যে সর্বনাশ হয়ে যেত। এদিকে দরখাস্ত পাঠাতে না চাইলে বাড়িতে অশান্তির সীমা থাকত না, রাত্রে ঘুম না হওয়ায় বাপের তার শরীর খারাপ হয়ে যেত, তাই না তাকে এ কাজ করতে হয়েছে! বাপ মা'র মুখ চেয়ে যা সে করেছে তারই জন্য তার গঞ্জনা।

সাত দিন বাপ ছেলের সঙ্গে কথা কইলেন না, ছেলেও সকাল থেকে রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত বাইরে বাইরে কাটাতে লাগল। দুটো রাত বাড়িই ফিরল না। মা কেঁদে ককিয়ে অস্থির হলেন। একটা দোষ করে ফেলেছে বলে অত বড় ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা! ছেলে যদি তার মনের ঘেন্নায় বনবাসী হয়?

সাত দিন পরে তারক যখন দুপুরে ভাত খেতে বাড়ি ফিরেছে, বাপ প্রায় ক্ষমাথীর মত কাতরভাবে ছেলেকে বললেন, আমায় ঠকালে কেন ? চাকরী করবে না বললেই পারতে !'

ছেলে দাওয়ায় বসে গায়ে তেল মাখতে মাখতে জবাব দিল, 'হুঁ।'

ছেলে গায়ে তেল ঘষে আর বাপ মা'র মুগ্ধ সম্মোহিত দৃষ্টির সামনে ছেলের বুকে পিঠে কাঁধে ও বাহুতে পেশীগুলি নড়ে চড়ে। দু'জনের মনে হয়, তারাই যেন ছেলের কাছে কত অপরাধে অপরাধী।

স্নেহের উচ্ছ্বাসে ধরা গলায় মা বললেন, 'আমাকেই নয় চুপি চুপি বলতিস ?'

ছেলে উদাসভাবে বলল, 'অনেকবার বলেছি। তোমরা শুনবে না তো কি করব আমি ? দরখাস্ত না পাঠালে বাবা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রাণ বার করে ছাড়বে, রাত্রে ঘুমোবে না, শরীর খারাপ করতে থাকবে। আমি কি করব না ঠকিয়ে ?'

'চাকরী তুই করবি না ?'

'না।'

'এমন করে ভেসে ভেসে বেড়াবি ? বিয়ে করবি না, সংসার করবি না, বাইরে বাইরে দিন কাটাবি ?' বাপ বললেন।

'আমি তা বলেছি ?'

'তবে চাকরী করবি না কেন ?'

তারক জবাব দিল না।

মা মরিয়া হয়ে বললেন, 'চাকরী না করিস, বিয়ে কর। একটা বৌ এনে দে আমায়। পুরুষ মানুষ, দিন তোর একরকম কেটে যাবে, বৌ নিয়ে ঘর করার সাধটা আমার মেটা বাবা ! আরেকজন তো বিয়ে করে বছর না কাটতে বৌ নিয়ে চলে গেল কোন্ মুল্লুকে। পোড়া অদেষ্টে ছেলের বৌ নিয়ে ঘর করা কি আমার নেই রে তারু।' মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

তারক ভেবে চিন্তে বলল, 'আচ্ছা সে হবে'খন। যাক না দু'দিন।' বাপ-মা'র যেন চমক ভাঙ্গল। ছেলের তবে বিয়ে করবার মন হয়েছে। তাই এমন নোঙ্গরহীন নৌকার মত সে ভেসে বেড়ায়, উদাসহীন হয়ে থাকে। চাকরী বাকরী কোন কিছু করার দিকে তাই তার মন নেই ! বড় ছেলের ওপর দু'জনের রাগের অন্ত থাকে না। তারই পরামর্শে ভুলে তারকের তারা এতদিন বিয়ে দেন নি, তারক কবে নিজে উপার্জন করবে তারই অপেক্ষায় দিন কাটিয়েছেন। উপার্জনক্ষম না হলে ছেলের বিয়ে দেওয়া তার মতে উচিৎ নয়। সংসারে যেন সবাই উপার্জনক্ষম হয়ে বিয়ে করছে। বিয়ের পরে সংসারে যেন কেউ উপার্জন করে না।

বিয়ের পরেই বরং উপার্জনে মন বসে ছেলেদের।

বাপ মেয়ে খুঁজতে থাকেন, ছেলে রামবাবুর বাড়ির আসরে পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে তর্ক করে, চায়ের দোকানে আড্ডা দেয় বন্ধুদের সঙ্গে, এ গ্রামে ও গ্রামে মিটিং করে বেড়ায়।

রামবাবু বলেন, 'এবার রিলিফ ওয়াকে' বেশী জোর দিতে হবে। তুমি একটু লাগো তারক।'

তারক বলে, 'কি লাভ হবে ?'

'যে ক'জনকে বাঁচানো যায়। তাছাড়া, এ অবস্থায় রিলিফ ওয়ার্ক না করলে লোকেই বা বলবে কি ?'

'আমি ওতে নেই। ভাল করে দুর্ভিক্ষ হোক, । লোক মরুক।'

রামবাবু সন্দিগ্ধভাবে বললেন, 'তুমি যা ভাবছ তা কি হবে ?'

তারক আশ্চর্য হয়ে বলে, 'হবে না ?' আপন জন মরছে, নিজে মরতে বসেছে, মানুষ মরিয়া হবে না ! কি যে বলেন !'

রামবাবু তবু সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়েন, 'তা বোধ হয় হবে না তারক।'

'দেখাই যাক না, হয় কি না হয়।'

'যদি হয়ও, রিলিফ চালাতে দোষ কি ? রিলিফ দিয়ে কতটুকু ঠেকানো যাবে !'

'আমি ওতে নেই।'

সুন্দর স্বাধীন জীবন। অলস মন্থর, সরস। কোথাও নিয়ম নেই, বাধ্য-বাধকতা নেই, রাজকতাও নেই। আর বেশী রোজগার দিয়ে তার কি হবে ? নেহাৎ দরকার হয়, সদরে চায়ের দোকান দিয়ে বসবে একটা। দেশের অবস্থা খারাপ ছিল, বেশী খারাপ হয়েছে। সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সবাই যেন কেমন নিঝুম হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে সকলের মুখ। নন্দীদের মা সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। পয়সা দিয়ে লোকে ভাতের ফ্যান কিনছে—ফ্যান যারা চিরদিন নর্দমায় ফেলে দিত তাদের রোজগার হচ্ছে, দু'চার পয়সা। গাছের পাতা খেয়ে অনেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে। অনেকে আবার ও চেষ্টাটা করছে না খেয়েই। এসব গুরুতর কথা বৈকি, ভয়ংকর কথা! তারক এসব কথা ভাবে। সবাই যা ভাবছে, সবাই যে বিষয়ে আলোচনা করছে—সেও সেকথা যতদূর সম্ভব ভাবে। দুরবস্থার ছাড়া ছাড়া চরম উদাহরণগুলি তাকে পীড়িত করে। বিধু খুড়োর বাড়িতে হঠাৎ ঢুকে পড়ে সেদিন সে কি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। খুড়োর অত বড় সোমত্ত মেয়েটা ছেঁড়া গামছায় গা ঢেকে পাটপাতা বাছছিল, লাফিয়ে উঠে ঘরে ঢুকতে গিয়ে গামছাটি তার থেকে গিয়েছিল বাইরেই। ভাবলেও তারকের হাসি পায়। না, দুঃখও হয়। বুকের মধ্যে টনটন করে। দেশের তরুণী যুবতী মেয়েগুলির পর্যন্ত এ-দশা হয়েছে ? ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো ইস্তাহারের ভাষায় তার মন বলে ওঠে, যে দুঃশাসন আজ ঘরে ঘরে দ্রৌপদীর···

এসব ভাবনার মধ্যে বৌ-এর ভাবনাটা বার বার আসা-যাওয়া করছে আজকাল। বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু না থাক, একটি লতাবৎ কোমলাঙ্গী সুন্দরী মেয়েকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে পাবার কল্পনা বেশ রঙীন হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে সে একেবারে মশগুল হয়ে যায়।

বেশী দিন কল্পনার খেলা নিয়ে থাকবার সুযোগ কিন্তু তারকের ভাগ্যে জুটল না। চৈত্র শেষ হয়ে বৈশাখ সুরু হতেই একদিন তার বিয়ে হয়ে গেল ! সদরের একজন মোক্তারের মেয়ে। বেশ দেখতে। সবই যেন বেশ বৌটির। চলাফেরা ওঠা বসা বেশ, লজ্জা বেশ, আত্মসমর্পণ বেশ, ঠোঁট বেশ, ফিস ফিস কথা বেশ !

কিন্তু হায়রে তারকের ভাগ্য, পাঁচ মাসের মধ্যে এমন বেশ বৌটি কি না তাকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'তুমি চাকরী কর না কেন ?

তারক আহত হল। রাগ করে বলল, 'আমার খুসী।'

বলার সময় গলায় জড়ানো বৌয়ের আলবৎ হাতটি খুলে সে বোধ হয় ছুঁড়ে দিয়েছিল। এ অবস্থায় সব বৌ কাঁদে, বিনিয়ে বিনিয়ে মিনিয়ে মিনিয়ে কাঁদে। যে কান্না কোন নতুন স্বামীর সয় না। অনেক সাধ্যসাধনায় কান্না থামিয়ে তারক বৌকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল, কেন, সে চাকরী করবে না। বৌ চুপ করে শুনে গেল। তাকে বড় বেশী চুপচাপ মনে হওয়ায় সন্দেহের বশে অধ্যাপনা বন্ধ করে পরীক্ষা করে তারক দেখতে পেল, বৌ তার ঘুমিয়ে পড়েছে।

চাকরীর কথা বৌয়ের মুখে আর শোনা গেল না। মাসখানেক পরে বৌকে নিয়ে তারক গেল শ্বশুরবাড়ি। সারাটা দিন জামাই আদর ভোগ করার পর সে যখন জীবনের তুচ্ছতম ক্ষুদ্রতম সমস্যাটি পর্যন্ত ভুলে গেছে, তখন শ্বশুরমশায় তাকে ডেকে পাঠালেন বৈঠকখানায়। ঘরে পুরানো লণ্ঠনের আলো, কাঠের তাকে আর দরজা খোলা কাঠের আলমারীতে আদালতী নথিপত্রের পুরানো ধূলিমলিন স্তূপ। একেবারে চাষা মক্কেলের বসবার জন্য লম্বা বেঞ্চি আছে! একটু ভদ্র চাষীদের জন্য আছে মানুষের ঘষায় ঘষায় পালিশ করা চাটাই বিছানো নীচু তক্তপোষ। শ্বশুর মশায় টেবিল নিয়ে চেয়ারে বসেন। অতিরিক্ত একটা চেয়ার ও একটা টুল আছে। সমস্ত আসবাবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অত্যন্ত মোটা। সময়ের পোকা ভেতর থেকে জীর্ণ করে না ফেললে শত বছরেও ভাঙবে না।

মদন মোক্তার খানিকক্ষণ সম্পূর্ণ অন্য কথার ভূমিকা করে বললেন, চাকরী করে দেব কথা দিয়ে মেয়ে দিয়েছিলাম বাবা, ক'মাস ধরে সেই চেষ্টাই করছি। যুদ্ধের চাকরি ছাড়া তো চাকরিই নেই আজকাল। রায়সাহেব মজুমদার মশায় একটু খাতির করেন আমায়, তিনি একটা চাকরির ভরসা দিয়েছেন। যুদ্ধের চাকরি—তবে যুদ্ধে টুদ্ধে যেতে হবে না। আপিসের-কাজ, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক একটু ঘুরে আসা, আর কিছু নয়।'

সব ঠিক হয়ে আছে। দরখাস্ত পর্যন্ত তারককে পাঠাতে হবে না। রায়সাহেবের একখানা চিঠি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেই চাকরি হয়ে যাবে। বড় সাহেব বাঙ্গালী, অত্যন্ত ভালমানুষ। হাসিমুখে হয়তো দু'চারটে সহজ সাধারণ কথা জিজ্ঞাসা করবেন দু'চার মিনিট আলাপ করবেন, তারপর চাকরিটা দিয়ে দেবেন। কোন ভয় নেই তারকের, ইণ্টারভিয়ুতে আটকাবে না। চাকরীটা তার একরকম হয়ে গেছে ধরে নেওয়া যায় এখন থেকে।

কিন্তু—'

'কিন্তু কি বাবা?' শ্বশুরমশায় সস্নেহে জিজ্ঞেস করলে।

'না। কিছু না।'

আরও বেশী রাত্রে বৌ বলল—চাকরীর দরখাস্ত পাঠানো নিয়ে কি কাণ্ড করেছিলে আমি সব জানি। ছি ছি! এবার যদি কোন গোলমাল কর, আমি কিন্তু বিষ খেয়ে মরে যাব বলে রাখছি। মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারি না আমি।'

তারক গম্ভীর বিষণ্ণভাবে বলল, 'না, চাকরী এবার করতেই হবে। কোন দিকে ফাঁক দেখছি না।'

তারপর বৌ অবশ্য অন্য সুরে আরও অনেক কথা বলল। তারক চাকরী করলে দশের কাছে তার বৌয়ের কত গৌরব বাড়বে, ভবিষ্যতের জন্য কত নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, নিজেদের সংসার পাতা যাবে, তারককে সে প্রাণভরে কত ভালবাসতে পারবে, এইসব কথা।

তারক চুপ করে শুনে গেল।

কোনদিকে ফাঁক নেই। চাকরী এবার তাকে করতেই হবে। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলে সে খবর রায় সাহেবের মারফৎ শ্বশুর মহাশয়ের কাছে পেঁছে যাবে। এদিকে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেই চাকরীর জোয়ালে তাকে জুড়ে দেওয়া হবে, মুক্তি সে পাবে না। একবার চাকরী ধরলে ছাড়াও যাবে না সে চাকরী। বৌ অতিষ্ঠ করে তুলবে জীবন।

বৌ! একটা মেয়ে! তার জন্য চাকরী।

গাঁয়ের আর গাঁ-ঘেঁষা মহকুমা শহরের সহস্র শিকড় তার ছিঁড়ে যাবে, বন্ধু থাকবে না, অবসর থাকবে না, অনুগত ছেলেদের সেনাপতি হয়ে শোভাযাত্রা, মিটিং, পূজা-পার্বনের উৎসব করা যাবে না, রামবাবুর পার্টিতে যোগ দিয়ে চাষী মজুরদের জাগিয়ে তুলবার কল্পনা কোনদিন কার্যে পরিণত হবে না। রামবাবুর অনেক কাজ সে করে দিয়েছে। রামবাবুর অনুরোধে সেবার সে ঘুরে ঘুরে অনেক চেষ্টায় সাতশো চাষীকে সদরে এনে হাজির করেছিল। সেই থেকে রামবাবু তাকে রীতিমত শ্রদ্ধা করেন। দলে যোগ দিলে ভাল ট্রেনিং দিয়ে তাকে কলকাতা পাঠাবার কথা রামবাবু কতবার বলেছেন। সে না কি পারবে—অনেক কিছু করতে পারবে। ক্রমে ক্রমে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বেশী বেশী, ক্রমে ক্রমে সে উঠবে উঁচুতে, একদিন দেখা যাবে পার্টির সে একজন বড় নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ কাল করে পার্টিতে আর নাম লেখানো হয় নি। ট্রেনিং, ডিসিপ্লিন, দায়িত্ব, এইসব কথাগুলো সম্বন্ধে তারকের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে, ভয় আছে। রামবাবুর সঙ্গে ট্রেইন্‌ড ডিসিপ্লিন্‌ড দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সহকারী হিসেবে দু'তিন সপ্তাহ সে কাজও করেছে, জলে ভেজা, কাদা ভাঙ্গা, নোংরা পার্টি ইঁট মাথায় দিয়ে শোয়া, এসব কষ্টকে সে কষ্ট বলেই গণ্য করে নি। বন্ধু, তাস, রেস্টুরেন্ট, সিনেমার অভাব অনুভব করার সময়ও পায়নি। কিন্তু এখানে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, কিছু করা বা না করা ছিল তার ইচ্ছাধীন। একবার দলে ঢুকে পড়লে যদি একই সময়ে তার নিজের সিনেমা যাওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে দলের কোন নির্দেশের সংঘর্ষ বাধে?

সমস্ত পথ তারকের নির্যাতিত মন এবারকার মত রেহাই পাবার উপায় খুঁজে আকুলি বিকুলি করে। বৌ সারা মন জুড়ে থাকলেও সে স্পষ্ট অনুভব করে, সমাজ সংসার মিছে নয়, শুধু সংসারটাই মিছে।

ষ্টেশনে একটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে তারককে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সে রামবাবুর পার্টির লোক। রামবাবু আগেই চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। ছেলেটির নাম শৈলেশ। আকারে সে খুব ছোট, তবে খারাপ দেখায় না। বালকের মত সর্বাঙ্গের হ্রস্বতায় সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। মস্ত একজোড়া চশমা তার মুখে সর্ব-বিদ্যাবিশারদের ছাপ ফেলেছে। তাতেও সামঞ্জস্য নষ্ট হয়নি।

'রামলালবাবু এমন বর্ণনা দিয়েছেন আপনার যে দেখেই চিনতে পেরেছি। আসুন আমার সঙ্গে। বিছানা এনে ভালই করেছেন।'

শৈলেশ বিস্মিত হয়ে বলল, কমরেড চক্রবর্তী যে লিখলেন, আপনি আমাদের সঙ্গে ক'দিন থাকবেন? যাকগে, নেয়ে খেয়ে বিশ্রাম করবেন চলুন তো, তারপর মেসের কথা ভাবা যাবে।'

শৈলেশ হাসল, 'আমাদের ওটাও একরকম মেস—একটু খাপছাড়া মেস।'

গলির মধ্যে দোতলা একটি পুরানো বাড়ি, নিচের তলাটা একটু স্যাঁতস্যাঁতে। দোতলার সিঁড়ি কাঠের এবং ধাপগুলি অপ্রশস্ত। বিশেষ কায়দায় পা ফেলে ওঠানামা করতে হয় এবং কায়দাটি আয়ত্ত করতে রীতিমত কিছুদিনের অভ্যাস দরকার। ছোট বড় ঘর আছে সাতখানা। এই বাড়িতে কোনদিন পনের কোনদিন পঁচিশজন মেয়ে পুরুষ বাস করে। সংখ্যার বাড়তিতে কমতিটা হয় বেশীর ভাগ পুরুষদের। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় মেয়েরা অনেকে আসে যায়, কিন্তু তারা সকলে ঠিক এখানে বাস করে

না। আধ ঘণ্টা বাড়ির যেখানে খুসী বসে চুপচাপ চারিদিকে লক্ষ্য করলে আপনা থেকে মনে হয় কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার যেন এ বাড়িতে রয়েছে এবং মোটা রকম বাইরের উপাদান সংগ্রহ করে একটি সার্বজনীন পরিবার সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির চার জোড়া স্বামী-স্ত্রীকে আবিষ্কার করতে তারকের বেলা দুপুর হয়ে গেল। অনাবশ্যক পরিচয় কেউ করিয়ে দেয় না, আবার অকারণে কেউ আলাপ-পরিচয় করে এমনভাবে যেন জের টানা হচ্ছে বহু পুরানো বন্ধুত্বের, নাম-ধামটা জানাই শুধু বাকী ছিল।

এক ঘরে জন পাঁচেক যুবক তর্ক করছিল, এক কোণে শাড়ীর পাড়ের ঢাকনি দেওয়া বাক্সের ওপর বই রেখে পড়া করছিল তরুণী একটি বৌ। ঘরের মাঝখানে সতরঞ্জিতে তারককে বসতে দেওয়া হয়েছিল। মুখ হাত ধুয়ে যেই সে আবার সেখানে বসেছে, পাঠরতা বৌটি উঠে গিয়ে তাকে এক কাপ চা আর দু'খানা আটার রুটি এনে দিল। তারপর দিল নিজের পরিচয়। 'আমি পুষ্প সোম। কমরেড নিশীথ সোমের স্ত্রী; ওই উনি।'

নিশীথ এক গাল হেসে তারকের মনোহরণ করে বলল, 'দাঁড়ান মশায় একটু, কথাটা শেষ করেনি। তারপর ভাল করে আপনার সঙ্গে পরিচয় করছি।'

কি কথা শেষ করতে চায় ওরা। চায়ে ভিজিয়ে রুটি চিবোতে চিবোতে তারক গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। মনটা তার এলিয়ে যায়। আলোচনার কোন ধারাই সে ধরতে পারে না। নাম শোনে সে শোনা লেখকের পড়া বই-এর, জানা বাদ ও পন্থার, অথচ প্রত্যেকের কথা তার দুর্বোধ্য মনে হয়। শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ নিয়ে পাঁচজনে যেন মুখে মুখে ডক্টরেটের থিসিস তৈরী করছে।

শৈলেশ তাকে পৌঁছে দিয়েই কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ফিরে এসে বলল, 'চুপ করে বসে আছেন যে? ঘরে ঘরে যান, আলাপ করুন সকলের সাথে। চুপটি করে বসে থাকলে কেউ আপনার দিকে তাকিয়েও দেখবে না।'

তারক সেটা ক্রমে টের পাচ্ছিল। কেউ আসছে কেউ যাচ্ছে, কেউ খানিক বসে জামা তুলে গায়ে তেল মাখছে। পাশের ঘরের একটা পার্টিতে শুয়ে দু'জন এত বেলায় ঘুমিয়ে আছে. হলুদ-পেশার রঙ লাগানো হাতে একটি মহিলা ঘরে ঢুকে ট্রাংক খুলছেন নিঃশব্দে—চাবির গোছার একটি চাবি ঝিনিক করে শব্দ করতে পারছে না।

শৈলেশ আবার বলল, 'ফাঁকা ভদ্রতা করবার পাট আমাদের নেই। সময় কোথা? এমন ব্যস্ত সবাই!'

ব্যস্ততার লক্ষণগুলি একটু বেখাপ্পা মনে হওয়ায় তারকের মনে উল্টো ক্ষোভ জেগেছিল। ঘুমন্ত আর আড্ডারতদের দেখিয়ে সে একটা মন্তব্য করল। শৈলেশ অনায়াসে রাগ করতে পারত। রাগ না করে সে শুধু বলল, 'ওরা দু'রাত জেগে ভোর চারটেয় ঘুমিয়েছে। আর ওরা আড্ডা দিচ্ছে না, কনফারেন্সের ব্যবস্থা আছে। সত্যেরই কনফারেন্স হবে।'

কনফারেন্স সম্বন্ধে আলোচনা না কি এই? প্যাণ্ডেল, চেয়ার, সতরঞ্চি সভাপতি, রিসেপসন কমিটি—এসব কথার উল্লেখও নেই কারো মুখে, ডেলিগেটদের থাকা ও খাওয়ার কথা নিয়ে তুমুল তর্ক নেই, এর মধ্যে কনফারেন্স-প্রসঙ্গ আছে কোথায়? তারক শুনতে পায় নিশীথ বলছে, 'তোমরা খালি চাষী চাষী করছ, দেখতে পাচ্ছ না চাষীদের টানা কত শক্ত? ফ্যুডেল সীস্টমের শেষ গাধাবোট পর্যন্ত কি ওদের তোমরা বলতে পার? দু'চার বংশ ওরা এমনিভাবেই কাটাবে। মজুরদের ডাকলেই আসে। ওরা সোজাসুজি ক্যাপিটালিস্ট সীস্টমের চাপে এসে পড়ে। ছ'মাস আগে যে চাষী

ছিল হাজার বোঝালেও সে কিছু বুঝত না, ছ'মাস ফ্যাক্টরীতে কাজ করে তার বোধশক্তি জন্মে। জিন্দাবাদ বলতে শেখে। বড়লোকের টাকা আগে ইণ্ডাস্ট্রিতে না লাগলে—'

দীঘল নাক উঁচু কপালে করুণা ব'লে 'তা'তে ক্যাপিটালিস্ট প্রশ্রয় পাবে।'

নিশীথ বলে, 'পাবে। মজুরও বাড়বে। সীস্টেমটাকে গড়ে উঠতে না দিলে কি ভাঙ্গবার জন্য তুমি বিপ্লব আনবে, লড়বে কার সঙ্গে? শিশুর সঙ্গে যুদ্ধ চলে না। কলকারখানায় যে টাকা খাটে সেটা অন্ততঃ ক্যাপিটালিস্টের পকেটে থাকে না, বৃটিশ ফরেন এক্সচেঞ্জের ইণ্ডিয়ান ডেবিট ক্রেডিট নামে উল্টো গতি পায় না। কলকারখানায় টাকা খাটুক, ক্যাপিটালিস্ট বাড়ুক। লক্ষ লক্ষ বাড়তি বেকার-চাষী মজুর হোক, তখন কিছু করা যাবে। কোন দেশে কোন কালে ক্যাপিটালিস্টের পকেটের টাকা কেউ বাগাতে পারে নি, কারণ ও টাকাটা তখন আর টাকাই থাকে না।'

কোটপ্যাণ্ট পরা সীতানাথ পা ছড়িয়ে দু'হাত্ত ভর দিয়ে বসেছিল—'তুমি সব সময় কোন কালে কোন দেশের কথা বল।' অথচ তোমার হিস্টরিক্যাল সীমেট্রিক বোধ নেই, ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাকগ্রাউণ্ড তোমার কাছে ঝাপসা হয়ে আছে, তুমি শুধু ইণ্ডিয়াকে দেখতে পাও। তুমি ভুলে যাও যে সোস্যাল সায়েন্সের নিয়মগুলি দেশ কাল নিরপেক্ষ।'

নিশীথ মৃদু হেসে বলল, তুমিও ভুলে যাও সোস্যাল সায়েন্সের শৈশবও এখনো উৎরোয় নি। তোমাদের কি হয়েছে জানো, সোভিয়েট নেতাদের দৃষ্টি দিয়ে দেশকে দেখছ। রাগ করো না, একটা উপমা দিচ্ছি। ইংরেজীপনা একদিন যেমন আমাদের মধ্যে মত্ততা এনেছিল, তোমাদেরও তেমনি রুশপনার মত্ততা এসেছে। এখনো স্বদেশীপনার রূপ দিতে পারেনি, জাতি না হয়েই আন্তর্জাতিকতার মন্ত্র জপছে। মস্কো থেকে ইংলণ্ড হয়ে ভারত হয়ে একটা তার মস্কোতে পেঁচেছে—এই হল তোমাদের আন্তর্জাতিকতার রূপ। ভারতে শুধু তারটা আছে—আস্ত তার, এখানে ওখানে কেটে একটা টেলিফোন বসাতে পারনি। নস্কো-ইংলণ্ড আন্তর্জাতিকতার তারটা ভারতে শুধু হাওয়ায় কেঁপে একটু গুঞ্জন করেছে, তাতেই তোমরা খুসী! তা, সে তারটাও কট করে কেটে দিয়েছেন সেদিন।'

তারক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাতে শৈলেশ তাকে আলোচনার গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে দিল। কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে পার্টির মনোভাব কনফারেন্সে স্থির করা হবে। এরা প্রস্তাব তৈরী করতে বসেছেন। কনফারেন্সের ব্যবস্থা? সেসব ঠিক করাই আছে। খুব কম রেটে একটি হল ভাড়া পাওয়া যায়, সেখানে কনফারেন্স বসে। কনফারেন্স এক রকম লেগেই আছে, স্থায়ী ব্যবস্থা ছাড়া কি চলে?

কনফারেন্স এক রকম লেগেই আছে! এমন হাস্যকর শোনায় কথাটা তারকের কাছে। সপ্তাহে সপ্তাহে দুর্গা পূজার সংবাদ যেন শৈলেশ তাকে দিয়েছে।

তারপর এক সময় পুষ্প তার বেণীকে খোঁপায় পরিণত ক'রে বই খাতা নিয়ে কলেজ যায়, নিশীথ করুণা সীতানাথেরা আরও বেলায় কথা কইতে কইতেই তাকে একটা সম্ভাষণ পর্যন্ত না জানিয়ে কোথাও ডুব মারে, একা সে বসে থাকে নির্জন ঘরে। মনে মনে কুপিত হয়ে ভাবে, ভাত খেতেও কি তাকে কেউ ডাকবে না? কোথায় কার কাছে ভাত পাওয়া যাবে আবিষ্কার করে তাকে আবেদন জানাতে হবে না কি? নাঃ, উদ্ভট খাপছাড়া মানুষ এরা, এরা সবাই এক একটা কুষ্মাণ্ড। কিছু হবে না এদের দ্বারা। ফাঁকা বিনয় আর বাড়াবাড়ি ভদ্রতা বাদ দিতে গিয়ে এরা মানুষের ফাঁক সৃষ্টি করছে। নইলে তাকে এমন অবহেলা করে। রামবাবু হয়তো লিখেও দিয়েছেন, সে

খুব কাজের লোক, তাকে পার্টিতে ঢোকাতে পারলে অনেক লাভ হবে পার্টির। অথচ তার সম্বন্ধে কারও এতটুকু মাথা ব্যথা নেই।

দোতলার রেলিঙে আর উঠানের তারে কত ধুতি আর শাড়ী ঝুলছে, কে জানে তার কথা ভুলে খেয়ে দেয়ে সকলে বিশ্রাম করছে কি না।

দরজার বাইরে যেতেই ওপর থেকে ফড় ফড় করে একটি কালো পেড়ে কাচা শাড়ী নেমে এসে তার মাথায় ঠেকল। মুখ তুলে তাকাতেই মনোজিনী বলল, 'আসছি।'

নিচে এসে বলল, খাবেন আসুন। খিদেয় পেট জ্বলছে নিশ্চয়ই? আমারও জ্বলছে। একটা একস্ট্রা ক্লাস ঘাড়ে চাপিয়ে দিল, তাই দেরী হয়ে গেল ফিরতে।'

এখানে এসে একবার শুধু মনোজিনীকে তারক দেখেছিল, কলতলায় কয়েকটা সার্টে সাবান দিচ্ছে। দেখে তার মনে হয়েছিল মানুষের চেহারায় এত বেশী বিষাদের সমাবেশ সে জীবনে কখনো দেখেনি। অজানা কারো চেহারায় দূরে থাক, অতি চেনা কোন হতভাগীর চেহারাতেও নয়, যার জন্য সহানুভূতিতে চোখ পর্যন্ত তার সজল হয়েছে। তখন পরিচয় হয়নি, শৈলেশ শুধু পরিচয় দিয়েছিল।

এবার নিচে নেমে এসে তারকের সঙ্গে ভাত খেতে বসে মনোজিনী নিজেই তার বিস্তারিত পরিচয় দিল। মনোজিনীর স্বামী বনবিহারী ছিল এক কলেজের লেকচারার, মাস ছয়েক হ'ল জেলে আছে। তার বছরখানেক আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল এবং এই বাড়িতে দ'জনে সংসার পেতেছিল—অর্থাৎ বাস করছিল। বনবিহারী জেলে যাবার পর বাড়ি ছেড়ে যেতে মনোজিনীর মন চায়নি, বাপ মা ভাই বোন সেধে সেধে ফিরে গেছে। শেষে পার্টির কয়েকজন মিলে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে এবং একসঙ্গে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'কিন্তু তাই বলে যেন মনে করবেন না দিনরাত আমি ফঁকিয়ে কাঁদছি ভেতরে ভেতরে। আমার চেহারাটাই ওমনি, দেখলেই মনে হয় একটা অদ্ভুত মনোকষ্টে আছি। এ অবস্থায় যতখানি দুঃখ হওয়া উচিত তার বেশী সত্যি কিছু হয়নি।'

সামনা-সামনি পিঁড়িতে বসে দু'জন একসঙ্গে খাওয়া সুরু করেছিল। তারকের থালাটা আগে সাফ হয়ে যাওয়ায় মনোজিনী ভাত গিলে হাসল।—'ইস। আপনি মফঃস্বল থেকে আসছেন, এমন যোয়ান চেহারা আপনার, আমার একবার খেয়ালও হয় নি চাল বেশি নিতে হবে। আপনার জন্য মাছ আনা হ'ল বিশেষ ক'রে খেলেন আধপেটা। কি আর করবেন ওবেলা পেট ভরে খাবেন।'

'আপনারা মাছ খান না?'

'খাই। পয়সা বাড়লেই খাই। জানেন তো আমাদের অবস্থা, কেউ, চাকরী করে, কেউ শুধু আমাদের কাজ করে, চাকরীর জন্যে তাদের স্পেয়ার করা চলে না। সবাই তো খাবে?'

তারক জোর দিয়ে বলল, খাবে বৈকি। না খেলে কি চলে?'

মনোজিনী স্বাভাবিক বিষাদে হাসল, 'চলে না? বহু বহু লোকের না খেয়ে চলছে। একেবারে ফুটপাত থেকে নরক পর্যন্ত। তবে আমরা ডাল ভাতটা কিছু পরিমাণে খাই। তাই কয়েকজনকে চাকরী করতে দেওয়া হয়। যেমন ধরুন আপনি, কায়দা কানুন ভাল করে শিখতে আপনার দু'চার বছর লাগবে; এই দু'চার বছর আপনি চাকরী করলে পার্টির লাভ বই ক্ষতি নেই।

এরাও তাকে চাকরী করাতে চায়! এরা ধরে নিয়েছে সে দলের লোক, চাকরীও

করবে, ট্রেনিংও পাবে, পার্টির জন্য সব স্বার্থ ত্যাগ করবে। কে জানে কি চিঠি লিখেছিলেন রামবাবু এদের।

এই যে তারকের একবার মনে হল এরা তাকে বাঁধতে চায়, মন থেকে কথাটা সে আর দূর করতে পারল না। এরা কষ্ট করে থাকে, টাকার অভাবে প্রতিদিন মাছ পর্যন্ত খেতে পায় না, এটা ত্যাগ বলে জেনেও তারকের শ্রদ্ধা জাগে না। তার মনে হয়, এ নিছক দারিদ্র্য, যার কবল থেকে মুক্তি পাবার ক্ষমতা এদের নেই। এরা যে সে মুক্তি চায় না, বেঁচে থাকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে যতদূর সম্ভব বর্জন করে এরা কাজ করতে চায়, তাও তাও তারক জানে। তার চাকরীর টাকাটা এদের ভোগে লাগবে যতটুকু তার চেয়ে বেশী লাগবে পার্টির কাজে। তবু তারকের মনে হয়, আরেকটা সত্য আছে। এরা চায় না সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে বোধহয় এও সত্য যে চাইলেও এদের বেশী টাকা পাবার ক্ষমতা নেই। এদের এই ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকেও কোনদিন এরা ইচ্ছাকৃত স্বচ্ছলতায় পরিণত করতে পারবে না, পার্টির জন্যও যথেষ্ট টাকা সংগ্রহের শক্তি এদের নেই।

গোটা পাঁচেক আত্মীয় বন্ধুর বাড়ি দেখা-শোনার কর্তব্য পালন করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে দ্বিতীয় বাড়িতেই সে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। এটি তার চিরপরিচিত খাঁটি স্নেহার্ত নীড়, সমস্ত বাড়িটা যেন স্নেহের অশেষ বর্ষণে সেঁতসেঁতে হয়ে গেছে। ছোট বড় সকলের জীবন শ্যাওলার মত ভেলভেট কোমল,। সকাল থেকে আটকানো নিঃশ্বাস যেন এখানে এসে পড়ল তারকের. তেলমাখানো চাবি দিয়ে একবেলার মরচে ধরা তার মনের ক'টা বিশেষ তালা এরা খুলে দিল। কথা কইতে কইতে জুড়িয়ে জুড়িয়ে এমন হল তারকের যে কথা কইতে গিয়ে ঘুমে তার চোখ জুড়িয়ে আসতে লাগল।

'বাছারে! ঘুমোস নি বুঝি গাড়িতে ;'

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা পাতা হল, ঘর নির্জন হল, দুয়ার ভেজানো রইল। এটা স্বাভাবিক। আপন কারো সর্দিজ্বরে এবাড়িতে শঙ্কার আবির্ভাব পথের পথিক টের পায়. ঘুম-উপোসী তারকের জন্য এটুকু হবে না ?

আদুরে ছেলে তারকের একগুয়েমি বড় হয়ে খানিকটা রামবাবু, খানিকটা বইপত্র আর খানিকটা তার মানসিক সজাগত্বের মারফতে পাওয়া গভীর মর্মভেদী অনুভূতির আশ্রয়ে সংযত হয়ে থাকত। মাঝখানে একবার ছেদ পড়ে আবার এই চেনা জগতটার ছোঁয়াচ লেগে পরিণত হয়ে গেল মননশীল গুন্ডামিতে। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল বাংলার পাকা দালানগুলি ভেঙ্গে পরিবারগুলি যদি ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত! যদি মায়ের বুকের মাংসল চাপে একেবারে নিরামিষাশী না হয়ে উঠত বাঙ্গালী ছেলেগুলি ছাগল-ছানার মত। শুকনো কাপড়ের মত মনুষ্যত্ব ছেড়ে রেখে যদি না ব্যাং হয়ে ঝাঁপ দিত নির্জলা মরুর কূপে। এত যদি সস্তা না হ'ত নীহারিকার দেশে যাওয়ার ভাড়া আর সহজ, স্বাস্থ্যকর, অমৃতময় একটি ঘণ্টাকে বহু ঘণ্টা করার জন্য গভীর দুখে দুখী হয়ে মুখোমুখী চেয়ে থাকার মোদক।

দেহের শ্রান্তিতে নয়, ঘুমের জন্যও নয়, মগজের বিড়ম্বনায় তারক ঘুমের আগে ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল। আসন্ন সন্ধ্যা পুরবীব্যথা দিয়ে অনুভূতিকে একটু আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করায় মনটা তারকের খিঁচড়ে গেল। অতি তুচ্ছ, অতি বাজে অনেক কথা বলাবলি হবে, চা ও জলখাবার খাবে, এখানে থাকতে না পারার গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখাবে, তবে তার মুক্তি। তারকের ফাঁপর ফাঁপর ঠেকতে লাগল।

হঠাই সে তাই করল কি, একে ওকে ডাক দিতে দিতে লাফিয়ে উঠে জামা পরতে সুরু

করে দিল, যারা এল তাদের সামনে দু'বার স্বগত উক্তিতে প্রকাশ করল যে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। উৎকণ্ঠায় উত্তেজিত ও কৌতূহলে আত্মাহত আপনজনের প্রশ্নের জবাবে বলল যে চাকরীর জন্য বিকালে যার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, এখন কি আর দেখা হবে তার সঙ্গে !

'চল্লাম। আরেকদিন আসব'খন।'

একটি কথাও কেউ কইল না। মনে সকলের হায় হায় জেগেছে। কেমন ছেলে এ, কাণ্ডজ্ঞানহীন ? ঘুমিয়ে একটা চাকরী হারালো। পথে নামবার আগে তারকের কানে বাজল ছোটদের কান্না কলরব, বড়দের নৈঃশব্দ।

শৈলেশ বলল যে এখনো সেই আলোচনা চলছে পার্টির আপিসে। তারক একবার যাবে কি ? সেক্রেটারীর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত তারকের। মনোজিনী আর সীতানাথ যাচ্ছে, ওদের সঙ্গে যে যেতে পারে। আপিস বেশী দূরে নয়। ফাইন্যাল ড্রাফ্‌ট্‌ ঠিক করে আজকে রাত্রেই ইস্তাহার ছাপতে যাবে।

'আপনি যাবেন না ?' জিজ্ঞেস করল তারক।

'আমি একটু বালীগঞ্জের দিকে যাব।' শৈলেশ জবাব দিল।

সীতানাথের অসন্তোষ চাপা রইল না—'উনি আজ আপিসে গিয়ে কি করবেন ! তার চেয়ে তোমার সঙ্গেই ওকে নিয়ে যাও শৈলেশ।' মনোজিনী গামছায় মুখ মোছা সাঙ্গ করে বলল, 'ক্ষেপেছো না কি তুমি ? শৈলেশ যাচ্ছে নিজের বিয়ের ঘটকালি করতে, শৈলেশের সঙ্গে উনি যাবেন মানে ? না তারকবাবু, আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে আপিসে।'

পথে নেমে তিনজনে হাঁটতে আরম্ভ করে। মনোজিনী দু'একটা কথা বলে তারক ও সীতানাথকে উদ্দেশ্য করে।' তারক জবাব দেয়, সীতানাথ চুপ করে থাকে। অল্প দূর গিয়ে হঠাৎ সীতানাথ থমকে দাঁড়ায়, বলে যে আপনারা এগোন আমি আসছি এবং বলেই দীর্ঘ পদক্ষেপে পাশের পথের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দু'জনে খানিকক্ষণ নীরব হেঁটে চলে। পথ আঁধার আলো শুধু দোকানে। একটা বিড়ির দোকানের আলো আইনভাঙ্গা দুঃসাহসিকতায় কয়েক মুহূর্তের জন্য মনোজিনীর মুখে পড়ায় তারকের মনে হয়, গামছা ঘষে, সে যেন মুখের বৈধব্যকে আরও বেশী অনাবৃত করছে।

'বড় মুস্কিলে পড়েছি ওকে নিয়ে। বড় জ্বালাতন করছে আমায়।'

'সে কি !' বলে হতভম্ব তারক খানিকক্ষণ কথা বলতে পারে না, তারপর মন্তব্য করে, 'আপনি প্রশ্রয় দেন কেন ?'

'প্রশ্রয় ?'

'অত গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কানে কানে কথা কইতে দিলে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।'

'আপনি—আপনি—' কি একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে গিয়ে মনোজিনী হেসে ফেলল। 'আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল। কি বলছিল শুনবেন ?—এ মূর্তিমান মফস্বলটি কে ! আপনার টেরি ওর পছন্দ হয় নি।'

'সেটা ওর সযত্নে এলোমেলো করা চুল দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু ওকে তো মূর্তিমান শহর বলে তো মনে হল না। শহরে ছোকরা ফাজিল হয়, ন্যাকা হয় না।'

'ন্যাকা নয়, ছেলেমানুষ। ওর কথা বাদ দিন।

মনোজিনীর কথার সুরে তারক হেসে ফেলল, 'তাই বলছিলাম, প্রশ্রয় দেন কেন ?'

মনোজিনী বলল, 'ও ! আপনি তাই ভাবছেন, আমার মনটা বিশ্লেষণ করে

ফেলছেন—আমার কোন খারাপ মতলব নেই, তবে ওকে নিয়ে খেলা করতে ভাল লাগছে, কেমন তো ? আপনি মফস্বল থেকে আসছেন খেয়াল ছিল না।'

'গেঁয়োই বলুন না স্পষ্ট করে, মফস্বল কেন ?'

মনোজিনী থমকে দাঁড়াল। ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে তার বুকে তর্জনী ঠেকিয়ে প্রত্যেকটি শব্দে জোর দিয়ে মিষ্টি সুরে বলল, 'তারকবাবু, আপনাকে অবজ্ঞা করে ওকথা বলিনি! মফস্বলের লোককে আমরা অবজ্ঞা করি না! আমি বলতে চাইছিলাম, আপনি বাইরে থেকে আসছেন, আমাদের কতগুলি চালচলনের অভিজ্ঞতা আপনার নেই। সেটা আপনার দোষও নয়। লজ্জার কথাও নয়।'

দুজনে আপিসের সামনে এসে পড়েছিল, বাইরে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে আর তর্ক চলে না। সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলার সরু প্যাসেজে ক'বার পাক খেয়ে দুজনে আপিসে পৌঁছল। মাঝারি সাইজের ঘর। একটি টেবিল, দুটি আলমারি, তিন জোড়া চেয়ার ও পাঁচটি বেঞ্চে ভরা। পোস্টার ও ইস্তাহারে আলমারি দুটি ঠাসা, টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো, সাজানো আছে শুধু কয়েকটি বাঁধানো খাতা ও ফাইল। একটা স্কুলে অনেকটা এইরকম ক্লাশরুমে তারক দেড় বছর পড়েছিল। চেয়ারগুলি ছাড়া বেঞ্চে যারা বসেছে ঠিক তাদের মত পাঁচ ছ'টি বেঞ্চে তারা আট দশটি ছাত্র ভাগে ভাগে বেঞ্চির অনেকটা খালি রেখে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসত।

সেক্রেটারী কি বলতে দাঁড়িয়েছিলেন মনোজিনী বাধা দিয়ে বলল, 'এক মিনিট কমরেড। এর সঙ্গে সকলের পরিচয়টা করিয়ে দি। রামবাবু এঁকে পাঠিয়েছেন।

সেক্রেটারী বললেন, 'আমার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় আছে।'

তারক জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

'চিনতে পারছ না ?'

'আজ্ঞে না, সার।'

বলেই সে যেন সারা শব্দটার ভেতর থেকে চেনার ইঙ্গিত পেতে লাগল। তারপর হঠাৎ মুখখানা তার হাসিতে ভরে গেল।

'এবার চিনেছি। আপনার কাছে একনমিকস্ পড়তাম। এখন কি করছেন স্যার ?'

'বাড়িতে বসে নিজের কাছে একনমিকস্ পড়ছি।'

সেক্রেটারী হাসলেন, 'কিন্তু সার সার কোরো না তারক, লোকে হাসবে।'

চারিদিকে তাকিয়ে তারক অসন্তুষ্ট হল। কেউ হাসছে না, সকলের মুখে শুধু সস্মিত। সেটাও হাসির পর্যায়ে পড়ে,—বিশুদ্ধ সভ্য হাসি। তাকে কেউ অপমান করতে চায় না, ঠাট্টা করতে চায় না, বরং হাসি মুখে পিঠ চাপড়ে প্রশ্রয় দিয়ে আপন করতে চায়। গেঁয়ো ভাবছে না কি সকলে তাকে ? আনাড়ি ভাবছে এসব পার্টির ব্যাপারে ?

গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে তারক উঠে দাঁড়াল। কথাগুলিতে অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলল, 'সার, আমার আপত্তি আছে সার। আপনাকে যদি সার না বলে কমরেড বলতে হয়, সার, আমি এখানে থাকতে চাই না সার।'

এ যেন একেবারে সন্ধি সম্পর্কে মিত্রপক্ষের ঘোষণা হয়, এস্পার নয় ওস্পার, মাঝামাঝি রফা নেই! বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলে এই উদ্ধত অমার্জিত অকুণ্ঠ গোয়ার্তুমির কমিক অভিনেতাকে দেখতে থাকে।

সেক্রেটারী গম্ভীর মুখে উদাসভাবে বলেন, 'তা তোমার যা ইচ্ছা তাই বলো।

এবার বসো তারক। দরকারী কাজটা সেরে নি।' কনফারেন্সের জন্য প্রস্তাবের খসড়াটি তিনি ধীরে ধীরে পাঠ করলেন। কেউ যে বিশেষ মন দিয়ে শুনল তা নয়, কারণ ওটা প্রায় সকলের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মহকুমা সহর-ঘেঁষা গাঁয়ে বাস করেও এলোমেলো ছাড়া ছাড়া ভাবে এই কথাগুলি তারও প্রায় সমস্তটাই শুনেছিলাম। কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা করে, কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার ও জেলার বাইরে এসে নতুন নীতি গ্রহণ করার দাবী জানিয়ে দেওয়াই প্রস্তাবের মূল কথা।

সকলেই প্রস্তাব গ্রহণ করল, নিশীথ পর্যন্ত। সে শুধু একবার জানিয়ে দিল যে প্রস্তাবটি সে সমর্থন করে না, তবে পার্টির খাতিরে গ্রহণ করল। এই নিয়ে একটু গোলমাল হল তারপর, সমর্থন না করেও প্রস্তাব গ্রহণ করার সঙ্গতি অসঙ্গতি নিয়ে। সিদ্ধান্ত যে কি হল শেষ পর্যন্ত কিছুই তারক বুঝতে পারল না। তারকের সমর্থন অসমর্থনের প্রশ্নই ছিল না, সে শুধু দর্শক, তার কোন অধিকার নেই এ ব্যাপারে কথা বলার। কিন্তু রীতিনীতি জানতে বা মানতে তো তখন পর্যন্ত শেখেনি তারক, নির্বিবাদে সে তাই সোজা স্পষ্ট ভাষায় এক প্রশ্ন করে বসল, 'আপনারা কি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালাবেন? কংগ্রেসকে গালাগালি দেবেন?'

সেক্রেটারী সংক্ষেপে জবাব দিলেন, 'না। গালাগালি দেওয়া আমাদের পেশা নয়।'

'রামবাবুও তাই বলেছিলেন আমাকে। আপনারা শুধু তাহলে একটা প্রস্তাব পাশ করতে চান? এর পেছনে কাজের কোন প্ল্যান নেই?'

সেক্রেটারী পূর্বতন ছাত্রের জেরায় একটু বিরক্ত হলেন।

'তুমি কিছু না জেনেই তর্ক করছ তারক। কাজ তো আমাদের চলছেই।'

'তবে একটা কনফারেন্স ডেকে এ প্রস্তাব পাশ করার দরকারটা কি ছিল বুঝতে পারছি না সার।'

এবার নিশীথ বলল, 'আপনার কথা খানিকটা ঠিক তারকবাবু। তবে এভাবে প্রসিড করা হয় মেথড রক্ষার জন্য। একটা পাবলিসিটি হয়, দশজন আমাদের পলিসি জানতে পারেন।'

মনোজিনী হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'থাক্ থাক্। ও সব পরে আপনাকে বুঝিয়ে দেব তারকবাবু।'

মনোজিনীর বিষাদ-করুণ মুখে সেই অপূর্ব হাসি দেখে তারক এবার ভাবল, থাক তবে। এদের খানিক সমারোহের সঙ্গে প্রস্তাব পাশ করানোর মতই কি আর লাভ হবে তার এই বাদ-প্রতিবাদে। কিন্তু তাকে চাকরী করতে হবে এই চিন্তার সঙ্গে এদের পার্টিতে যোগ দিতে হবে এ চিন্তাও তার মনে অবিরাম পাক খাচ্ছিল, অসংখ্য প্রশ্ন কিলবিল করছিল তার মনে। চুলকানির চেয়েও অবাধ্য হয়ে উঠেছিল প্রশ্নগুলি।

সে তাই মনোজিনীর জবাবে নিজেও একটু হাসি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করে বলল, 'সোজা মোটা কথাটাই বুঝতে পারছি না, পরে আর কি বুঝিয়ে দেবেন! কাজ যেমন চলছে তেমনি চলবে, আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, মিছেমিছি কনফারেন্স ডেকে পয়সা খরচ করা কেন? প্রস্তাবটিতে বলতে গেলে কিছুই নেই। আপনারা যে কংগ্রেসের নীতি সমর্থন করেন না, জেলের বাইরে থেকে আপনাদের কাজ করাটাই তার মস্ত প্রমাণ। পলিসি জোর গলায় ঘোষণা করলেই লোকে বুঝবে কংগ্রেসের পলিসি আপনারা মানছেন না। একটা উদ্দেশ্যহীন কনফারেন্স ডেকে লাভ কি?'

কে একজন বলল, 'সে আপনি বুঝবেন না।'

তারক আন্দাজে বক্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কেন বুঝব না? রামবাবু

অকারণে কিছু করেন না। কেন করেন না সেটা বুঝি। আপনাদেরটা বুঝব না কেন? রামবাবু কখনো জেনে শুনে এমন কনফারেন্স ডাকেননি, যা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হতে বাধ্য।'

মিলের রঙীন শাড়ী পরা একটি মোটা মেয়ে বলল, আপনি খোকার মত কথা বলছেন। রামবাবু কনফারেন্স ডাকবেন মানে? তাঁর কতটুকু এরিয়া! হেডকোয়ার্টার্স থেকে কনফারেন্স ডাকা হয়।'

পুষ্প দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছিল, গরম ঘরের ফোকর দিয়ে গলিয়ে একটু ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকার মত ছেলেমানুষ পুষ্প হঠাৎ বলে বসল, 'প্রস্তাবের কথা বাদ দিন না তারকদা। কনফারেন্সে সকলে একত্র হবে তো, চান্দিকে যারা ছড়িয়ে রয়েছে? সেটা বুঝি কম হল।'

'তা বটে। সেটা ঠিক।' বলে শেষ পর্যন্ত পুষ্পর কাছে হার মেনে তারক বসল।

তারক একদিকে খুশি হয় এই ভেবে যে পার্টি কংগ্রেসকে গাল দেবে না। শৈশব থেকে সে অন্ধ প্রীতি দিয়ে এসেছে কংগ্রেসকে! নতুন চিন্তার প্রধান ধারা থেকে ঘটি ও কলসী ভরে অনেক নমুনা তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে যুগ, ভাবতে শেখার লাঙ্গল-চষা মন তা শুষে নিতে বিলম্ব করেনি! কিন্তু হায়রে মন না মতি মানুষের, গেঁয়ো সতীর ভেতরে কে গোঁ ধরে আছে ফসল ফলাবে নেই একজন,—অবশ্য ঘটি কলসীতে সেচে নয়, বাঁয়ের মেঘের ধারা বর্ষিয়ে।

তারক বুঝতে পারে না কংগ্রেসকে বাইরে আনতে ব্যস্ত কেন এরা, এত অধীর কেন? এরা কেন অবাস্তব অর্থহীন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকবে বর্তমানে? আর তো কোন পথ নেই কংগ্রেসের। যে নামে হোক, যে ভাষায় হোক, যে পদ্ধতিতে হোক, এদের মূলনীতি গ্রহণ করতেই হবে কংগ্রেসকে, যে পথে চলতে এরা এত ব্যাকুল সেই পথেই হবে কংগ্রেসের গতি। তারকের কাছে এই সম্ভাবনা অপরিহার্য। ছোট ছোট পার্টির জন্ম, ভেদাভেদ, দলাদলি গালভরা নাম দিয়ে দল গঠন, এসব তারককে তার মহকুমা ঘেঁষা গাঁয়ে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি। যুদ্ধোত্তর ভবিষ্যতে নতুন ভাববন্যার আবির্ভাবে এতই দৃঢ় তার বিশ্বাস। বিরোধী যুক্তি, বিরোধী তর্ককে সে শুধু তার বিশ্বাস দিয়ে চিরকাল উড়িয়ে দিয়েছে।

রামবাবুকে সে বলে, 'দেশকে নিয়ে কংগ্রেস জেলে যায়নি!'

রামবাবু বলেন, 'দেশের মনকে ছেড়েও দিয়ে যায়নি।'

সে বলে, 'কিন্তু সংস্কার ছাড়া আর কিছু কি মনকে চলতে না দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে?' নতুন চিন্তাধারা কিভাবে ছড়াচ্ছে দেখতে পান না? আমরা তাই করব, চলতি মনকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের দেশপ্রেমে কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে আছে, ওই দেশপ্রেম থেকে জনমত গজিয়ে রাখব, মাটিতে যেমন ঘাস গজায়। কংগ্রেস জনমত ছাড়া দাঁড়াবার ঠাঁই পাবে না।'

রামবাবু বলেন, 'বেশ বলেছ। গোটা কয়েক মিটিং-এ ঘণ্টাখানেক এভাবে বলতে পারলে নেতা হতে পারবে, একটা পার্টি গড়তে পারবে। আরে বাপু, দেশের মন যদি নতুন পথে এগিয়ে গেল কংগ্রেসের কাছি ছিঁড়ে কংগ্রেস এসে নাগাল ধরুক বা না ধরুক কি এসে যাবে তাতে? বাড়ি গিয়ে ভেবে দেখো, কংগ্রেসটা কি বস্তু, আর তোমার মন কি বস্তু। গোড়ার কথা না বুঝে চড়া বিদ্যে আয়ত্ত কর বলেই তো তোমাদের ধাঁধাঁ ঘোচে না।'

তখন তারকের মনে হয়, সত্যিই সে ধাঁধাঁর আবর্তে পাক খাচ্ছে। বিশ্বাসকে

যতক্ষণ খাড়া করে তুলতে না পারে, ততক্ষণ হাঁসফাঁস করে তারকের মনটা।' প্রোডাকসন, ডিস্ট্রিবিউসন, ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম, সোস্যালিস্ট সিস্টেম ইত্যাদি সব জলের মত পরিষ্কার তার কাছে—অথচ দেশকে সামনে রেখে ভাবতে গেলে সব তথ্যবোধ তার গুলিয়ে যায়। বিদেশী বণিকের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা স্বদেশী বণিকের করায়ত্ত হতে দিতে তারকের আপত্তি নেই, কিন্তু তাও সম্ভব হবে একমাত্র সোস্যালিস্ট রাষ্ট্র গঠনের আয়োজন থেকে উদ্ভূত বিপ্লবের মারফতে। সে স্বাধীনতার মূল্য তারকের কাছে খুব বেশী নয়। তবু সে স্বাধীনতাই ক্যাপিটালিস্ট বৃটেনকে দুর্বল করবে, ভারতে ক্যাপিটালিজমের ধ্বংস সহজ হবে এবং তারক বিশ্বাস করে ভারতকে সোজাসুজি সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টার চেয়ে এই পন্থায় সেটা অনেক সহজে এবং কম সময়ের মধ্যে হবে।

শুধু বিশ্বাস, আর কিছু নয়। বিশ্বাসের ভিত্তিটা শক্ত করার জন্য যুক্তি, বিশ্লেষণ ও মনীষীদের সমর্থক উক্তি খুঁজে খুঁজে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেনি বলে তারকের মনে মাঝে মাঝে গভীর আপশোষ জাগে। কিন্তু মফঃস্বলের আলস্য বড় সাংঘাতিক জিনিস।

সবটুকু বিশ্বাস বজায় রেখেও খানিকটা টলমল মন নিয়ে তারক পার্টির বাসায় ফিরল। মনোজিনী সমস্ত পথ মন্তব্য করতে করতে এল। নাঃ নেতা নেই আমাদের। একটা নেতা নেই। ইস্, ভাবতেও কষ্ট হয় একটা ভাল নেতা নেই আমাদের, যে হাল ধরতে জানে।

কনফারেন্সের জন্য বাসায় লোক বেড়েছে, বাইরে থেকে কয়েকজন এসে এখানে উঠেছে। সকলের গল্পগুজব আলাপ-আলোচনার মধ্যে কিসের অভাব যেন পীড়ন করতে লাগল তারককে—সকলের আগ্রহ ও উৎসাহ তাকে সঞ্জীবিত করে তুললেও। কয়েকজনকে ছাড়া এদের চেনে তারক। ভেতরে বাইরে চেনে। এরা সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করেছে, সামরিক জাতির মানুষের মত সহজ, স্বাভাবিকভাবে। তফাত শুধু এই যে মরণকে এরা প্রাণ বিলিয়ে দেয়নি, জীবিতের জন্য দান করেছে জীবন।

খাওয়া শেষ করে সকলের শোয়ার ব্যবস্থা হতে অনেক রাত হয়ে গেল। তারকের বিছানা মনোজিনী বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল।

'আমার খাটে আপনারা তিনজন বালিশ ছাড়া শুধু গদিতে শোবেন। আপনার এই ক্ষুদে তোষকটি পাবে দু'জন। সুজনীটা বড় আছে ওটা পেতে আমরা—থি লেডিজ্।'

সীতানাথ দেয়ালে ঠেস দিয়ে সিগারেট টানছিল, হঠাৎ উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল, 'নাঃ আমি বাড়ি চললাম।'

মনোজিনী রাগ করে বলল, ট্রাম নেই, বাস নেই, কি করে যাবে? আগে গেলেই হত। কষ্ট করতে শেখো একটু।'

'কষ্ট আর কি।'

'তা মিথ্যে নয়। রীতিমত তোষক চাদরের বিছানা তোমাদের দিয়েছি, তিনটে মোটা মোটা বই পর্যন্ত পেয়েছ। আচ্ছা যাও, এই বালিশটাও তোমাকে দেয়া গেল।'

সতীনাথ বালিশটা নিয়ে দু'হাতে চেপে চেপে সেটাকে গোলাকার করবার চেষ্টা করে। তারক ভাবে, এটা একটা আস্ত বাঁদর। খাস জংলী বাঁদর।

'প্যাণ্ট পরে শোব না কি আমি?'

'আমি তার কি করব?'

'তোমার একটা শাড়ী দাও।'

'আমার শাড়ী নেই। একটা ধুয়ে দিয়েছি, একটা পরে আছি। তোমার বৌদির মত আমার দশ গণ্ডা শাড়ী থাকে না।'

তারক ভদ্রতা করে বলতে গেল, 'আমার একখানা কাপড়—'

মনোজিনী বাধা দিয়ে বলল, 'না, আপনার ধুতিটুতি ও পাবে না। বাইরে থেকে এসেছেন, কত দরকার হবে আপনার।—ওই গামছাটা তুমি পরতে পার সীতু। মস্ত গামছা, লুঙ্গির মত পরতে পারবে, আর কিছু জুটবে না।'

পুষ্প এসেছিল, মুখ বাঁকিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে সে বলল, 'আপনি বড় জ্বালান সীতুদা। কোথায় কোন বালিগঞ্জীর প্রেমে পড়বেন, এসে জ্বালাবেন আমাদের। অত আদর দিতে পারব না আমরা, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

মনোজিনী বলল, 'চুপ কর পুষ্প। কত আদর তুই দিচ্ছিস একজনকে ছাড়া অন্যকে!'

পুষ্প প্রতিবাদ করল, 'দিচ্ছি না? পরশু রাত এগারটা পর্যন্ত ঘুরিনি শৈলেশের সঙ্গে? বুঝিয়ে বুঝিয়ে হয়রাণ হয়ে শেষে আসল কথা ফাঁস করতে হল,—বীথির প্যাঁচড়া হয়েছে তাই কাছে ঘেঁসতে দেয় না। আমি বলেছি শুনতে পেলে বীথি কেমন চটবে বলত?'

পুষ্প চলে যাবার পর সীতানাথ হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'খাটে জায়গা নেই?'

মনোজিনী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

'খাটে শুতে চাও? আচ্ছা সুশীলকে বলছি তোমার জায়গায় শুতে।'

যাবার জন্য পা বাড়িয়ে মনোজিনীর বোধহয় মনে হল প্রশ্রয়ের দিকে পাল্লা ঝুঁকেছে। সে তাই মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, 'বালিশ পাবে না।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মীয়ের বাড়ি ঘুমিয়েছে, তারকের চোখে অনেকক্ষণ আর ঘুম আসে না। জীবনে সে এমন নরম গদিতে শোয়নি, তিন চার পরত পুরু তুলোর তোষককেই সে এতক্ষণ গদি বলে জেনে এসেছে। এটা তুলোর নয় নিশ্চয়। রিক্সার টুনটুন আওয়াজ তার কানে আসে। সারাদিন বাড়ির কথা, বৌয়ের কথা তার একবারও মনে পড়েনি, এখন চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে পুরানো স্মৃতির মত, প্রাচীন স্বপ্নের মত, ওসব চিন্তা ভেসে আসে। যেদিন খুসী বিকেলে ট্রেনে উঠে সকালে ওদের কাছে সে যেন আর ফিরতে পারবে না, একদিনে বহু যুগের ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘুমন্ত বাড়িতে তারক ভিড়ের সান্নিধ্য অনুভব করে। তার মহকুমা সহরে হাঙ্গার মার্চ করে যারা এসেছিল চারদিকের গাঁ থেকে, যাদের উদরহীন কাঁকালি মুষ্টিতে ধরা যাবে মনে হয়েছিল, তাদের ভিড়। ওদের ভবিষ্যৎ এ বাড়ির ঘরে ঘরে গাদাগাদি করে ঘুমিয়ে আছে,—ব্যারাকের সৈন্যের মত। মেয়েরা পর্যন্ত বইতে এসেছে সেই ভবিষ্যতের ভার!

অনুভূতিময় শ্রান্ত জাগরণ সিগারেটের পিপাসা জাগায়। মাথার নীচে পুঁটলী করা জামার পকেট খুঁজতে গিয়ে তারক থমকে যায়। স্প্রিং-এর গদীতে এলোমেলো ঢেউ তুলে সীতানাথ উঠে যাচ্ছে।

খানিক পরেই মনোজিনীর চকিত কণ্ঠ কানে আসে।

'সীতু! কি করছ তুমি?'

'আমি তোমায় ভালবাসি মনু-বৌদি।'

একখানা কাপড় সংগ্রহ করে পুষ্পদের খানিক তফাতে ঠিক জানালার নিচে পেতে

মনোজিনী শুয়েছিল। তার গরম-বোধটা একটু বেশী। ঘরের গাঢ় অন্ধকারে জানালা দিয়ে আকাশের অতি ক্ষীণ চাঁদ আর তারার আলো এসেছে। তারকের শরীরটা শক্ত হয়ে গেল। মন হয়ে গেল ভোঁতা! ওদের কি জানানো উচিত হবে সে জেগে আছে? চুপি চুপি সে কি বাইরে পালাতে পারবে ওদের টের পেতে না দিয়ে? কে জানে হয়তো খাট থেকে নামতে গেলেই পুষ্প বা তার পাশের কোন মেয়ের গা সে মাড়িয়ে দেবে। না, পালাবার পথ তার নেই। শব্দ করার ক্ষমতাও তার নেই। জেগে থেকে তাকে অভিনয় করতে হবে ঘুমন্তের। হায়, জেল-খাটা তারককে কে মুক্তি দেবে এই ভয়ংকর বন্দী দশা থেকে।

তারপর তারক শুনতে পেল মনোজিনী বলছে, 'ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে বলতে এসেছো ভালোবাসো?' আচ্ছা বেশ, আমি শুনে রাখলাম। এবার শোবে যাও। কাল এ বিষয়ে কথা কইব।'

'চুলোয় যাক কাল।'

'তা জানি। ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছ, ছাড়তে বলছি ছাড়ছ না, পৃথিবী এখন তোমার কাছে চুলোয় গেছে। কিন্তু আমি তো তোমায় ভালবাসি না সীতু, আমার নাড়ী এতটুকু চঞ্চল হয়নি। পরখ করে দ্যাখো। আমার বিশ্রী লাগছে, কষ্ট হচ্ছে। যাও, শোবে যাও।'

'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু নেই। সত্যি বলছি তোমায়, তুমি যদি আমার মধ্যে এতটুকু—'

কথা সে শেষ করার সুযোগ পেল না, তারক এসে বাধা দিল। বাধাও কি সহজ বাধা, ঘাড়ে ধরে সীতানাথকে টেনে তুলে প্রচণ্ড আক্রোশে সে বসিয়ে দিল কয়েকটা কিল চড় ঘুসি, তীব্র চাপা গলায় বলতে লাগল, 'পাজী! বদমাস! লক্ষ্মীছাড়া!'

এ কোনো পুরানো পীরিতির জের টানা নয়, এ শুধু বাঁদরটার বাঁদরামি টের পেয়ে মাথায় বীরত্বের আগুন জ্বলে উঠেছিল তারকের। আটকানো নিঃশ্বাসটা তার পড়বার সুযোগ পেয়েছিল।

সীতানাথের গলা ধরে সে ঝাঁকি মারছে, মনোজিনী ব্যাকুলভাবে দু'জনকে ঠেলে তফাৎ করবার চেষ্টা করে বলল, 'কে? কী করছেন আপনি?

'আমি তারক। বাঁদরটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসছি দাঁড়ান।'

'ছেড়ে দিন ওকে আপনি।'

মনোজিনীর কথার সুরে থতমত খেয়ে তারক সীতানাথকে ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল ঘর—নিঝুম, নিঃশব্দ। ঘরে যারা ঘুমোচ্ছিল তারা সবাই ঘুমিয়ে চলেছে, একজনও সাড়া দেয় না, শব্দ করে না। তারকের মনে হল সে যেন রূপ-কথার ঘুমন্ত পুরীর একটি ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, যাদুমন্ত্রে ঘুম পাড়ানো হয়েছে সারি সারি নরনারীকে, কোন ঘটনা কোন হট্টগোলেই তাদের ঘুম ভাঙ্গবে না।

'শোবে যাও সীতু। তারকবাবুকে বুঝিয়ে বলছি, উনি কিছু প্রকাশ করবেন না। ব্যাপারটা তুমি আমি আর তারকবাবুর মধ্যেই রইল। কেউ কিছু জানবে না।' বলে একটু থেমে যোগ দিল, কাল সারাদিন ঘুরতে হবে—একটু ঘুমিয়ে নাও।'

সতীনাথ নীরবে খাটে শুয়ে পড়ল।

'চলুন তারকবাবু, একটু ছাদে যাই।'

'কাল সকালেই বরং—'

'এখুনি চলুন। বাতাস পাবেন। সিগ্রেট নিয়ে চলুন।'

এতও জানে মনোজিনী! সে সিগ্রেট খাবে আর দু'দণ্ড তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে মনোজিনী উপদেশ দেবে—এমন করে দেবে যে, সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে স্ত্রী যেন স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করছে—এ পক্ষের আলোচনা। হুঃ, এ সব মেয়েমানুষকে চেনে তারক। এরা তার গাঁয়ের শশীদা'র মার মত। পায়েস খেতে ডেকে আদর করে বসিয়ে কথা পাড়বেন সোমত্ত মেয়ের বিয়ে-সমস্যার আর সেই আলোচনার জের টানতে টানতেই তারকের জ্ঞান জন্মিয়ে দেবেন যে বিয়ের যুগ্যি মেয়েটার সঙ্গে বেশী মেলামেশা যদি করে তারক, কলঙ্ক রটতে কতক্ষণ! পুরুষমানুষের সঙ্গে বেশী মেলামেশার ফলে মনোজিনীও শশীদা'র মা'র মত হয়ে গেছে এই বয়সে।

কত বয়স হবে মনোজিনীর?

'আপনার বয়স কত?'

'আপনি আর আমি সমবয়সী বোধ হয়।'

তারক চুপ করে গেল। কিন্তু মনোজিনী ছাড়ল না।

'সীতু আমার চেয়ে তিন-চার বছররে ছোট হবে! বুঝলেন?'

অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তারক ভাবল, 'কি তাকে মনে করেছে মনোজিনী? গেঁয়ো? অমার্জিত অনভিজ্ঞ বুদ্ধিহীন অসভ্য? ভাবুক মনোজিনী! তাই তার গৌরব!

এ বাড়ির তেতলা ছাদটিও বাড়িওলার দখলে, নিচের দু'তলার পুরুষদের ছাদে ওঠা নিষেধ। মেয়েদের সম্বন্ধে বাড়িওলা উদারতা দেখিয়েছেন, মেয়েরা ছাদে উঠে হাওয়া খেতে পারে। ছাদে উঠে আলসেয় ভর দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনে তারা নিচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অদূরে ফুটপাতে লম্বা লাইন দিয়ে নারী-পুরুষ শুয়ে বসে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। এখানে লাইনের শেষটা রাস্তার আবছা আলোয় চোখে পড়ে, আরেকটি মুখ খানিক দূর গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মনোজিনী কথা কইতে তারক বুঝতে পারল সে ঠিক তার শশীদা'র মা'র মত নয়। ভনিতা ও ভূমিকার ধার মনোজিনী ধারে না।

'আপনার একটু বুদ্ধি হল না যে সতুকে আমিই সামলাতে পারতাম? সাহায্যের দরকার হলে আমিই চেঁচামেচি করে সকলকে জাগাতে পারতাম?'

'এ বিষয়ে আমার বুদ্ধিটা সত্যি ভোঁতা। আপনাকে সাহায্য করতে যাইনি, একটা বাঁদরকে শাস্তি দিতে গিয়েছিলাম।'

'কেন? কিল চড় ঘুষিতে বাঁদরামি ভুলিয়ে দিতে? এ-বাড়ি হাবুল ও-বাড়ির মীনুকে একা পেয়ে হাত ধরে টেনেছে, এ কি সেই সমস্যা? হাবুলকে আচ্ছা করে শাসন করে দিলে সে আর কোনদিন মীনুকে জ্বালাতন করবে না, সুতরাং মীমাংসা হয়ে গেল? ও বাঁদরটার কাছে আমরা অনেক আশা করেছি, ওকে হারালে পার্টির ক্ষতি হবে। আপনি তো সর্বনাশ করতে বসেছিলেন। যদি কারো ঘুম ভেঙ্গে যেত—'

'তা ভাঙ্গত না। বোমা পড়লেও ভাঙ্গত না।'

'আপনার বুদ্ধি আছে। কিন্তু তবু আপনি এমন অবোধ! কেউ জাগছে না, সীতুও যদি সেটা টের পেত আপনার মত? ও যদি জানত সবাই ওর কাণ্ড টের পেয়ে গেছে, ঘুমের মধ্যে আমাকে আক্রমণ করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এ খবর কাল মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবে, ওর দফা শেষ হয়ে যেত একেবারে। হয় পার্টি ছেড়ে চলে যেত, নয় পার্টিতে থেকেও কোন কাজে লাগত না। অথচ কত তুচ্ছ একটা উপলক্ষ্য!

'তুচ্ছ না কি ?'

'তুচ্ছ বৈকি ! পেটের ক্ষিদেয় কাতর হয়ে আমার কাছে খাবার চাইলে যত তুচ্ছ হত, প্রায় সেরকম তুচ্ছ। বয়সের ধর্ম বলে আমি ওর সাফাই গাইছি না, এখনো ওর মন ঠিক হয়নি, মেয়েদের সম্বন্ধে এখনও ওর রোমান্সের বিষ করে যায়নি। মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা এখনো ওর অভ্যস্ত হয়নি।'

তারক দ্বিধাভরে বলল, 'ও যে সমাজের ছেলে শুনলাম, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তো ওর কম হওয়ার কথা নয়।'

মনোজিনী বিদ্বেষহীন সুরে বলল, 'সে তো ড্রয়িং-রুমী রোমান্টিক মেলামেশা—মেয়েরা রহস্যের আড়াল ছেড়ে আসে না। হ্যাঁ, সেক্‌স্ নিয়ে পর্যন্ত অবাধে আলোচনা করে—তবে আলোচনাটা কোনদিন সেক্‌সের দণ্ড নিয়ে কাব্যমন্থন ছাড়া আর কিছু হয় না। আমাদের মেলামেশায় সব কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙ্গে দেওয়া হয়, কাজে-কর্মে চলাফেরায় সময়ে-অসময়ে সব অবস্থায় সব সময় সমানভাবে আমরা মেলামেশা করি। ঠিক এইজন্যই বাইরে আমাদের বদনাম রটে কিন্তু আসলে এইজন্যই সমাজের উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত সমস্ত স্তরের চেয়ে আমাদের মধ্যে বিকার কম, অসংযম কম। আজকের কাণ্ড দেখে কথাটা আপনার বিশ্বাস করা কঠিন হবে, কিন্তু সত্য কথাই বলছি আপনাকে। ভাইবোনের মধ্যে যৌন আকর্ষণ হয় না কেন আপনি নিশ্চয় জানেন! আমাদের মধ্যেও অনেকটা তাই ঘটে। মেলামেশায় যদি আমাদের বিধিনিষেধ আইন-কানুন থাকত, তা'হলে মেয়েরা যেমন পুরুষেরা তেমনি সর্বদা সচেতন হয়ে থাকত পরস্পরের সম্বন্ধে, সেই চেতনা থেকে মোহ জন্মাত, কামনা জাগত কিন্তু সর্বদা খোঁচা দিয়ে যৌন চেতনাকে জাগিয়ে রাখার সব ব্যবস্থা আমরা বাতিল করে দিয়েছি। তাছাড়া, আমরা সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি মস্ত একটা উদ্দেশ্য আছে আমাদের, দু'দণ্ড বসে উচ্ছৃংখল চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবার অবসরও আমাদের জোটে না। ঘুম পাচ্ছে আপনার ?'

'পাচ্ছে। কিন্তু আপনি বলুন।'

'আর কি বলব। বাইরে থেকে না জেনে না বুঝে আমাদের কুৎসা রটায় মানুষ, আপনি হয়তো অনেক শুনেছেন। আপনাকে তাই একটু বুঝিয়ে দিতে হল। কে জানে হয়তো আপনার সঙ্গেই একদিন মফঃস্বলে গিয়ে আটকে যাব, এক ঘরে দু'জনের রাত কাটাতে হবে। তখন যেন সীতুর মত ছেলেমানুষী করবেন না।'

'সীতুর কি হবে ? কতদিন ওকে সামলে সামলে চলবেন ?'

'কতদিন আর, ওর মন দু'চার মাসে সাফ হয়ে যাবে। অন্য কোনদিকে ওর দুর্বলতা নেই, মেয়েদের সম্বন্ধে শুধু একটু রোমান্টিক। কাল পরশু আশা করে আসবে যে আমার মধ্যে খুব বড় রকম একটা প্রতিক্রিয়া হয়ে গেছে, হয় আমি ম্রিয়মান হয়ে পড়েছি আর না হয় রেগে রয়েছি! এসে যখন দেখবে যে আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি, ওর কাছে যা জীবনে একটা বিপ্লব ঘটার মত ব্যাপার, আমার কাছে তা সহজ স্বাভাবিক তুচ্ছ কিছুই না, বেচারা ভড়কে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে আমার জন্য কামনা নিভে আসতে থাকবে—একদিন ভাবতেও পারবে না কেন আমার জন্য পাগল হয়েছিল। আমার কি দাম আছে বলুন ওর কাছে ? নিজের কল্পনা দিয়ে ও আমাকে মনের মত করে গড়েছে, ও যাদের চেনে তাদের মত না হয়ে আমি শুধু অন্যরকম বলে। সাধারণ খুঁটিনাটির মধ্যে ও আমার ভালবাসা খুঁজে পেয়েছে। অন্য কেউ চায়নি কিন্তু ও চেয়েছে বলে হয়তো এক কাপ চা বেশী দিয়েছি, বেশীক্ষণ

আলাপ আলোচনা করেছি, কোথাও যেতে সঙ্গে নিয়েছি। আজ যেমন দেখলেন, খাটে শোবার আব্দার করল, খাটে শুতে দিলাম। এসব যে বাড়তি কিছু নয়, অন্য যে কেউ চাইলেই পেত, ওর মাথায় তা ঢোকেনি। ভেবেছে, আমার স্বামী বহুদিন জেলে, আমি ওকে ভালবাসতে সুরু করে দিয়েছি, এসব তারই লক্ষণ। আগাগোড়া ভুল করেছে জানলেই ওর তাসের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়বে। একটু আঘাত পাবে কিন্তু ভালই হবে তা'তে। আপনি তো রইলেন পার্টি'তে, দু'বছর পরে ওকে চিনতেই পারবেন। আমাকেই ধমক দিয়ে হয়তো ও তখন বলবে, কমরেড! তুমি বড় ডিসিপ্লিন নষ্ট করছ।'

দু'জনেই টের পেল আর কিছু বলাবলির নেই। সিঁড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করে তারক হঠাৎ থেমে গেল :

'একটা কথা জানা বাকী আছে। কাল যদি সীতু এসে বলে, আপনাকে না পেলে সে পার্টি'তে থাকবে না, কি করবেন আপনি?'

মনোজিনী শ্রান্ত-কণ্ঠে জবাব দিল, 'ও তা বলবে না।'

'যদি বলে?'

'যদি আবার কি, যদি? বলছি ও কথা সীতু বলবে না, তবু যদি। থিয়োরি ঘেঁটে ঘেঁটে কি যে মনে হয়েছে আপনাদের, যা অসম্ভব তাকেও একটা যদি দিয়ে সম্ভব করতে চান।'

মনোজিনীর রাগ দেখে তারকও চটে গেল।

'আরেকটা প্রশ্ন জেগেছিল, জিজ্ঞেস করতাম না। এখন জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে। সীতু যা পায়নি আমি যদি এখন তা আদায় করে নি?'

'যদি আদায় করে নেন? যদি? নিন। কোন আপত্তি নেই আমার। আপনাকে যেন বহুদিন ভালবেসে এসেছি এমনিভাবে নিজেকে সঁপে দিচ্ছে, আপনি শুধু নিন আমাকে। আপনার যদির মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়ে যাক। আমারও জ্ঞান জন্মে যাক, সভ্যতা মিথ্যা, প্রগতি মিথ্যা, বাস্তব মিথ্যা, বিশ্বাস মিথ্যা।'

তারা ভরা আকাশের নিচে খোলা ছাদে দু'জনে মুখোমুখি উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল যুগ ও জগতের দু'টি মহাসমস্যার রূপধারা জীবন্ত প্রতীকের মত।

তারক প্রথমে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল :—'আসুন, নিচে যাই।'

মনোজিনী বলল, 'দাঁড়ান, আমাকে ধরে নামবেন। আমার চেনা সিঁড়ি। ছাতের সিঁড়ি বলে ভাঙা-চোরা যেমন আছে তেমনি রেখে দিয়েছে বাড়িওলা, তিনবার বিয়ে করে একটা ছেলে হল না যে টাকাগুলো ভোগ করবে ব্যাটার। একবার কি হয়েছিল জানেন? এক গাঁ থেকে একা স্টেশনে যাচ্ছিলাম সন্ধ্যার পর। পথের দু'দিকে পাটক্ষেত। নির্জন, কিন্তু পথ হারাবার ভয় নেই হঠাৎ যেন পাটক্ষেতের ভেতর থেকেই ছ'টা লোক কিলবিল করে বেরিয়ে এসে আমায় ঘিরে ধরল। কেউ জিজ্ঞেস করে, কে গো তুমি, কেউ জিজ্ঞেস করে বাড়ি কোথা, আর গা ঘেঁষে আসে। মুখ চাপা দেবার জন্য একজন গামছা ভাঁজ করছে, তাও দেখলাম। ওরা আপনাদের 'যদি', 'কিন্তু', 'হয়তো'র নাগাল পায়নি। নিজেকে তাই এইসব বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি যে, যাকগে, মেয়েমানুষ হলেও তো একটার বেশী জীবন নাই—হঠাৎ শুনি একজন বলেছে, ইনি য্যান তিনি মালুম হয়; আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ ভাই আমি তোমাদের বক্তৃতা শুনিয়েছিলাম। পরক্ষণে দেখি, সবাই অদৃশ্য হয়েছে। একজনের গলা শুনলাম, ডর নাই যান। জানেন তারকবাবু, আমাদের সত্যি কোথাও ভয় ডর নেই।'

ঘরে আলো জ্বলছিল। সকালে জেগে উঠে সীতানাথকে ঘিরে বসে আছে। পুষ্প ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিজিয়ে সীতানাথের নাকে জল দিচ্ছে, নিচে মস্ত একটা গামলা ভরা টকটকে লাল জল। খাটের গদিতেও খানিকটা স্থান রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে।

তারক তাকিয়ে দেখল তার ডান হাতে রক্তের দাগ লেগেছে, কব্জি পর্যন্ত।

পুষ্প বলল, 'মনোদি দেখেছ কাণ্ড ?'

মনোজিনী বলল, 'কি হয়েছে ?'

'সীতুদার ডাক শুনে উঠে দেখি নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। কোথা গিয়েছিলে তোমরা ?'

মনোজিনী বলল, 'মাঝে মাঝে ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে! কিন্তু এত বেশী তো কোনদিন পড়েনি। বন্ধ হয়নি এখনও ?'

'প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।'

সীতানাথের ঠোঁটও কেটে ফুলে উঠেছে। তারক ভাবে, আপনা থেকে নাক দিয়ে রক্ত মানুষের পড়ে, গলগল করেও পড়ে। কিন্তু ঠোঁট কেটে ফুলে ওঠা চাপা পড়বে কিসে ? সীতানাথ কি এতই হাবা যে এখনো সে টের পাচ্ছে না সকলে তার অপরাধ না-জানার অভিনয় করে চলেছে ? তাই যদি হয় অমন হাবা ছেলেকে শুধরে দলে নিয়ে লাভ কি হবে মনোজিনীই জানে।'

'আর জল দিতে হবে না।' মনোজিনী এগিয়ে গিয়ে সীতুকে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল—'এবার জলপটি দিলেই হবে। পাখাটা আন্‌তো পুষ্প।

'পাখা ? উনুন ধরাবার ভাঙ্গা পাখাটা ছাড়া —'

'একটা পাখাও নেই তোদের ?

গায়ের আঁচল খুলে নিয়ে ভাঁজ করে মনোজিনী সীতানাথকে বাতাস করতে লাগল, গায়ে তার রইল শুধু ব্লাউজ। সীতানাথ এতক্ষণ মনোজিনীর দিকেই তাকিয়েছিল, এবার সে চোখ বুজল।

তারক নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। নিচে চৌবাচ্চার জলে তার রক্তমাখা হাত ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

হাবা ? না, সীতানাথ রোমাণ্টিক। মধ্যরাত্তির এই নাটকটি তার ভাল লাগছে। অন্ধকারে মনোজিনীর কাছে উঠে যাবার সময় তার শুধু বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল, হয়তো মুখ শুকিয়ে কানটাও ঝাঁ ঝাঁ করছিল একটু, তাই সেই একাগ্র উত্তেজনা খণ্ড খণ্ড হয়ে লজ্জা ভয় ব্যথা ঔৎসুক্য ও আতংক, মার খেয়ে আদর পাওয়ার জয়গৌরব, দুর্বোধ্য আবেগ, একসঙ্গে হাসিকান্না পাওয়া, রূপকথার রাজ্যে যাওয়ার স্বপ্ন যেন মিটছে আর মনোজিনীর সঙ্গে একটা গোপন কাব্যিক সন্ধি হয়েছে এই বিশ্বাস তাকে উদভ্রান্ত, অভিভূত করে দিয়েছে। মনোজিনী পাশে বসে হাওয়া করছে, কোথাও দু'চার ইঞ্চি জায়গায় ছুঁয়ে আছে মনোজিনীর দেহ, তাতেই হয়তো রোমাঞ্চ হচ্ছে বার বার।

হাবা ? রোমাণ্টিক হলেই হাবা হয়। জেনেও সকলের না জানার ভানে গা এলিয়ে ভেসে যেতে নইলে ওর মজা লাগে! সে হলে কি করত ? কয়েক বছর পিছিয়ে ওই সীতানাথের বয়সের সে হলে ? সহ্য করতে করতে মনোজিনীর গায়ের আঁচল খুলে হাওয়া দিতে আরম্ভ করার আগে পর্যন্ত দাঁতে দাঁত কামড়ে কোনরকমে হয়তো ভদ্রতা বজায় রাখত। তারপর চোখ বোজার বদলে ডান পাটি গুটিয়ে নিয়ে মনোজিনীর ব্লাউজ আঁটা স্তন দুটির মাঝখানে একটা—

কানের ফুটো আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ চোখ বুজে তারক মাথাটি ভরা চৌবাচ্চার জলে ডুবিয়ে দিল। মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

বেলা বারোটায় তারকের ইণ্টারভিউ।

সকালে ঘুম ভেঙ্গেই তার মনে হল, সুনিশ্চিত চাকরীর খবর শোনার পর থেকে তার মনে যে ভার চেপেছিল, আজ তা বড় বেশী ভারি হয়ে উঠেছে। এত যে অফুরন্ত কাজ মানুষের জন্য পড়ে রয়েছে, হৃদয় মন শরীর দিয়ে স্বেচ্ছাধীন সুপ্রিয় কাজ, বিচিত্র ও অভিনব—চাকরী ছাড়া তার কি কিছুই করা ভাগ্যে নেই।

চায়ের কাপ নামিয়ে নিশীথ বলে, 'চোখে মুখে স্বপ্ন নেমেছে দেখছি মশাই!'

'স্বপ্ন? কাজের কথা ভাবছি।'

'কাজের কথা ভাবলে আপনার মুখ এমন স্বপ্ন-বিভোর দেখায়।'

'আমি তো জানতাম কোন কাজে একবিন্দু স্বপ্ন নেই।'

'আপনি তো সবজান্তা।'

নিশীথ বিস্মিত হয়ে তাকাল। আর কথা বলল না।

'কিছু মনে করবেন না, কমরেড।' তারক হঠাৎ বলল।

নিশীথ আবার বিস্মিত হয়ে তাকাল।

তারক ভাবল, বেশ। বেশ এরা চুপ করে থাকতে জানে।

বলল, 'স্বপ্ন বুঝি আপনার পছন্দ হয় না?'

'নাঃ। স্বপ্ন বড় কাজ নষ্ট করে। স্বপ্নের চেয়ে কাজ ঢের দামী।'

'মনের মত কাজ যদি হয়? সে কাজের স্বপ্ন নিয়ে দিনরাত মানুষ বিভোর হয়ে থাকতে পারে না? তারপর দেখুন, মনটা, কাজের মত তৈরী করে নিলেও কাজ মনের মত হতে পারে। কাজ হল জীবন, জীবনে স্বপ্ন থাকবে না, কি যে বলেন মশায় আপনারা। কেমন যেন বাড়াবাড়ির রকমের সিরিয়াস আপনারা। খেয়ে আনন্দ হয় ডিসপেপসিয়ার রোগীর মত আপনারা তা ভাবতেই পারেন না।'

নিশীথ একটু বাঁকা হেসে বলল, 'ভাবতে পারে বৈকি। ফুটপাতে লোক না খেয়ে মরছে দেখতে দেখতে যখন সন্দেশ রসগোল্লা চপ কাটলেট খাই, আনন্দে রীতিমত রোমাঞ্চ হয়।'

তারক আহত হল, চটেও গেল।

'আমি তা বলিনি।'

নিশীথ উদাসভাবে বলল, 'বলেননি?'

'না, বলিনি। একশোবার বলিনি। এটাও আপনাদের একটা মস্ত দোষ, সব কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিজের সুবিধামত মনে করে নেবেন। গোড়া থেকে আপনি তাই করছেন। কাজ করার কথায় স্বপ্নের কথা বললাম, আপনি ধরে নিলেন আমি বিলাসের স্বপ্ন, আকাশ-কুসুমের স্বপ্নের কথা বলছি। আমি বললাম খাওয়ার আনন্দের কথা, আপনি মনে করলেন সন্দেশ রসগোল্লা চপ কাটলেট খাওয়ার আনন্দ।'

'ওঃ!' আবার নিশীথ অন্য এক ধরনে বিস্মিত হয়ে তাকাল।—'আমার ভুল হয়েছে তারকবাবু। আপনি যে স্বপ্নের ওই মানের কথা বলেছিলেন বুঝতে পারিনি। আমার কিন্তু দোষ নেই—স্বপ্ন মানে আমি স্বপ্নই বুঝি। আপনি যদি স্বপ্নের বদলে কল্পনা, উদ্দীপনা ফুর্তি বা এরকম কোন শব্দ ব্যবহার করতেন—'

'ভুল হত!' তারক উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে বলে গেল, 'স্বপ্নটা বণিতের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।' চৌকাঠ পেরোবার সময় যোগ দিল, 'আপিমখোরেরও নয়।'

আজ সকালে আবার সকলে তাকে অবহেলা করেছে। নিশীথের কূট মন্তব্যে গোড়াতেই তার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল, নইলে হয়তো খানিক গল্পগুজব করা যেত। অন্য একজনও যেচে তার সঙ্গে কথা কয়নি। দুটি ছেলে এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল, কনফারেন্সে 'ওরা' নাকি গোলমাল করবে। 'ওরা' মানে যে পুলিশ নয় অন্য একটি দল, সেটা তারক নিজেই অনুমান করেছিল। দু'তিনজনকে জিজ্ঞেস করেও বিশদ বিবরণ জানতে পারেনি। প্রত্যেকে জবাব দিয়েছে, ও কিছু নয়। মনোজিনী পর্যন্ত জবাব দিয়েছে, পরে শুনবেন। মাঝখানে সেক্রেটারী কয়েক মিনিটের জন্য এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন যে, অন্ততঃ ত্রিশজনকে রেডি থাকতে হবে, 'ওরা' গোলমাল সুরু করলেই ধরে ধরে বার করে দেওয়া হবে হল থেকে এবং কিছু মার দিতে হবে!

তারক যে মার দিতে পারে রাত্রেই সে তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছিল। অথচ মনোজিনীও তাকে একটা অনুরোধ জানাল না, সে যেন কনফারেন্সে উপস্থিত থাকে।

তাকে বাদ দিয়ে ওরা কনফারেন্স করবে না কি?

ন'টা বাজে। খানিকটা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতই যখন লাগছে এখানে, ফর্সা জামা-কাপড় পরে তারক বেরিয়ে পড়াই ভাল মনে করল। এবেলা আর এখানে ফিরবে না। কোন হোটেলে খেয়ে নিয়ে ইণ্টারভিউ দিতে যাবে। কিন্তু এখন, সকাল এই ন'টার সময়, কোথায় যাবে ভাবতে গিয়ে একটি অবশ্য কর্তব্য কাজের কথা তারকের স্মরণে এল।

তারকের এক খুড়শ্বশুর থাকেন কলকাতায়, কালীঘাট অঞ্চলে। শ্বশুরমশায় তার এই ভায়ের বাড়িতেই তাকে উঠবার হুকুম দিয়েছিলেন। হুকুম না মানায় বিশেষ কিছু এসে যায়নি। এসে গেলেও তারক কেয়ার করে না, তবে বাড়ি গিয়ে একবার দেখা না করলে অন্যায় হবে। এখন গিয়ে চা জলখাবার খেয়ে ঘণ্টাখানেক থেকে এ হাঙ্গামাটা চুকিয়ে দেওয়া যায়। তারপর যা থাকে কপালে।

সীতানাথের সঙ্গে তারকের দেখা হয়নি। সে না কি এখনো ঘুমোচ্ছে। দিনের আলোয় ছেলেটাকে একবার দেখবার জন্য তারক একটু উৎসুক হয়েছিল। ঠিক ক্ষমা চাওয়া নয়, অন্যায় করলেও ক্ষমা চাওয়ার বালাই তারকের ধাতে সয় না, একান্তে ছেলেটার কাছে একটু দুঃখ প্রকাশ করবে। তাতে মুখে কিছু না বলে জানিয়েও দেওয়া হবে যে সে তার অপকর্মের বিচারক হতে চায় না, সমালোচক নয়।

ঘরে গিয়ে তারক দেখল, সীতানাথের ঘুম ভেঙ্গেছে, জামা পরছে। মনোজিনী ছাড়া ঘরে আর কেউ নাই। তারকের মনে হল, মনোজিনীই বোধ হয় তাকে ডেকে তুলে দিয়েছে, নইলে সে আরও কিছুক্ষণ ঘুমোত। সীতানাথের মুখ দেখে তারকের মায়া হল।

মনোজিনী বলছিল, 'মুখ-হাত ধুয়ে চা-খেয়ে বাড়ি চলে যাও। ওবেলা কনফারেন্সের হাঙ্গামা, মনে আছে তো?'

'বাড়ি নাই গেলাম?'

'না, বাড়ি যাও।'

তারক বলল, 'চলুন, একসঙ্গে বেরোই।'

'আপনি বেরোচ্ছেন?' মনোজিনী শুধোল।

'আত্মীয়ের বাড়ি দেখা করতে যাব।'

'আপনার ইণ্টারভিউ কখন?'

'বারোটায় টাইম দিয়েছে।'

'তবে এখন নাইবা গেলেন ঘোরাঘুরি করতে ? ইণ্টারভিউর জন্য তৈরী হয়ে নিন, সাড়ে দশটায় খেয়ে এগারটায় বেরিয়ে পড়বেন। একটু আগে যাওয়াই ভাল। কোথায় যাবেন, দেরী টেরী হয়ে যাবে—' তারকের মুখে প্রশ্রয়ী হাসির ব্যঞ্জনা দেখে মনোজিনী থেমে গিয়ে বিনা দ্বিধায় সোজাসুজি হেসে ফেলল, 'খুব উপদেশ দিচ্ছি :'

তারক লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঠিক কথাই বলেছেন। তবে নামমাত্র ইণ্টারভিউ, কম্পিটিশন নেই, আমিই একা। ফস্কাবার ভয় নেই।'

তারককে দেওয়া উপদেশ ফিরিয়ে নিয়ে মনোজিনী সীতানাথকে উপদেশ দিল, 'এঁর ওপর রাগ রেখো না সীতু। ইনি না জেনে না বুঝে ভুল করে ফেলেছিলেন।'

একবার জোরে নিশ্বাস টেনে একটুক্ষণ নিশ্বাসটা আটকে রেখে তারক হাত জোড় করল।—'আমি ক্ষমা চাইছি। গেঁয়ো মানুষের দোষ ক্ষমা করতেই হবে।'

সীতানাথ বিগলিত ও বিব্রত হয়ে কোনমতে বলল, 'না না না ওতে কি হয়েছে. ও কথা বলবেন না, প্লিজ।'

তারক একাই বেরিয়ে পড়ল।

ট্রামে বাসে অসম্ভব ভিড়, মানুষ ঝুলতে ঝুলতে আপিস চলেছে। প্রথম শ্রেণীতে ভিড় বেশী। সেকেণ্ড ক্লাসের নোংরা মানুষের সান্নিধ্যে যারা একটু অস্বস্তি বোধ করে, তারাও অনেকে অগত্যা সেকেণ্ড ক্লাশে ভিড় জমিয়েছে। তারক পিছনের গাড়িতে উঠল এবং উঠেই টের পেল একটা গোল বেধেছে।

ছেঁড়া ময়লা খাকি সার্ট গায়ে পশ্চিমী এক মিস্ত্রী-শ্রেণীর লোকের গুঁতো খেয়ে ধোপদুরস্ত সাহেবী বেশধারী এক আপিসগামী ভদ্রলোক রেগে টং হয়ে ধমক দিচ্ছেন। পশ্চিমা লোকটি একটু বিনয়ের সঙ্গেই তাকে বুঝাবার চেষ্টা করছে যে সে যখন ইচ্ছে করে গুঁতো দেয়নি, এরকম ভিড়ে যখন এ ধরনের অঘটন হরদম ঘটছে, তার কসুর কি। ভদ্রলোক সে কথা কানেও তুলছেন না, শুধু বলছেন, 'চোপ রও, পাজী উল্লুক, হঠ যাও।'

ভুল করে মারার জন্য একটি ছেলের কাছে সদ্য-সদ্য জোড় হাতে ক্ষমা চেয়ে আসায় ব্যাপারটা তারকের কাছে বড় হাস্যকর ঠেকল। উপস্থিত আট দশটি ভদ্রলোক কেউ মুখ ফুটে কেউবা শুধু মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে আহত ভদ্রলোকটির পক্ষে সায় দিচ্ছে।

একজন অত্যন্ত দামি একটা মন্তব্য করলেন : 'গাড়িতে সবাই যাবে, এ কি গুণ্ডামির জায়গা।'

এদের সকলের ভাব দেখেই বোধ হয় পশ্চিমা লোকটির নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার রোখ বেড়ে যাচ্ছে।—'বাবুজি শুনিয়ে, বাত্ তো শুনিয়ে—'

তারক ভাবে, ওর পক্ষ কেউ সমর্থন করে না কেন ? ওর দলের লোকই তো বেশী গাড়িতে !

ভাবতে ভাবতে তারক দেখতে পায়, লোকটি হঠাৎ গুম খেয়ে পরক্ষণে আচমকা গাড়ি ছাড়ার ধাক্কায় ভদ্রলোকের গায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনরকমে সামলে নিল। কিন্তু তার আগেই তার বগলের চটে জড়ানো লোহার যন্ত্রগুলিতে ভদ্রলোক গুঁতো খেয়েছেন। ইংরাজী বাংলা মিশিয়ে কয়েকটা বদখৎ গাল দিয়ে ভদ্রলোক তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। অন্য ভদ্রলোকেরা সমর্থনের কলরব করে উঠলেন। একজন বললেন, 'বেশ করেছেন।' আরেকজন বললেন, 'বেটা নেশা করেছে না কি ?'

পশ্চিমা লোকটি রোগা, হয়তো বা রুগ্নও। বাঁ হাতে তারকের বাহুমূল আঁকড়ে

ধরে সে নিজেকে হুমড়ি খাওয়া থেকে সামলে ছিল। এবার সেই হাতে ভদ্রলোকের টাই আর সার্ট মুঠ করে ধরে বলল, 'কাহে মারা বাবুজী?'

ওপাশে একজন লুঙ্গিপরা লোক উঠে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠল, 'কাহে মারা হ্যায় উস্কো?'

অনেকগুলি অভদ্রলোকের কণ্ঠে কলরব উঠল প্রতিবাদের। দু'তিনজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগল এদের কাছে। ভদ্রলোকেরা চুপ,—সবাই, একসঙ্গে! তাদের সেই আকস্মিক স্তব্ধতা ও নির্বিকার অন্যমনস্কতার গভীরতায় কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন দম আটকে এল তারকের। কেউ তারা কিছু জানে না, জানতে চায় না। ভদ্রলোককে ছোট লোকেরা গাল দিক, মারুক, গাড়ি থেকে টেনে ফেলে দিক, বড় জোর আড় চোখে তাকিয়ে দেখবার বেশী কেউ কিছু করবে না।—যতক্ষণ না গাড়ি থামে এবং পুলিশ আসে।

পশ্চিমা লোকটি গোড়ায় একা ছিল, কেউ তার পক্ষ নেয়নি। কিন্তু তাকে ত্যাগ করেনি কেউ, অসময়ে বর্জন করেনি। সবাই এখন একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে একা করে দিয়েছে। এত যে সমর্থক ছিল তার খানিক আগে, হাঙ্গামার সম্ভাবনায় এক মুহূর্তে সকলে তাকে ত্যাগ করেছে, তাকে অস্বীকার করেছে। এ যে কি ভীষণ একাকীত্ব কল্পনা করিতে গিয়ে তারকের বুক কেঁপে গেল!

খুড়শ্বশুরের বাড়ির সদর দরজাটা খোলাই ছিল। খুড়শ্বশুর চাকুরে ভদ্রলোক, বৈঠকখানা রাত্রে শোয়ার কাজে লাগে, সতরঞ্চি বিছানো তক্তপোষ আছে। ভদ্রলোক বলে তখনো নিজেকে তারকের কেমন পরিত্যক্ত একা আর অসহায় মনে হচ্ছিল, যার অনুভূতি বড়ই বিস্বাদ। ভিতরের দরজার কড়া নাড়তে গিয়ে সে থেমে গেল। অন্দরে, দরজার ওপাশের ঘরেই, স্ত্রীপুরুষের কলহ চলছে।

'জামাই! জামাই এসে আমায় উদ্ধার করবে। তবু যদি নিজের জামাই হত! নিজের জামাইকে একখানা কাপড় দিতে পারিনে—'

'নতুন জামাই যে গো। প্রথম আসবে।'

'তাই কি? কে ডেকেছে নতুন জামাইকে? মেয়ের বিয়েতে একশোটা টাকা দিয়ে সাহায্য করে না যে দাদা, তার জামাইকে জুতিয়ে তাড়াতে হয়।— কে?'

আপিসের বেশধারী প্রৌঢ় খুড়শ্বশুর বাইরে এলেন। তারক ভক্তিভরে তাকে প্রণাম করল।

শ্বশুর গদগদ হয়ে বললেন, তারক না কি? এসো বাবা, এসো। দু'দিন ধরে পথ চেয়ে আছি। তা এত যে দেরী হল?'

'আজ্ঞে' চাকরীর চেষ্টায় ঘুরছি,— সময় পাইনি।'

'অন্য কোথাও উঠেছ না কি? এ তোমার ভারি অন্যায় বাবা, আমরা এখানে থাকতে—'

শাশুড়ী ঘরে আসায় তাকেও তারক ঢিপ করে একটা প্রণাম করল।

চাকরীর ইণ্টারভিউর অজুহাতে এক ঘণ্টা পরেই তারক ছুটি পেল। কিন্তু এই এক ঘণ্টার জামাই-আদর ভোগ করেই তার মনে হল জগতে আর সব মিথ্যা। এ আদর ছাড়া আর কিছু সত্য নেই জগতে। এ বাড়ির বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে নিজের খুড়শাশুড়ীর মুখে সে এইমাত্র নিশ্চয় শোনেনি যে দাদার জামাই বাড়িতে এলে তাকে জুতিয়ে তাড়াতে হয়, গোপাল ভাঁড় কিম্বা বটতলার কোন হাসি-তামাসার বইয়ে এরকম একটা অভদ্র গল্প বোধ হয় সে কোনদিন পড়েছিল। জুতো মেরে যাকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে

হয় তাকে কোন মানুষ এত সম্মান, এত প্রশ্রয়, এত আদর কখনো দিয়ে যেতে পারে এতক্ষণ ধরে ? এক মুহূর্তের জন্যও তো তার মনে হল না কারো ব্যবহারে এতটুকু ছলনা আছে, অভিনয় আছে।

ট্রামের রাস্তায় পেঁছে ফুটপাতে ছোট একটা ভিড় দেখে তারক উঁকি মারল। উঁচু রোয়াকে ঠেসান দিয়ে ফুটপাতে পা ছড়িয়ে বসে আছে একটি স্ত্রীলোক, মাথাটা বুকে নামিয়ে যেন ঘুমোচ্ছে। তার দুই উরুতে উপুড় হয়ে হাত পা মাথা সবগুলি প্রত্যঙ্গ এলিয়ে দিয়ে যেন ঘুমিয়ে আছে তিন চার বছরের একটা ছেলে। ছেলেটা একেবারে উলঙ্গ, বাঁকা মেরুদণ্ড আর পাঁজরের হাড়গুলির চেয়ে তার মাংসহীন পাছার শতকুঞ্চনে কুঞ্চিত চামড়াই যেন বরফ-শৈত্যের শিরশির শিরশির শিহরণ। স্ত্রীলোকটির সায়া সেমিজ নেই অথচ শাড়িখানা তার এত অত্যাশ্চর্য বিস্ময়। আগেকার দশ বারো টাকা দামের শাড়ি। এ সব শাড়ি তোরঙ্গে তোলা থাকে। তোরঙ্গ থাকে ঘরে। ঘর আর তোরঙ্গ যে আছে, শপথ করে বলা যায়। যেমন বলা যায় স্ত্রীলোকটির যৌবন আছে। আরও যৌবন ছিল, এখন খানিকটা আছে। তারকের মহকুমা-সহরঘেঁষা গাঁয়ে বিশ বছরের বকুল মরেছিল চার পাঁচ মাস ধরে, আজ একটু ভাত, পরশু একটু ফ্যান আর গাছের পাতা জংলী লতা খেয়ে ধীরে ধীরে তিলে তিলে সে হয়ে গিয়েছিল চামড়াঢাকা কঙ্কাল, এ স্ত্রীলোকটি ক'দিন আগেও খেয়েছে, মোটামুটি খেয়েছে, তারপর হঠাৎ একদিন একেবারে পুরোপুরি না খাওয়া সুরু হওয়ায় যৌবন ফুরিয়ে যাবার আগেই একটানা উপোসের ফলে এখানে মরে গেছে। ভাবেনি যে মরবে—রোয়াকে ঠেস দিয়ে ফুটপাতে পা ছড়িয়ে একটু বসে জিরিয়ে নিতে গিয়ে একেবারে মরে বসে থাকবে !

উপবাসী ঠিক এমনিভাবে মরে। ঝিমুধরা ভাব গাঢ় নিঝুম হয়ে আসে, হৃদস্পন্দন মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে থেমে যায়, পা ছড়ানো ঠেসান দেওয়া শরীরটা একটু নড়ে চড়ে পায়ে ঢলে পর্যন্ত পড়ে যায় না।

খানিক দাঁড়িয়ে দেখে তারক ভিড়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়, পাশে দাঁড়িয়ে যে লম্বা লোকটি মৃত্যু দেখছিল সেও খসে আসে তার সঙ্গে।

'দেখলেন মশায় ? দেখলেন ?'

তারক পাক দিয়ে তার সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে কামড়ে দেবার ভঙ্গিতে গাল দেবার সুরে বলল, 'আমি অন্ধ না কি ?'

ভদ্রলোক ভড়কে গেলেন। সবিনয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না, তা বলিনি। বলছিলাম কি—'

'বলছিলাম যে আপনার সঙ্গে দুদণ্ড হাহুতাশ করি। আমার এতটুকু আপশোষ হয়নি।'

'তা হবে।'

তিনি সরে পড়লেন ও ফুটপাতে। তারকের চেয়ে রোদের ঝাঁঝ তার পছন্দ হল বেশী।

পাঁচতলা মস্ত বাড়ির একটা অংশে তারকের ভবিষ্যৎ আপিস। তারকের ধারণা ছিল একেবারে বাইরের ফুটপাত থেকেই চারিদিকে খাকির ছড়াছড়ি দেখতে পাবে। কিন্তু রাস্তায় একটা চলতি লরী বোঝাই বিদেশী খাকি দেখে আপিস-বাড়িটার গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকবার পর শুধু দু'টি লোকের গায়ে সে খাকি দেখতে পেল, ধুতি-

পরা একটি পিয়নের গায়ে খাকি কোট এবং আর একজনের গায়ে—সে পিয়ন কি আপিসের কেরানী বোঝা যায় না—একটি খাকিরাঙা কাপড়ের সার্ট।

একটি ঘরে ছোট বড় টেবিলে জন পনের কাজ করছিল, কোণের দিকে একজনের দু'হাতের আঙ্গুল টকাটক টিপে যাচ্ছিল টাইপরাইটারের চাবি। এদের মধ্যে একজনও বুড়ো নেই, মাঝ বয়সী পর্যন্ত নেই—সকলেই যুবক। এদিকে একুশ বাইশ বছরের ছেলে আছে, ওদিকে ত্রিশ পেরিয়ে কেউ গেছে কি না সন্দেহ। ঘরে একপাশের দেয়াল ঘেঁষে, বাইরের প্যাসেজ এবং পাশের ঘরে রাশিকৃত চৌকো, চ্যাপ্টা লম্বা প্রভৃতি নানা আকারের নানা কাঠের প্যাকিং কেস জমা করা—সেগুলি ভিজে থাকায় পচাইখানা শুঁড়িখানার মত একটা অঢেল গন্ধ ফুর ফুর করছে চারিদিকে। মহুয়া গাছের তলে ঝরা ফুলের কার্পেটে বসলেও এমনি গন্ধ পাওয়া যায়।

যুদ্ধের আপিস—আপিসি গন্ধ এখনো হয়তো সৃষ্টিই হয়নি। অপ্রত্যাশিত মিঠে কেঠো গন্ধে মনটা কেমন করতে লাগল তারকের।

এতক্ষণ পরে এই আপিসে বৌ তার কাছে এসেছে নিবিড়ভাবে! ছোট বড় সমবয়সী এতগুলি মানুষের আপিস করার আড়ালে যে বৌরা আছে, তাদের সঙ্গে তার বৌও তার নাগাল ধরেছে এইখানে। চেয়ারে চেয়ারে বসানো এতগুলি উদাহরণ তার সামনে, মনের কানে কানে বৌ যেন তার অবিরাম ফিস্ ফিস্ করে চলেছে, অনুসরণ করো! অনুসরণ করো! নইলে আমাকে নিয়ে দিনের খেলা রাতের খেলা খেলবে কি করে?

তাই মনে হয় তারকের। বাকী জীবন, আরও যতকাল সে বাঁচবে! কি অসীম সে সময়! একটা জীবনে এতকাল ধরে বৌকে পাওয়ার চেয়ে আর কি পাওয়া তার বড় হতে পারে। তার মানে সারি সারি আগামী রাত্রিগুলি কল্পনার সীমা পার হয়ে চলে যায়, প্রতিটি রাতের কক্ষে সে দেখতে পায় তার বৌকে, অভিন্না, অপরিবর্তনীয়া।—কেশ যার গন্ধ-মুখর, চোখের গভীরতা হৃদয়তক্, নিটোল সর্বাঙ্গে টনটন টানধরা চামড়ার চাঁপা রাঙা আবরণ।

অনুভূতি বল্গা ধরেছে, কল্পনা বাগ মানে না, কিন্তু সেই সঙ্গে মাথা নাড়ে তারক। কি সব যা-তা ভাবছে ভেবে ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসিও ফোটে।

একটা পার্টিসনের ওপার থেকে নেয়াপাতি ভুঁড়ি-হবো-হবো বিনয় ও ভালমানুষীর জীবন্ত প্রতীকের মত এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব ঘটল। হাতের ফাইলপত্র বুকের কাছে ধরে মেঝেতে আলগাভাবে চটি পিটিয়ে চলার ভঙ্গিটাই তার অসীম দরদের চলচ্ছবি।

এতক্ষণ অনেকে তারকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু শুধোয়নি। ইনি কোনমতেই আগন্তুকের জন্য কিছু করা সম্ভব কি না, না জেনে এগিয়ে যেতে পারলেন না।

'আপনি--?'

প্রশ্নটা তারক অবশ্য বুঝতে পারল। সহজেই বুঝা গেল ভদ্রলোক আপনি কে, কি চান, কাকে চান এসব স্পষ্ট প্রশ্নের অভদ্রতা সর্বদাই এড়িয়ে চলেন।

এই ভদ্রলোক তারককে আপিসের বড় সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। ঘরখানা শ্রুতিবন্ধ্যা। মেঝেতে কার্পেট, দেয়ালে দেয়ালে রঙ। একপাশে কোণ ঘেঁষে মোটা কাঁচ বসানো টিপায়ের তিন দিকে নিচু বেতের সোফা—ভাল দামী জিনিস। এই আসবাবের সঙ্গে অনির্দিষ্ট দ্বন্দ্বে নিযুক্ত একটি বড় টেবিল চারকোণা ঘরের দেয়ালের সঙ্গে খানিক কোণাচে করে পাতা। শুধু এভাবে টেবিল পাতার কৌশলেই যেন ঘরে

জায়গা বেড়ে গেছে অনেক। অংক জানা হিসেবী মানুষ ছাড়া সাধারণ বুদ্ধিতে এই সহজ ম্যাজিক কারো জানার কথা নয়। অংক জানা কোন একজন যে কি কাজ এখানে করেন তার অংক দিয়ে, কে জানে। বড় সরকারী অফিসারের টেবিলে যা কিছু থাকে সবই আছে, শাখা টেলিফোন থেকে মখমলের পিন কুশান, বাদ শুধু পড়েছে আপিসী রুচতা। কারণ, কয়েকটি ফাইলের বুকে চেপে বসে আছে বার্ণার্ড শ'র পুরোনো প্লান লাল কাপড়ে বাঁধাই মস্ত ভল্যুম, আর সাজানো গুছানোর সবগুলি আইন ভঙ্গ করে ফ্যানের বাতাসে পাতা নাড়ছে দুটি বাংলা মাসিক। টেবিলের ওপাশে বসে আছেন বুশ সার্ট পরা অনুগ্র-স্মার্ট প্রিয়দর্শন যুবক, চেহারায় ঠিক বয়সের আন্দাজ মেলে না। দু'প্রান্তে ছোট দুটি খাদ চওড়া কপালকে একটু তুলে সামনে ধরেছে, মুখের দর্শনীয় অংশের চেয়ে কপালটি বেশী ফর্সা। কপাল মুখের ছাঁদকে নিয়ন্ত্রণ করছে এমন মুখ নজরে পড়ে খুব কম এবং প্রতিদিন দেখেও আত্মীয়বন্ধু ধরতে পারে না এ মুখের বৈশিষ্ট্য কি। এ পাশে একজন আগাগোড়া কোঁচকানো তসরের পাঞ্জাবী গায়ে লম্বা কালো শ্রীহীন ভদ্রলোক হাই পাওয়ার চশমার আড়ালে চোখ দুটি স্তিমিত মুখভরা ছেলেমানুষী খুসী চাপার স্পষ্ট প্রচেষ্টা, এইমাত্র কে যেন প্রশংসা করেছে। তার পাশে বেমানান কলেজী স্যুট পরা বেঁটে কালো ভদ্রলোক, সোনার চশমাপরা মুখের গাম্ভীর্য, যা অগভীর কিন্তু অন্তহীন মনে হয়, হঠাৎ একটু লাগসই হাসিতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার সৃষ্টি হয়ে গেল।

এসবে তারকের চোখ পড়েছিল পরে। ঘরে ঢুকে প্রথমেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সামনের দেয়ালে টাঙ্গানো স্ট্যালিনের বড়ো বাঁধানো ফটো। যুদ্ধের বাজারে এক স্ট্যালিনের ফটো বড় অসম্পূর্ণ মনে হল তারকের। ধীরে ধীরে পাক দিয়ে সে চারিদিকের দেয়ালে চার্চিল-রুজভেল্ট চিয়াং-কাইশেকের ফটো তিনটিতে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর চোখ পড়ল বড় সাহেবের দিকে।

নিখুঁত ভঙ্গিতে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে একটু হেসে বড় সাহেব বললেন, দেখলেন? কেউ বাদ যাননি। বসুন।' কি যে ভড়কে গেল তারক সেই হাসি দেখে আর গল্পে মানুষের সহজ ভঙ্গির কথা শুনে। চাকরী আর না হবার উপায় নেই। চাকরীটা ইনি তাকে দেবেন। দেড় হাজার না দু'হাজার টাকা মাইনে পেয়ে অমন করে যিনি একশো টাকার চাকরীর উমেদারের দিকে চাইতে, হাসতে ও কথা কইতে পারেন, তার কাছে তারকের নিস্তার নেই।

দু'মিনিট কথা কয়ে দুটো সহজ প্রশ্ন করে আজকেই হয়তো এই শক্তিমান পুরুষ তাকে লটকে দেবেন চাকরীতে।

তারকের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে যায়। স্টালিনের ফটো আর তার দৃষ্টির তেরচা সমান্তরালকে ছুঁই ছুঁই করে পাক খাচ্ছে ফ্যানের হাতলগুলি। চাকরী করবে, পার্টিতে থাকবে, বৌকে আনবে, আত্মীয়কে খুসী করবে, এ যে চারতলা জীবন হবে তার!— রাজা, গোলাম, বিবি এবং টেক্কার তাস দিয়ে গড়া জীবন।

বেমানান টাই ও স্যুট পরা সেই ভদ্রলোক স্পষ্টভাবে প্রত্যেক কথা উচ্চারণ করে করে বললেন, 'বসতে বলছেন আপনাকে। বসুন।' টেবিলের কোণের কাছে চেয়ার ছিল, তারক তাতে কাত হয়ে হেলান দিয়ে বসল, ডান হাতটা তুলে দিল চেয়ারের পিছনে। চাকরীর জন্য ইন্টারভিউ দিতে এসে এমনভাবে কেউ যে বসতে পারে, আবার সেই সঙ্গে মুখ নিচু করে রেখে হাসতে পারে মৃদু মৃদু, এ অভিজ্ঞতা যুদ্ধের চারজন অনুধ্যায়কের ছিল না। সাহেবের মুখে মৃদু বিস্ময় ও আমোদের ভাব দেখা

গেল। তার বেপরোয়া ভাব স্মার্টনেশের সামিল হয়ে তারই বিরুদ্ধে যাচ্ছে টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে তারক একটু জড়সড় হয়ে বসল। মুখের হাসিটা সে কিছুতেই বশ করতে পারছিল না। চাকরী করা না করার যুদ্ধে হার মেনে মেনে এতদূর এগিয়ে জবাই হবার ঠিক আগে কি সহজ উপায় সে খুঁজে পেয়েছে জয়ী হয়ে পিছিয়ে যাবার। ভাবতেও তার হাসি উপচে উঠছে। এরা সিরিয়াস, খুসী। একটি ছোলর বেকারত্ব ঘোচানো গেল ভেবে এদের আনন্দ হয়েছে। হয়তো মৃদু সমবেদনার সঙ্গে একথাও কেউ ভাবছেন যে, হায়, যুদ্ধ ফুরিয়ে গেলেই বেচারার চাকরী শেষ হয়ে যাবে।

বেমানান-টাই কি একটা সন্দেহ করে এতক্ষণ পরে চিনিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনিই মিস্টার গাঙ্গুলী। এর কাছেই আপনার চাকরীর ইণ্টারভিউ।'

বক্তার সোনার চশমার দিকে চেয়ে বারকয়েক চোখ মিট মিট করে তাকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে নিশ্চয়ই।'

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, 'আপনার কোয়ালিফিকেশন সব লেখাই আছে—এ চাকরীর পক্ষে যথেষ্ট। তবু একটা যখন আছে, দু'একটা প্রশ্ন করি। যুদ্ধের খবর পড়েন কাগজে?'

তারক কথা কইল না। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে টেবিলের কোণে দৃষ্টি বিঁধিয়ে রাখল।

বেমানান টাই সস্নেহে বললেন, 'বলুন—জবাব দিন।'

ভালমানুষীর প্রতীক ভদ্রলোকটির সিক্ত স্নায়ু আর সইতে পারছিল না, তিনি বলে উঠলেন, 'খবরের কাগজ পড়েন তো আপনি, সে কথাটা বলতে পারছেন না?'

তারকের এই অদ্ভুত বোবাত্বের চাপে ভদ্রলোকের চোখে যেন জল এসে পড়বে মনে হল।

মিঃ গাঙ্গুলী সম্মতি মুখে বললেন, 'আপনি বড় লাজুক। কাগজ পড়েন না?'

খানিক চিন্তা করে তারক বলল, 'মাঝে মাঝে পড়ি।'

ঘরের পরিস্থিতি যেন একটু নরম হল তার জবাব দেওয়ার সঙ্গে। মুখের সেই বোকাটে হাসি তার কখন মুছে গেছে তারক নিজেই টের পায়নি। এতক্ষণে সে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে কাজটা সে যত সহজ ভেবেছিল তত সহজ নয়। বোকা সাজবার আগে কি বোকার মতই সে বিশ্বাস করেছে সামান্য চেষ্টায় এ ক'জন সরকারী চাকুরিয়াকে ভুলিয়ে চাকরী সম্পর্কে নিজেকে বাতিল করিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারবে। এরা যে মানুষ, এদের যে ব্যক্তিত্ব আছে, এদের সান্নিধ্যও যে কলের পুতুলের নয়, হৃদয় মনের সান্নিধ্য এতো সে খেয়ালও করেনি। মিঃ গাঙ্গুলীর হাসি ও কথা শুনে যখন তার ভয় হয়েছিল ইনি তাকে চাকরী না দিয়ে নিরস্ত হবে না, তখন তো তার একথা ভাবা উচিত ছিল যে, কাছাকাছি বসে এর মানুষিক উপস্থিতিটা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, মানুষটা শুধু গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট বলে। 'যুদ্ধের খবর কিছু জানেন?'

মিঃ গাঙ্গুলীর প্রশ্নে সচেতন হয়ে তারক বিনা দ্বিধায় বলে ফেলল, 'জানি।'

'ইউরোপে কোথায় কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে বলুন তো!

তারক মুখ নিচু করে আগের মত অর্থহীন নির্বোধ হাসি ফুটিয়া তুলবার চেষ্টা করতে লাগল।

তখন এক অঘটন ঘটে গেল। লম্বা কালো হাই পাওয়ার চশমা এতক্ষণ টেবিলে কনুই রেখে বসেছিলেন, সিধা হয়ে হঠাৎ [illegible] প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি বিয়ে করেছেন?'

তারকের মন ছিল মিঃ গাঙ্গুলীর কাছে বোকা বনবার চেষ্টায়, আচমকা খাপছাড়া প্রশ্নে এবারও সামলাতে না পেরে সোজাসুজি জবাব দিয়ে বসল, 'করেছি।'

হাই পাওয়ার চশমা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে খাড়া মেরুদণ্ডকে একটু বাঁকতে দিলেন।

মিঃ গাঙ্গুলী হেসে বললেন, 'এটা আপনার কি রকম প্রশ্ন হল ব্যানাজী'? বিয়ে না করলে কি ভদ্রলোক চাকরী খুঁজতে আসতেন? কই, আপনি তো বললেন না, ইউরোপে কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে?

জবাবের জন্য মিনিটখানেক সকলকে অপেক্ষা করিয়ে তারক বলল রুশিয়ায়।'

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, 'বেশ বেশ। রুশিয়ায় কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে জানেন কি? আচ্ছা যাক, আগে বলে নিন ইউরোপের আর কোথায় যুদ্ধ চলছে। আরেক জায়গায় যুদ্ধ নিয়ে খুব হৈচৈ হচ্ছে।

তারকের ঘাড় নিচু করা নীরবতায় এতক্ষণে মিঃ গাঙ্গুলীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, 'সিসিলি জানেন, সিসিলি? জোর লড়াই হচ্ছে সেখানে।'

চার আর একে পাঁচজনের নীরবতায় কিছুক্ষণ ঘরের স্তব্ধতা থম্‌থম্‌ করতে থাকে। তারক লক্ষ্য করেনি, গাঙ্গুলী একটি হাত রেখেছেন বার্নার্ড শ'র পুরানো মলাটে, আরেকটি হাতের আঙ্গুল দিয়ে যেন আদর করছেন বাংলা মাসিকের একটি উল্টানো পাতাকে।

আপশোষের শব্দ করে শেষে তিনি বললেন, 'কি করি বলুন তো আপনারা, একে তো নেওয়া যায় না কোনমতে।' বলে হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে তিনি শেষ একটা প্রশ্ন করলেন তারককে, 'সিসিলি কোথায় জানেন? দেখাতে পারবেন ওই ম্যাপে?'

বেমানান নেকটাই বললেন, 'যান, দেখান গিয়ে।'

তারক উঠলো না। দেয়ালে টাঙ্গানো পৃথিবীর মস্ত ম্যাপটার দিকে চেয়ে বসে রইল। মুখ তার প্যাঙসে হয়ে গেছে, হতভাগ্য বেকুবের মতই দেখাচ্ছে এখন তাকে। বাপকে যে প্রয়োজনে সে প্রায় দু'বছর ঠকিয়েছিল, আজ সেই প্রয়োজনে এদের কাছে শুধু কিছুক্ষণের জন্য পাগলাটে বোকা সেজে থাকতে মনের মধ্যে বিদ্রোহের গর্জন উঠেছে। ভিতরের একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা চেপে তারক মরিয়া হয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় তার শেষ জবাব দিল, 'সিসিলি বর্মার কাছে।'

বাপ তার স্নেহান্ধ, দুর্বল মানুষ—তার ব্যক্তিত্ব নেই, প্রাণ নেই। তার ছেলে বলেই দরখাস্ত পাঠাবার ব্যাপার ধরা পড়লে কান্নার ছোঁয়াচে কান্না এসেছিল। কিন্তু কষ্ট কিছু হয়নি। এখানে বুদ্ধি ও শক্তির সম্পদ নিয়ে বসে আছে মানুষ, তার চিরকালের অবজ্ঞার বস্তু গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট—এদের কাছে বোকা সাজতে তার কষ্ট হচ্ছে।

জীবনে কত অভিজ্ঞতা তার দরকার।

অপরাহ্নে কনফারেন্স হল, দশ মিনিটের জন্য।

গোলমাল হবে, কিন্তু ঠিক কোন্‌ দিক দিয়ে আক্রমণটা আসবে জানা না থাকায় এ পার্টির লোকেরা একটু নার্ভাস হয়েছিল। অপর পার্টি ভারি চালাক, ধূর্ত। শয়তানী বুদ্ধিতে আঁটা বড় কঠিন ওদের সঙ্গে। সেদিন ওপেন-এয়ার মিটিং-এ ওদের শিবরাম কিছু বলবার অনুমতি চাইল। না, এ পার্টির বিরুদ্ধে কিছু বলবে না, নিজেদের পার্টির প্রোপাগাণ্ডাও চালাবে না, শুধু স্টুডেণ্টদের দু'চার কথা বলবে। সময়? ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিটের বেশী শিবরাম বলল না, বিশ্বাস-ভঙ্গ

করেও কিছু বলল না। বলার শেষে তিনবার দর্শকদের শ্লোগান দিল। দিয়ে নিজে বসে পড়ল। পাঁচ ছ'শো লোক তার সংগে তিনবার চেঁচিয়ে থেমে গেল। কিন্তু জন ত্রিশেক যুবক আর থামে না, তারা চেঁচিয়েই চলেছে! কোথা থেকে চোঙ্গা হাতে একজন উঠে তাদের পরিচালনা করছে দেখা গেল। ক্রমে ক্রমে উৎসাহ বাড়ল, ধেই ধেই নাচতে সুরু করে তারা তালে তালে বলতে লাগল, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ!

এবার ভাড়া করা হলে মিটিং, ঘরে বাইরে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। যা দেখে মনটা আঁকুপাকু করছে তারকের। প্রতিপক্ষের কেউ এলেই ঠিক পুলিশের মত তাকে ঘিরে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে বসানো হচ্ছে, যেখান থেকে সহজেই ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া চলবে।

বলে দেওয়া হচ্ছে, 'গোলমাল চলবে না কিন্তু ভাই :'

আরে, ভাই না। এমনি দেখতে এলাম। অন্ততঃ আমি চুপ করে থাকব কথা দিচ্ছি।'

দু'পক্ষের সকলেই প্রায় পরস্পরের সংগে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত। তাছাড়া কথা যখন দিয়েছে চুপ করে বসে থাকবে, কথার খেলাপ করবে না। সেটা নিয়ম নয়, কেউ কখনো করে না। কিন্তু সবাই চুপ করে বসে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কেন? চাইলেও দিচ্ছে, না চাইলেও দিচ্ছে। বড় ধাঁধায় পড়ে গেছে এ পক্ষের চাইরা। চুপ করে বসেই যদি থাকে এবং কথা দেওয়ার পর তা ওরা থাকবে, গোলমাল সৃষ্টি করে কনফারেন্স ভাংগবে কি করে? অথচ আজ সকালেই সুনিশ্চিত, অবধারিত খবর পাওয়া গেছে—কনফারেন্স ভাংগবার চেষ্টা ওরা করবেই।

একবার সেক্রেটারীর নাগাল পেয়ে তারক জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কনফারেন্সে, ওদের তবে ঢুকতে দিচ্ছেন কেন?'

সেক্রেটারী বললেন, এটা ওপেন কনফারেন্স।

'তবে এত কড়াকড়ি কেন?'

'তারকবাবু প্লিজ।'

'তা সেক্রেটারীর দোষ নেই। তিনি সত্যই অতি ব্যস্ত।'

কনফারেন্স সুরু হল। সেক্রেটারী রিপোর্ট পাঠ করবার আগেই জানিয়ে দিলেন যে, যারা ভুল পথের পথিক, পার্টি গড়ে যারা দেশের লোককে ভুল পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, যদিও সুবিধা করতে পারছে না তেমন, তাদের অনেকে উপস্থিত আছেন দেখে তিনি বড়ই বাধিত হয়েছেন। এই সভায় উপস্থিত থেকে যদি তাদের একজনও নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং ভুল সংশোধন করেন—ঠিক এই সময় উপর থেকে তোড়ে জল পড়তে আরম্ভ করায় কনফারেন্স ভেসে গেল।

হায়, কে জানত অতি তুচ্ছ তৃতীয় একটা নতুন পার্টি প্রতিপক্ষকে খাতির করে তাদের ক্ষতি করবে! ছোট এই পার্টিটিকে চিরদিন তারা পিঠ চাপড়ে এসেছে, ঝরণার মত বইয়ে এনে নিজেদের নদী-স্রোতে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। ওরাই যে শেষে ওপরের ব্যালকনী থেকে কনফারেন্সের ওপর আগুনের হোজের অস্ত্র হানবে কে তা কল্পনা করেছিল!

ভিজে চুপ্‌সে গিয়েও তারক তার আসনে অনড় অচল হয়ে বসে রইল। তার মনে হল, বাংলার জীবন যৌবন ধন মান কালস্রোতের বদলে শুধু জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

তারপর এক সময় সেক্রেটারীর সঙ্গে তার কিছুক্ষণ কথা হল। সে চাকুরী পায়নি শুনে সেক্রেটারী দুঃখিত হলেন।

'তবে তো আরও মুস্কিল। আমি ভাবছিলাম, দু'এক মাস যে চাকরীর চেষ্টা করবেন সে সময়টা কোথায় কার কাছে আপনার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। একেবারে চাকরীই যদি না করেন—'

'তা হলে আমার ফিরে যাওয়াই ভাল।'

সেক্রেটারী মুখ তুলে একগাল হাসলেন। তারক তাকে এই প্রথমবার হাসতে দেখল।

'নিজের ব্যবস্থা করে পার্টির কাজ করতে পারেন।'

'চব্বিশ ঘণ্টা যদি পার্টির কাজ করি ?'

'তার চেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা নিজের কাজ করে অবসর সময়টা আমাদের দিলে বেশী উপকার হবে তারকবাবু।'

তারক স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

'এত টাকা কি হয় আপনাদের ? আপনার নিজের পকেটে কত পার্সেণ্ট যায় ?'

'আমার পকেট নেই তারকবাবু। আমি বিয়ে করিনি।'

সেক্রেটারী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

'মেয়েদের পেছনে আরও বেশী খরচ হয়।'

'অদৃষ্টের কথা বলেন কেন। মেয়েরা ফিরেও তাকায় না। বড় সাধারণ লোক আমি। নিজেই দেখছেন।'

'আপনাদের তবে টাকা নেই ?'

'না।'

'কেন ? দরকার আছে, টাকা নেই কেন ?'

'আপনিই বলুন না ?'

তারক মৃদু হেসে বলল, 'আমি ? আপনি বসে থাকবেন সেক্রেটারী হয়ে, আপনি করবেন নেতৃত্ব, আর প্রশ্নের জবাব দেব আমি ?'

সেক্রেটারীও হাসলেন, 'তবে প্রশ্ন করেন কেন ?

'আপনি নেতা হবার উপযুক্ত নন।'

সেক্রেটারী এবার সোজা তারকের চোখের দিকে তাকালেন। নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

আপনি বুদ্ধিমান। ঠিক ধরেছেন। গুজব যা রটে সেসব দোষ আমার নেই, পার্টিকে বাঁচিয়ে রেখে বড় করার চেয়ে আমার জীবনে বড়ও আর কিছুই নেই। পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার আছে কিন্তু এমন কোন পজিটিভ গুণ নেই, যাতে নেতা হতে পারি। নেতার অভাবে আমরা মরছি তারকবাবু, শুধু একজন খাঁটি নেতার অভাবে।'

'গাঁয়ে বসেও মাঝে মাঝে আমার একথা মনে হয়েছে।'

'যে একটু ভবেতে জানে আজ একথা তার মনে হবেই। আমাদের দিশেহারা ভাবটা প্রকট না হয়ে পারে ? লোকে আজ ভাবতে শিখেছে। তারা দেখছে আমাদের ধারও নেই, ভারও নেই। দা বা তরোয়ালের কোন নির্দিষ্ট আকারও নেই। কামার মিলছে না।'

মনোজিনীও এই কথাই বলল। কিন্তু সেক্রেটারীর মত হতাশভাবে নয়।

'এ অবস্থায় এরকম হওয়াটা কিন্তু খুব আশ্চর্য নয় তারকবাবু। উনি বড় বাড়াবাড়ি করেন, কিন্তু আমরা মোটেই দমে যায়নি। দেশের চিন্তাধারা বদলাচ্ছে। কোথায় কে আমাদের মুক্তির নতুন পথের কথা ভাবছে, কাঁকে কাঁকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এসে তার

বিশ্বাসকে দৃঢ় করছে, ক্রমে ক্রমে আমাদের নেতায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে কে তা জানে? হয়তো আমাদের মধ্যেই একজন কাল বিনা দ্বিধায় আমাদের ভার নেবে। হয়তো দেখব একদিন আপনিই 'কমরেড' বলে হাঁক দিলে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সাড়া দিচ্ছে: 'কমরেড, আমরা তোমায় বিশ্বাস করি।'

মনোজিনী হেসে ফেলল 'বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম? খালি বক্তৃতাই দিতে হয়—অভ্যাস জন্মে গেছে। দেশে ফিরছেন?'

'কাল যাব।'

'কাল! ক'টা দিন থেকে যান, হাল-চাল বুঝে যান চারিদিকের?'

তারক সিগারেটে সজোরে টান দিয়ে বলল, 'আবার আসব। মাঝে মাঝে আসতেই হবে। একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, সংশোধন করে আসি।'

মনোজিনী মাখা আটার তালটিকে চটপট ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করছিল, সে কাজ বন্ধ করে প্রশ্ন করার বদলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'দেশের পরিচিত চাষী-মজুরগুলোকে একবার চিনে আসতে হবে।'

মনোজিনী আশ্চর্য হয়ে গেল।—'সেকি? ওদের সঙ্গে তো আপনার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব? রামবাবু সেদিন এসে বলে গেলেন, একদিনে আপনি বিশটা গাঁয়ের লোককে জড়ো করতে পারেন, মজুররা আপনাকে খাতির করে?'

তারক একটু অপরাধীর মত বলল, 'তবু আমার কেমন ধাঁধাঁ লেগে গেছে। ওদের মনে করতে গিয়ে কেবল সোভিয়েট পোস্টার দেখছি।'

মুখ একটু হাঁ হয়ে গিয়ে মনোজিনীর দু'সারি চক্‌চকে দাঁত খানিকক্ষণ দৃশ্যমান হয়ে রইল।

তারক নিজেই আবার বলল, 'এরকম হত না। আমি সত্যি ওদের ভাল করে জানি না। প্রতিদিন ওদের জীবনযাত্রা দেখেছি, একসঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছি, কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক ছিল একটা। হয়তো আনমনা হয়ে থাকতাম, লক্ষ্য করতাম না। আমার নিজস্ব যেন একটা সমস্যা আছে, ওর এক-একজন তার এক-একটা টুকরো মাত্র, এই রকম ভাব ছিল মনের। আমার বাড়ির কাছে জৈনুদ্দিনের ঘর, জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত বোধ হয় লাখখানেক কথা ওর সঙ্গে আদান-প্রদান হয়েছে, কিন্তু ভাবতে গিয়ে দেখছি লোকটা কি ভাবে, কেমন করে ভাবে, কিছুই জানি না। মানুষ-গুলোকে একটু চিনে আসি।'

মনোজিনী ডাকল, 'পুষ্প, রুটি ক'টা বানা দিকি ভাই। ভদ্রলোকের সঙ্গে দুটো কথা কই।'

তারক বলল, 'কথা আর কি বলবো। বলার মত কথা কি আর আছে বলুন? যা বললাম তাতে আপনার ভুল ধারণা জন্মে যেতে পারে, তাই আরেকটা কথা বলি। শুধু মানুষগুলোকে চিনতে যে কাল দেশে যাচ্ছি তা নয়, নতুন বৌটার জন্যেও যাচ্ছি।'

তারক কথাবার্তা সহজ করে আনতে চায় ভেবে মনোজিনী হেসে উঠে বলল, 'বলেন কি! ধৈর্য ধরছে না?' বলে তারকের মুখ দেখে অপ্রস্তুত হয়ে হাসি বন্ধ করল।

তারকের মুখেও অবশ্য মৃদু মৃদু হাসি ফুটেছিল, কিন্তু তাতে কৌতুক ছিল না এক ফোঁটা।

'কি জানেন, খিদেয় বৌটা খাঁ-খাঁ করছে।' তারক একটা সেঁকা রুটি টেনে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল।'

* * * *

বাপ শুধোলেন, 'চাকরীটা হল না বাবা ?'

তারক বললে, 'না বাবা, হল না ?' আমার হার্ট খারাপ।'

'হার্ট খারাপ! ডাক্তার না দেখিয়ে, চিকিৎসা না করে, তুই যে চলে এলি বড় ?'

ডাক্তার বললে খোলা আলো বাতাস আর পুষ্টিকর খাবার ছাড়া আমার আর কোন ওষুধপত্র দরকার নেই।'

রাত্রে রাতের কাপড় পরতে পরতে বৌ বলল, 'কাজ নেই বাবা চাকরী করে।

বিছানায় বসে বলল, 'আচ্ছা, হার্ট ভাল হলে চাকরী করতে পারবে না ?'

তারক বৌকে বুকে নিয়ে বলল, 'পারব বৈকি। হার্ট ভাল হলেই কাজ করতে পারব। হার্ট ভাল হোক, তৈরি হয়ে নিই, তারপর একচোট দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে। তার আগে ঘর ছেড়ে নড়ছি না। জেলের মত ঘরে কয়েদী হয়ে থাকব, তুমি পুলিশের মত আমায় পাহারা দিও।

চিন্তামণি

এক

খিদিরপাড়া, ২৪ পরগণা
তাং ২০শে শ্রাবণ

বৈন চিন্তামণি তুমি ২।৩ খানা চিঠি দিয়াছ তাহা আমি পাইয়াছি। আমি ডায়মণ্ডহারবার যাইব বলিয়া পত্রখানার উত্তর দিতে গোণ হইল, দাদা আমাশায় ১ মাস যাবত ভুগিয়াছে, আমি কাহাকে লইয়া যাইব। বর্তমানে অসুখ সারিয়াছে। আজ ৫।৭ দিন যাবত এখানে ঝড় তুফান হইতেছে এইরূপ অবস্থাতে আমি কি করিয়া যাইব। নৌকা করিয়া যে যাইব এমন সাধ্য আমার নাই। ২।১ দিনের মধ্যেই আমি যাইব, ওখান হইতে আসিয়া আমি মাল লইয়া তোমার নিকট পত্র দিব। একা লোক খালি ঘর ফেলিয়া ১।টি গাভি ফেলিয়া আমি কি করিয়া যাইব। এই দুর্দিনে আমি তোমাকে আনিয়া রাখিতে পারিলাম না। তুমি পেটের খুধায় মধুবণী গিয়াছ, এই দুক্ষ আমারই অন্তরে জানে। আমি কি হংসে আছি তাহা ভগবানই জানে। উহাদের তিনজন যাওয়াতে আমার শরীরের একটুকু বল পাইতেছি না। চাঁপাবালা বসিরহাট গিয়া শ্বশুরের বাসায় ১৫ দিন মাত্র ছিল, উহাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। সোণার গয়ণা ইত্যাদি নেওয়াতে মানে আর কি বুঝিয়া লইবে। হেমীকে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে। বৈশাখ মাসের ২০ তাং গিয়াছে জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৭ তাং বিবাহ দিয়াছে। হেমীর মাকে বিবাহেতে লয় নাই। হেমীর মা তাহার কাকার বাড়ীতে আছে। ডাকাতের হাতে হেমীকে বিবাহ দিয়াছে ঐ শোকে হেমীর মা পাগল হইয়াছে। হেমই বা কত কান্দাকাটি করিয়াছে উহার মা ঐ বা কত কান্দাকাটি করিয়াছে, কাকা

ধরিয়া স্নান করায় ও খাওয়ায় এই অবস্থাতে আছে। ছেলের বাড়ী মোদের দেশে বিন্দীপাড়া বিপিনের ভাই। এই মেয়ার বিবাহে কত আমোদ আহ্লাদ করিব। তাহার মধ্যে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়া এইরূপ কার্য করিল। হেম যে মায়ের জন্য কি প্রকার কান্দাকাটা করিয়াছে তাহা আর এই ক্ষুদ্র পত্রে কি লিখিব। তবু চাঁবাকে বাড়িতে লইল না। জামাতার মুখ দেখে নাই বিবাহের নিয়ম কাজ মায়ে করে তাহাও করে নাই। আমি এই অশান্তিতে আছি তুমি সর্বদা পত্র দিবে। তোমার পত্র পাইলে একটু শান্তিতে থাকি। মেয়ে জামাই লইয়া বাড়িতে আসে নাই তাহার জন্য আশীর্বাদ করিও। তোমাকে জানাইব। টাকা ত লইয়া যায় নাই। নবিন আষাঢ় মাসে ধান্যের কাজ করিয়া ১০্ টাকা দিয়াছে, কি কাজ করে জানি না। চাঁবার পত্র পাই নাই। আমার খাওয়া চলে না।

"দিদি"

চিঠি পড়ে পটল বলে, 'লেখাটি কার রে? কুচি কুচি লিখতে জানে পিঁপড়ের ঠ্যাং।'

'নন্দ গোঁসাই হবে। আগে নিত এক পয়সা, এখন দু'পয়সার কম কথাই কয় না। তবে লেখে বটে, হ্যাঁ। যত খুসী বলে যাও সব ধরিয়ে দেবে একখানি পোষ্টকার্ডে। একবারটি আমি ভাবনু, ঘোষাল বাড়ির মেজো বৌ পাশ দিয়েছে, পয়সা দিয়ে লেখাই কেন গোঁসাইকে দিয়ে? তা বললে তুমি হাসবে পটলবাবু, বলতে শুরু করেছি কি করিনি, মেজ বৌ বললে আর তো জায়গা নেই চিন্তামণি! এত কথা লিখবে তো খামে লিখলে না কেন?

'তা—তা—'

'কি হল তুমার?'

'সত্যি কথাই বটে তো।'

'কি সত্য কথা?'

'খামে লেখোনা কেন?'

'একটা পয়সা লোকসান হয়। তাছাড়া, কাগজ কই? মাগো বাবাগো! কি ফ্যাঁকড়া বেঁধেছে কাগজ নিয়ে! না চেয়ে মিলতো আগে যত চাও ততো, চাইলে পরে খিঁচড়ে ওঠে এখন! নবীনকে দিয়ে দিস্তে দিস্তে কাগজ হেডমাস্টার বেচে দিত দোকানে। এবার মোটে দু'চার দিস্তে বেচলে—পায়নি তো বেচবে কি! তা দর যা হয়েছে কাগজের, ক'দিস্তে বেচে লাভ কিছু কম হয়নি।'

'আর কিছুর দর বাড়েনি?'

'আ কপাল আমার!' থপ করে কপাল থাপড়ে দেয় চিন্তামণি, 'দর যদি না বাড়বে তবে দেশ-গাঁ ছেড়ে হেথায় আসি?'

পটল ভাবে, কাণ্ড বটে! রাঁড়ীর নাকি ঘরের অভাব, ভাতের অভাব ঘটে!—তা সে একবার হবিষ্যি করুক আর তিন বেলা খাক? বাবুর বাড়ি কচিকাঁচার পাল, কাপড় যত আছে, ছিঁড়তে লেগেই বনে যায় কাঁথা, এমনি রাঁড়ী ঘরে পুষতে বাবু একদম পাগল। কাঁচা নয় যে খাটতে নারাজ, বুড়ী নয় যে চক্ষুশূল। এদের কত দাম এমনি সব বাবুদের কাছে।

পটল যাবে কলকাতা, তার দাদার ফিরতি বিয়ে। বাবু বললে, 'ওহে পটোল শোন ঝি টেঁকে না জানো! বলে, পয়সা পাবো বেশী, তোমার কলে খাটাও বাবু! সবাই যদি কলে খাটবে তো ঝি কে থাকবে ঘরে? হিসেব বুঝিয়ে দি, জলের মতো

সাফ—পয়সা পাবি বেশী, এমন খাওয়া পাবি কোথা ? কাঁকড়ে চালের মোটা ভাত দ্'বেলা খেতে যে বেশী পয়সায় কুলোবে না হারামজাদি ? তা কে শোনে কার কথা ! মাসটি গেলে মাইনে নিয়ে ভাগে, অন্য কলে খাটতে যায় ।'

'আজ্ঞে, ভালো খাওয়া ভাল লাগে না মাগীদের। পয়সা পেলে আধ পেটাতে খ্সী ।'

'মন্দো দিনকাল পটোল। সবদিক দিয়ে মন্দো। বাপের কালের ধানকল আমার, ইদিকে সেই প্রথম। আজকে দ্যাখো দেড় গণ্ডা কল বসেছে। দ্' চারটে সাঁওতাল ছাড়া যোয়ান মাগী একটাও আসে না কলে ! ভাদ্রী ব্যাটার শয়তানী।চাল সয় না পটোল ।'

'দাঁড়ান না, ব্যাটা ডুববে ।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম তোমায়। দেশের দিকে যাচ্ছ, যদি ঘর গেরস্ত এমন কাউকে পাও, আশ্রয় নেই কণ্ট পাচ্ছে, পারলে এনো দিকি একটা। খাবে পরবে ঘরে থাকবে ঘরের মান্সের মত, বাচ্চা কটাকে দেখবে আর এটা ওটা করবে। মাইনে পাবে না, ঘরের লোকের মাইনে কি ? নেহাৎ যদি চায় তো না হয় দ্টো টাকা হাত খরচা বাবদ দেওয়া যাবে। ব্ঝলে না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খোঁজ করব ।'

'ব্ড়ী ব্যারামী যেন হয় না বাপ্। মাঝ বয়েসী স্বাস্থ্য ভাল এমনি কাউকে এনো ।'

তা হাওড়ায় তার দেশের গাঁয়ে অমন কাউকে মেলেনি—বয়স আছে, স্বাস্থ্য ভাল ! এমন মেয়েই কম গাঁয়ে। দ্টো চারটের বেশী কোনকালে ছিল না। আজ তারা যেন কোথায় উধাও হয়েছে। উধাও কি হয়েছে ? না রোগাপটকা বনে' গাঁয়েই আছে তাই ওই বন্ননা খাটে না ?

বাড়ির মেয়েদের নিয়ে গেছে কালীঘাটে, সেখানে দেখা চরণ দাসের সাথে।

একথা সেকথার পর আপশোষ করে বলে, 'ইকি ব্যাপার আঁ ? কমবয়সী নয়, মাঝ বয়সী নাদ্স-ন্দ্স মেয়ে একটা গাঁয়ে নেই। বাব্র ফরমাস ছিল ।'

চরণ বললে, 'হালে এয়েচে গাঁয়ের মেয়েদের সাথে একটা। যোয়ান মেয়ালোক। চেনা লোকের জানা বাব্র বাড়ি খংজছে—'

'আমার বাব্ রাখবে ।'

'তোমার সেথায় ? ও খংজছে কলকাতায় ।'

'শ্ধোও যদি যায় ।'

অনেক কথা, অনেক দ্বিধা, অনেক ধাঁধাঁর পর চিন্তামণি রাজী হল। শেষ ম্হ্তে' চরণ বললে পটলকে, 'একটা কথা বলি। দায়ী করবে শেষে ? স্বভাব তেমন ভাল নয় শ্নি চিন্তামণির ।'

পটলের যেন তাকে জানতে বাকী ছিল ! নয়তো এই বাজারে এত বহর মিহি কোড়া থানকে ফেরতা দিয়ে পরে আর কপাল ঢাকা ঘোমটা টেনে চাবির গোছায় ভারি রিং আঁচলে বেঁধে পিঠে ঝোলায়, তার স্বভাব ভাল ? নানা বর্ণের নানা ধাঁচের সেলানো পাড়ের ঢাকনা তার তোরঙ্গের, শোয়ার কাঁথা তোষক-সমান প্র্ ! ওসব জানে পটল, ওতে যায় আসে না কিছ্, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, যারা, সমাজ তাদের এমনি মেয়ের কেলেঙ্কারি সয়, যদি সেটা সত্যমিথ্যা গ্জব ছাড়া আর কিছ্ না হয়।

রাত্রিগুলি অন্ধকার। পাপ যে করে চুপেচাপে তার বিচারের ভার সেই বিচারকত র যার সৃষ্টি সেই অন্ধকার। হাওয়ায় ভাসা কথার বেলা সমাজ তাই কানা। পিছে যদি কেউ লাগে আর হাতে নাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে হা দ্যাখো, তখন সমাজ দণ্ড দিয়ে বলে যে আজ থেকে তুমি পতিত হলে. প্রাচিত্তির করে যদি ভোজ দেও সমাজকে তবেই উঠতে পারো সমাজে, নইলে নয়।

চিন্তামণিকে সে পেঁাছে দিল বাবুর বাড়ি। তার বাবুর নাম নীলকণ্ঠ ঘোষাল, দুপুরুষে হরেনাম রাইস মিলের মালিক।

পরদিন বাবু বললে, 'অ পটোল, এ করছ কি? ওনা যে বলছে দূর! দূর! খেদিয়ে দাও—বিদেয় কর আজকেই? ওনার চেয়ে সাফসুরুৎ এ ঝি, চাল চলন যেন রাজকন্যের দাসী। বললে না পিত্যয় যাবে পটোল, রোয়াকটুকু পেরিয়ে যেতে সময় লাগে নতুন বোয়ের বেশী। আমি বলি যাহোক নাহোক এসেছে যখন এ্যান্দুরে, থেকেই যাক একটা দুটো মাস। তা ওনা বলছে আজ নয় তো, কালকে, ওকে বিদায় করা চাই। তুমি যদি তোমার বাসায়—,

'আমার বাসায় ঝি!' পটোল প্রায় চোখ উল্টে বলে: 'বাবু, মাইনে কিছু আর চাল কিছু যদি না বাড়ান, আধেক মাস উপোস দিতে হবে।'

বাবু চুপ। মুখে বড়ই অসন্তোষ। সব কথাতে এই কথা আনা চাই পটোলের আজ কাল। একবার নয়, দু'বার নয়, দশবার। কলে যখন পুরোদমে কাজ, সবদিকে নজর রাখতে বাবু একদম অপারগ, চাল যেন পটল সরায় না তার বছর খোরাকী আর বছর পোষাকীর মত। কি করে সরায় তাই না শুধু জানা নেই বাবুর।

পটল তখন বলল. 'এক কাজ করেন বাবু। মার সামনে ধমক ধামক দিয়ে বলেন, মাইনে পাবেনি একটা পয়সা। খাওয়া পরায় থাকবে থাকো নইলে তুমি ভাগো বাছা। আর মাকে বলেন, মাগীর হাতে জল খেতে আমার ঘেন্না করে, এমন নোংরা মাগী।'

বাবু কিছু বলল কি বলল না বাবুই জানে, চিন্তামণি সেই থেকে আছে। তেমন সাফসুরৎ আর নয়, ঘোমটা অনেক খাটো চলন বেশ জোরে।

এতদূর এসে পথের ধারে শিরীষ গাছের তলায় বসে আছে, সাইকেল চড়ে বাড়ি যাবার সময় তাকে দিয়ে চিঠি পড়াবে বলে! বাবুর বাড়িতে যেন লোক নেই চিঠি পড়বার। বাবুর ছেলেমেয়ে একসাথে মাট্রিক দিয়েছে এবার, ছেলেটা ফেল করেছে খবর এসেছে দিন সাতেক আগে। আহা, পাশ করেও মেয়েটার কি কান্না।

নাক সিট্‌কানো স্বভাব বড় মেয়েটার পটলবাবু। বলেছিল বটে, চিঠি পড়ে দেব চিন্তামণি? আমি ভাবলাম, কাজ নেই বাবু, চিঠি পড়ে ঘরের কথা জানাব! আমায় দাও, পড়তে জানি আমি, বলে তাই নিয়ে নিলাম চিঠিটা। ওগো মাগো কি যে তখন দেমাক দেখালে ছুঁড়ি।'

'দেমাক নাকি!' বললে, পটল আর হাতল ধরে খাড়া করলে সাইকেলটাকে।

দেমাক নয়? আকাশ থেকে পড়ে যেন আশ্চর্যের পার নেইকো এমনি করে বললে, 'পড়তে জানো তুমি?'

'জানো নাকি সত্যি?' উৎসুক পটল শুধোল।

'জানিনে তা ঠিক। কিন্তু জানলে অবাক হবার কি আছে শুনি?'

সাইকেল চেপে পটল যখন অনেক দূরে গেছে তখন যেন চিন্তামণির মনটা উঠল কেমন করে। শ্রাবণ শেষের বৃষ্টি ছাড়া বাতাস-ছাড়া দিন, ভাদ্র মাসের উজ্জ্বল কড়া

রোদে ঘাম ছোটানো গরম। পুজোর আর কটা দিন বা বাকী। এমন দিনে এই বিদেশে সে বিদেশিনী গো! একেবারে একাকিনী সে!

লাল কাঁকরের পথটা এখন ধুলোর কাদায় কাদা, হেথায় হোথায় গাড়ির চাকার গর্তে জমা জল। দুপুর বলেই লোক চলাচল কম, নইলে পথে মানুষ কিছু কম চলে না। এদিক ওদিক দূরে কাছে গাঁ চোখে পড়ে ঢের, তবু যেন ক্ষেত আর ডাঙ্গায় চারিদিকটা তেপান্তরের মাঠ। ডোবা নালায় খাল-বিলে ঝোপে ঝাড়ে বনবাদাড়ে গাছ-আগাচায় ঘেঁষাঘেঁষি চব্বিশ পরগণার গাঁ, খিদিরপাড়ার চারিদিকে। ছায়া যেন আপনি নিবিড়, কচুরিপানার পাঁকাল গন্ধে ভরা। এখানে সব ফাঁকা, আশপাশের গাছগুলিকে যেন গুণে নেওয়া যায়। পথের দু'পাশে খানিক দূরে দূরে মানুষ গাছ রেখেছে, তার বেশীর ভাগই শাল, শিরীষ আর কদম,—দুদিক পানে দূরে তাকালে তবেই চোখে পড়ে তাদের সারি বাঁধা রূপ।

ক্ষেতগুলি আজ ফসলে ঢাকা, ভাঙ্গা মাঠে বড় বড় তৃণ। ঝাঁকাটি ঝোপের পর্যন্ত সরস নবীন রূপ। কালচে রাঙা কাঁকর মাটির পথটি ছাড়া ক'দিন আগের এবড়ো খেবড়ো রাঙ্গামাটির শুকনো দেশ সবুজ হয়ে গেছে। অনেক দূরের শালবনের সবুজ সেদিনও ছিল, লাল মাটির ধুলোয় এই শিরীষ গাছের পাতা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল লাল।

প্রথম বর্ষণে তখন গাছের পাতার ধুলো ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে। কোন ক্ষেতে লাঙ্গলের মুখে মাটি উঠছে ডেলা ডেলা, মই লাগিয়ে ভাঙ্গতে হবে। কোন ক্ষেতে, হয়তো ঠিক পাশের ক্ষেতেই লাঙ্গলের ফলা ডাবছে না মাটিতে। বড় বড় ফাটল ছিল এ ক্ষেতে শোঁ শোঁ করে জল শুষে নিয়েছে, সবটা ক্ষেত নরম হয়নি।

গৌরাঙ্গের বড় ক্ষেতটার একপাশে একটুখানি জমিতে লাঙ্গল চলল, তাইতে কাহিল হয়ে পড়ল বলদ দুটো। লাঙল যেন নোঙর হয়ে ঠেকে যাচ্ছে।

'খেটে দি চাঁদ কাকা?'

'না।'

চন্দ্রকান্ত গৌরাঙ্গের আসল কাকা, সম্প্রতি ভাইপোর সঙ্গে ভিন্ন হয়েছে। ভাবে ভাবে ভিন্ন হওয়া, ঝগড়া বিবাদ নালিশ ফরিয়াদ কিছুই ঘটেনি। মাসের পরে কি কারণে চাঁদের মন বড়ই বিরূপ হয়েছে ভাইপোর পরে, কেন যে তার মন বিগড়েছে অনেক ভেবে গৌরাঙ্গ তার হদিশ পায়নি। আকাশ থেকে যেন মনোমালিন্য নেমেছে তাদের মধ্যে। কথা কয় না, খবর নেয় না, গৌরাঙ্গ যদি বা বাড়িতে যায় তো কাকী পর্যন্ত বলে না যে, আয়রে বাপ বোস।

আরেকটু জল না পেলে ক্ষেতে তার কাজ চলবে না। বলদ তার নেই, ফের সেদিন ভাড়া করতে হবে। সারাটা দিন সামনে পড়ে আছে, কারও ক্ষেতে আজ খেটে দিলে একটা দিনের হাল বলদ আর খাটুনি তার পাওনা হয়ে থাকতো।

জোড়া বলদের বদলিতে কাকা তাকে তিন বিয়োনীর গাই দিয়েছে একটা আর একটা মদ্দা বাছুর। ঠকিয়েছে নাকি তাকে তার চাঁদকাকা? খেটে দিতে বারণ করলে কেন? কাজ ফুরিয়ে গেলেও বলদ জোড়া দেবে না নাকি তাকে?

'কাল তুমার শেষ হবেনি চাঁদকাকা?'

'হবে। তাই কি?'

'আরেক বর্ষা নামলি মোরে বলদ জোড়া দিও।'

'মোর কাজ নেই কো? আদুলির ভাঙ্গা জমিতে হাল দিতি যাব আরেক বর্ষায়।'

'আদ্দুলির নামা জমি ? কুথা পেলে বটেক তুমি, আঁ।'

কিনতে পারি। পেতে পারি। জুটাতে পারি। তোর কাজ কি অত খপর নিয়ে ? তোর বাপের জমি নয়।'

আদ্দুলির নানা জমি বিলি হয়েছে। সতর বিঘা, চড়া সেলামীতে। টাকা থাকলে গৌরাঙ্গও দু'এক বিঘা নিত। কিন্তু কাকা তার টাকা পেল কোথায় ? ক'বিঘে জমি সে নিয়েছে ? ভিন্ন হবার এতদিন পরে হঠাৎ আজ গৌরাঙ্গ ঈর্ষার তীব্র জ্বালা অনুভব করে। এইজন্য—শুধু এইজন্য চাঁদকাকা তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে। চাঁদকাকা সম্পত্তি বাড়াবে, বড়লোক হবে !

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ ভাবছিল, খানিকদূর থেকে ব্যাপার অনুমান করে রঘু সামন্ত হাঁক দিল, 'খাটাব নাকি গোর ?'

'খাটাতে পারি।'

আয়।

গৌরাঙ্গ খুসী হয়ে জোয়াল থেকে বলদ দুটিকে মুক্তি দিল ঃ লাঙ্গলটা কাঁধে তুলে বলদ তাড়িয়ে গেল রঘুর জমিতে।

বীজধানের অভাবে এবার অল্প-বিস্তর সবাই কাতর। অনেক চাষীর এ অভাবটা চিরস্থায়ী দায়, কোন বছর বাদ যায় না। বীজধান তুলে রাখে, আশা করে এবার হয়তো হাত না দিয়েই চালানো যাবে খেটে খুটে পয়সা কামিয়ে ভগবানের দয়ায়। বীজ যে লক্ষ্মী সবাই জানে, একমুঠো ছড়িয়ে দিলে ফিরে আসে দশ মুঠো হয়ে। কিন্তু প্রতি বছর পেটের জ্বালায় শেষ মুঠোটি উজাড় হয়,—যদিও পেট তখনো জ্বলে। খুঁজে পেতে কেঁদে কেটে বীজ যোগাড় হয়, অবিশ্বাস্য চড়া ধানের সুদে। এবার এই স্বাভাবিক অভাব নয়, ফাঁদে পড়া সর্বজনের সর্বজনীন অভাব। চাষীরা সব চিরকালই চাষী, চাষাড়ে জ্ঞান, চাষাড়ে মতিগতি। ধানের দাম এমন চড়ে গেল যে দাদা, বাপ আর নিজের এই তিন পুরুষে তেমন শুধু স্বপন দেখা ছিল। ধানের এমন চড়া দাম মানেই চাষীর লক্ষ্মী বাড়া—চাষীরা জানে এ ছাড়া আর অন্য নিয়ম নেই, অন্যথাও নেই। সোজা হিসাব, সোজা নিয়ম, প্যাঁচ থাকবে কোথায় ? তিনের দরে একমণ বেচে তিন টাকা পাই, সাতের দরে একমণ বেচে পাই সাত টাকা। চারটে নগদ টাকা, কড়কড়ে চারটে নতুন ছাপা নোট যে বেশী পাই তাতে কি আরও সন্দেহ আছে ভাই ?

হরেনাম রাইস মিলের নীলকণ্ঠবাবু ভাদুড়ী রাইস মিলের জলধরবাবু আর মভার্ণ রাইস মিলের বিনোদবাবু তিনজনেই দর বাড়ায়, কিন্তু তাদের চেয়ে চড়া দর দেয় অজানা অচেনা বিদেশী ক'জন লোক ! মানুষ তারা অচেনা বটে কিন্তু তাদের টাকাগুলি চেনা। ধান নিয়ে তারা পালিয়ে যায় না, গাড়ি বোঝাই দিয়ে রাইস মিলেই ধান নিয়ে ফেলে। খালি মধুবণীর তিনটে মিলে নয়, সাত ক্রোশ দূরে গোদাপাড়ার মিলে পর্যন্ত যায়। গোদাপাড়া যায়গা ছোট, মিলটা কিন্তু মস্ত আর একেবারে রেল লাইনের ধারে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে কল চালাতে সুরু করে তিনটি মিলের তিনটি বাবুই যেন ধান কিনতে উদাস ভাব দেখায়। যেমন তেমন ছাঁটা ধুলো কাঁকর মেশাল দেয়া চালগুলি প্রায় চালান হয়ে এলে, মিলের কাজে কমবেশী ক্ষান্তি পড়ে গেলে, তিনটি বাবুই দর কমিয়ে ধানের দাবী জানায়, পাওনা ধান, ঋণের ধান, ছাঁটাই করে চাল ফিরিয়ে দেবার ধান।

দাদন যারা দিয়েছিল তারা অনেক চেয়ে চেয়ে পুরানো দরে ধান পায়নি, টাকার

গরম চাষীর তখন মগজ ছুঁয়েছে। বলে দিয়েছে, সুদে আসলে টাকা ফেরত নাও, ও দরে আর ধান পাবেনি। কিন্তু দাদন নিয়ে কি চাষী রেহাই পায়? দাদনদার চেপে ধরে ভয় দেখিয়েছে যে দাদন ঋণ নয়, গচ্ছিত ধান বেচে দেওয়া চুরির সামিল পাপ —ধান না দিলে ফৌজদারীতে একেবারে জেল! ধান যদি নেই, হিসাব মত বাজার দরে পাওনা ধানের দামটা দিয়ে দাও।

চাষীর হাতে টাকা এসেছে ঢের। যাই বাড়ুক তার খাজনা বাড়েনি। সবাই ভাবছে, এতদিনে চাষাই এবার সুখী, খাজনা দেবার খরচটা সে টেরও পাবে না। কিন্তু বাঁধা খাজনার বাঁধন অটুট রেখে জমিদার যে চাষীর লোভে ভাগ বসাতে পারে এ হিসাবটা সবার ফস্কে গেছে। আইন রেখে আইন ভাঙ্গার পেশায় যিনি মেডেল-যোগ্য গুণী, তিনি যেন প্রজারই ধনলাভে খুশী হয়ে ঘুমোতে পারবেন।

জমিদারও খাজনা চাইলে,—ধান। ভুলানো নয়, ঠকানো নয়, টাকার বদলে ধান। আগের চেয়ে দাম বেড়েছে ধানের? বেশ, আগের চেয়ে একেবারে একটাকা বেশী ধরো। জমিদার যে অবুঝ তাও নয়। ধান যার নেই সে টাকায় খাজনা দিক্, কি আর করা যাবে।

ধান যার কম আছে সে টাকায় আর ধানে দিক, কি আর উপায় আছে।

ধান যার আছে তার ভাবনা কি, ধানেই খাজনা শোধ!

ধানের তাই বড় অভাব ঘরে ঘরে, বীজধানেরও চমক্‌প্রদ অভাব।

সদরে বীজধান দেওয়া হচ্ছে। গৌরাঙ্গ, রঘু আর সদয় সামন্ত সদরে গেল বীজধান কিনতে। তিনজনই চাষা কিনা, বীজধান দেখে তাই তিনজনেরি সে কি জবর হাসি।

দম নিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, 'যে ধান গাছে তক্তা হয়, এতে সেই গাছ হবে।'

চাপরাসী কান ধরে তাদের বার করে দিল।

অনেকেরই বীজধান ছিল না, তবু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত আবাদের জন্য তৈরী সমস্ত জমির জন্য যত বীজধান দরকার ছিল যোগাড় হয়ে গেছে। বীজধানের জন্য সামান্য যা কিছু ছিল বাঁধা পড়ল, ঋণের বোঝা বেড়ে গেল, যারা কিনল বীজধান—জমির আগামী ফসলের মোটা অংশই মহাজনের কবলগত হয়ে গেল অনেকের। সরকারী কৃষি বিভাগের লোভ, লাভ ও অব্যবস্থার স্তর থেকে মহাজনের ঘর থেকে বীজধান নেমে এল আগামী দুর্দশার বীজ হয়ে চাষীদের ঘরে। অন্য সমস্ত কিছুই যেমন যার যত দরকার তার তত জোটে না,—কয়েকজন পায় অনেক, তার চেয়ে বেশী কয়েকজন পায় যথেষ্ট এবং অধিকাংশই পায় কম—প্রাণপাত সংগ্রহ প্রচেষ্টার ফলে চাষীদের বীজধানও ঘরে এল সেই নিয়মে।

বুড়ো হারাণের সাত বিঘে জমি, তার চার বিঘেতে বীজ ছড়ানো চলবে, তিন বিঘে বাঁজা হয়ে থাকবে উর্বর বিধবা মেয়ের মত। হারাণ করে কি, তিনুর কাছে গেল। তোমার অনেক বিঘে জমি তিনু, শ' বিঘে হোক তাই কামনা করি, লক্ষ্মীমন্ত হও। তুমি দানা পেয়েছো ঢের, ভাল সরকারী দানা। তোমার দীনু ভাইটি তক্‌মাধরী চাপরাসী, আহা, তার ভাল হোক, তোমার ভাল হোক। তুই আমার বাপ তিনু, আমার জন্মদাতা বাপ, গড় করছি তোর দু'টি পায়ে, আমায় দানা দে। দাম নে, নগদ নে, বেশী নে, কিন্তু দে।

তিনু। নেই।

হারাণ। আছে বাবা, আছে। ভাই তোর চাপরাসী, তোর নেই তো আছে কার?

তিনু। বাড়তি নেই।

হারাণ। দামও বেশী নে বাবা, দু'আনা ফসলও নিস্।

তিনু। জমি দাও, তিন আনা তুমি পাবে।

হারাণ। শালা! চোর! খচ্চর।

তিনু। ভাগ্ তবে ব্যাটা বুড়ো বাঞ্চোত্ ভাগ্। মেঁথি ঘাস রুঁয়ে দিবি যা, মাগনা পাবি। বোঝায় বোঝায় বেচবি ঘাস।

হারাণ। অ বাবা তিনু একটু বিবেচনা করো বাবা। দয়া ধম্মো করো বাবা একটু। মোর জমি, মোকে তিন আনা দিবি, ই কি একটা কথা হল রে বাপ্?

তিনু। তিন আনাই তো মাগনা পাবে, মফত্ পাবে। একপাই জুটবে তোমার জমি ফেলে রাখলে? আচ্ছা যাও, রুঁয়েটুয়ে খেটেখুটে সব করবে, চার আনাই দেবো তোমায়।

সময় নেই, উপায় নেই যে আর দশ যায়গায় চেষ্টা করবে। যত চেষ্টা সম্ভব ছিল সব সমাপ্ত হয়ে গেছে। তিনু শুধু মহাজন নয়, চাষী মহাজন, গত সনে তার প্রত্যাশা ছিল না, আগামী সনেও তার প্রত্যাশা নেই যে তিনুর হিসাব, বিবেচনা আর দরদ থাকবে মহাজনের মত, যতই সেটা হোক নিজেরই স্বার্থের হিসাব আর বিবেচনা, মেকি দরদ। তিনু মহাজন চাষী, তিনু তার শত্রু। স্বার্থের সংঘাতে ভাই যেমন শত্রু হয় ভাই-এর। তিনু তাই হারাণের জমি পেল আগামী ফসলের চার আনা ভাগের ভাড়ায়। খাজনার দায়িক হল না, ফলাবার শ্রমিক হল না, শুধু হল উর্বরতার মালিক। দাঁও মারার গৌরবে তিনু পুলকিত হয়ে রইল এবং হারাণের তিন বিঘে জমিতে ঘাস গজানোর বদলে ফসল হল!

এমনি অনেক রকমারী জটিলতার ভূমিকা তৈরী হবার পর সব ক্ষেতে ফসল ফলেছে। ফলেছে ভালই। বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে নিবিড় সতেজ তরুণ তৃণে, মোটা মোটা শীষের গোছ এদিক ওদিক দুলছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু মন কেঁপে ওঠে। আতঙ্ক জড়িত ক্লেশের মত একটা অনুভূতির খোঁচায় সর্বদা মনে হয়, এ ফসলে কারো পেট ভরবে না। এ শুধু ফসল অন্ন নয়। দাদ চুলকানোর আরাম ভুলে চাষীরা মাথা চুলকায়। ভাববার ও বুঝবার চেষ্টা করে যে এসব কি ব্যাপার। ধারণা করার ক্ষমতা দিয়ে কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না, শুধু গত দিনগুলির অভিজ্ঞতা তাদের ব্যাকুলতা এনে দেয়, অনির্দিষ্ট ভয়ের সাড়া জাগায়। কি একটা প্যাঁচে যেন তারা পড়েছে, কি যেন মুস্কিল ঘটবে তাদের, বিপদ আসবে। অভাবের জীবনে অভাব বাড়ে কমে, দুর্ভোগ চড়ে নামে, ওসব খাপছাড়া কিছু নয়। এবার সব উল্টোপাল্টা, গোলমেলে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। হাতের মুঠোয় এসে লাভ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লোকসানে। ভাল ফসল ঘরে তুলে বেড়ে যাচ্ছে খিদের যাতনা ভোগ। জমিদার মহাজন উকিল ডাক্তার দোকানী পশারী আত্মীয় পরিজন বন্ধু ও পর নিয়ে যত মানুষের সঙ্গে ছিল তাদের কারবার, কটা মাস যেন কেমন হয়ে গেছে তারা সকলে, কথা ও ব্যবহার যেন বদলে গেছে আগাগোড়া, লেনদেনের স্বাভাবিক হৃদয়হীনতা যেন দাঁড়িয়ে গেছে উলঙ্গ কুৎসিৎ নিষ্ঠুরতায়, লোভের যে অত্যাচার ছিল শুধু আদায়ের জন্য—আদায়ের পরে যেন তা বজায় থাকছে আরো তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়ে।

কে জানে এসব কিসের সূচনা, কি আছে তাদের ভাগ্যে।

বৈন চিন্তামনি,

তোমার যে পত্রখানা দিয়াছ ইহাতে পরম সুখী হইয়াছি। অদৃষ্টে সুখ নাই আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। কে দিবে যে আমার মন্দ অদৃষ্টে আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। আমার জমিটুকু ৺ওনার বড় ভাই জোর করিয়া গার দাপটে ভোগ দখল করেন তুমি জানিবা এবং কতকাল আমার বলিবার কিছু মুখ নাই কারণ গুরুজন বেটাছেলা তাঁহার অমান্য করিলে লোকে থুথু দিবে। বিন্দীপাড়ার বিপিনকে দিয়া এবার বসাইলাম যে এই দুর্দিনে আমার ভাগ দিবেন আমি এতকাল চাই নাই এখন ভাগ না পাইলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। পেটের খুধায় তুমি মধুবণী গিয়াছ বলিয়া আমার অন্তরে কত দুক্ষ জানিয়া গ্রাহ্য করিল না। সাভ জবাব দিল এমন পাষাণ। আমি কত সাধাসাধি করিলাম দাদা গিয়া কিছু বলিল না। ১ মাস যাবত আমাশায় ভুগিবার কালে কত সেবা করিয়াছি, গু মুত ঘাটিতে ঘিন্না করি নাই। বর্তমানে অসুখ সারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসাও করে না। বৌ আংটি চাহিয়াছিল আমি দিই নাই তৎকারণে শত্তুর হইয়া আছে তুমি জানিবা, বৌর পরামর্শ দাদাকে বিরাগ করিয়াছে। আংটি বাঁধা দিয়া টাকা লইয়াছি আমি কেমন করিয়া আংটি দিব। বৌর কথায় মার পেটের বৈনকে ভাসাইয়া দিল। দাদা বলিল তা আমি কি করিব, বিন্দীপাড়ার বিপিনকে দিয়া ৺ওনার বড় ভাইকে বলাইলাম! বিপিনের ভাইর সঙ্গে হেমীকে জোর কারয়া বিবাহ দিয়াছে। ডাকাতের হাতে মেয়ের বিবাহ দিয়া কি অশান্তিতে আছি আমারই অন্তরে জানে। দাদা বলিল না আমি কি করিব। বিপিনকে বলিলাম সে গিয়া বলিল। আমি মেয়ালোকে কেমন করিয়া বলিব। জামাই হেমীকে লইয়া কাকীর বাড়িতে চাঁপাবালাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল। মাত্র ২ দিন ছিল। কাকী পত্র লিখিয়াছে জামাই শাশুড়িকে প্রণামি ১ খানা কাপড় দিয়াছে তাহা গামছার মত। সোনার গহনা ইত্যাদি চাহিদা অনেক গোলমাল করিয়া হেমীকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। জোর করিয়া বিবাহ দিয়া চাঁপাবালার শ্বশুর এইরূপ কার্য করিল। কাকী চাঁপাবালা আর হেমীকে রাখিতে পারিবে না বলিয়াছে। শ্বশুরের কাছে টাকা চাহিতে গিয়া পায় নাই, দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে এমন শ্বশুর দেখি নাই। গোঁসাই ঠাকুর বলিতেছেন আর কুলাইবে না অধিক আর কি লিখিব। আমি ডায়মণ্ডহারবার যাইব না, কেমন করিয়া যাইব। নবিন ধানের কাজ করিয়া টাকা পায় নাই। নুনা জলে ধানের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তুমি সর্বদা পত্র লিখিবে। আমার যাওয়া চলে না। তুমি পেটের খুধায়।

'দিদি'

দুই

রঘুর অবস্থা এদের মধ্যে একটু ভাল। বছরের বারোটা মাসেরই খোরাক তার জোটে, ছেলেপুলে আর বুড়ো বাপ একটু দুধ পায়, ঘরের চালা ঝাঁঝরা হয়ে জল পড়ে না, মাঝে মাঝে সকলে নতুন কাপড় পরে, মেয়েরা চুলে তেল দেয়।

রঘুর দুটি বৌ, বিরজা এবং দুর্গা। বিরজা বড় বৌ, দশ এগার বছর স্বামীর ঘর করছে। দুর্গা এসেছে তার বছর চারেক পরে। বয়সে বিরজা তার সতীনের

চেয়ে বড় হবে কি না সন্দেহ, হয় তো বা ছোটই হবে দু' এক বছরের। তবে কি না চাষী গেরস্ত ঘরে অত বছর গুণে বয়সের হিসেব রাখার গরজ কারো নেই, দরকারও হয় না। যে বয়সে বিরজা যতখানি বিয়ের যুগ্যি হয়েছিল তার চেয়ে বছর বেশী বয়সেও দুর্গা সে যোগ্যতা পায়নি।

আকারে বিরজা দুর্গার চেয়ে অনেক বড়, লম্বায়, চওড়ায়, মাংসের সংস্থানে। ছোটখাটো বেঁটে আর রোগা প্যাটকা চেহারা দুর্গার। অনেক চেষ্টায় দেড়মাস জীইয়ে রাখবার মত একটা খুদে ছেলে বিয়োবার পরেও তার বিয়ের সময়কার চেহারা বিশেষ বদলায়নি, শুধু মুখখানা একটু প্যাঙাসে মেরে গেছে উপোসীর মত। বিরজার ছেলেমেয়ে হয়েছে মোট সাতটি, তার মধ্যে তিনটি বেঁচে নেই। বিরজার এই বাড়াবাড়ির জন্যই দুর্গাকে রঘুর বিয়ে করা, ঘন ঘন দীর্ঘকালের জন্য শয্যার ফাঁকা অসম্পূর্ণ জীবন তার সয়নি। নইলে বিরজার জন্যই চিরদিন তার দরদ বেশী। বিরজা তার প্রথম বয়সের সোহাগিনী, তার ছেলেমেয়ের মা, তার সঙ্গে কি অন্য কারো তুলনা হয়! আজও সেই তার সব, বাড়তি একটা বৌ ছাড়া দুর্গা আর কিছুই নয়।

ঈর্ষায় আতঙ্কে বিরজা প্রথমে ক্ষেপে গিয়েছিল। তারস্বরে ঘোষণা করেছিল যে সতীনকে মেরে নিজে সে বিষ খেয়ে মরে যাবে, তারপর রঘু যেন আবার বিয়ে করে, দশটা বিশটা বিয়ে করে, বিয়ের সাধ মেটায়, সে কিছু বলতে আসবে না। দুর্গাকে রেখে, রঘুর মন বুঝে, নিজের যা কিছু ছিল সব বজায় আছে এবং থাকবে জেনে, শেষে বিরজা শান্ত হয়েছিল। তার মনে আর কোন ক্ষোভ থাকে নি! তাকে ছেড়ে তাকে ভুলে ছেলে তার খেলার পুতুল নিয়ে মেতেছে দেখলে তার যেমন স্নেহাদ্র প্রশ্রয় জাগে, রঘুর আবার বিয়ে করাকেও সে তেমনি তার জীবন্ত পুতুল নিয়ে খেলা করার ছেলেমানুষী বলে গ্রহণ করছে। চারিদিক বিবেচনা করে মনে মনে বরং একটু খুসীই হয়েছে বিরজা, স্বস্তি বোধ করেছে। পুরুষ মানুষের আলগা সখের জন্য এই ব্যবস্থাই মন্দের ভাল। স্বভাব বিগড়ে পুরুষ সংসারধর্মে উদাসীন হলে বড় বিপদ ঘটে, তার চেয়ে এ অনেক ভাল। আর যাই হোক, ঘরমুখো মানুষ এতে ঘরমুখোই থাকে।

দুর্গাকে বিরজা শাসন করে, কেঁটে ছেঁটে তার অধিকার খর্ব করে রাখে, কিন্তু তেমন কিছু অত্যাচার করে না। রঘুর পক্ষপাতিত্বই দুর্গাকে সতীনের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছে। বিরজা যাই করুক তাকেই রঘু চিরদিন সমর্থন করেছে, কখননো ভুলেও দুর্গার পক্ষ নেয়নি। দুর্গাকে বেশী কষ্ট দেবার তাগিদও বিরজা তাই কখনো অনুভব করেনি।

দুর্গাও বিরজার মন যুগিয়ে চলে, তার হুকুমে ওঠে বসে। ভারি ভারি কাজ করা তার শক্তিতে কুলোয় না, ছোট খাটো খুঁটিনাটি কাজ সে অবিশ্রাম করে যেতে পারে। ছেলেমেয়ে গাই বাছুর নিয়ে যে গেঁয়ো চাষীর সংসার সেখানে এরকম কাজের অভাব নেই। বিরজার সেবাও দুর্গা করে, তার চুলের জট ছাড়িয়ে, পিঠের ঘামাচি মেরে, পায়ের হাজায় তেল লাগিয়ে। এতে তার আপশোষ কিছু নেই। মনে নালিশ পুরে রেখে বিরজাকে সে খুসী রাখতে চেষ্টা করে না, সতীনের মন যোগানোর স্বভাবটা তার আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। পায়ের নীচে দাঁড়াবার মাটি কোথায় নরম কোথায় শক্ত টের পাওয়ার মত স্পষ্টভাবেই পরাশ্রয়ী মেয়েমানুষ জানতে পারে কোথায় তার আশ্রয়। মানিয়ে চলাটা তাদের মজ্জাগত ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

রঘুর অবাধ্য হতে দুর্গা ভয় পায় না, কসুরও করে না তাকে চাপা গলায় দু'চারটে মন্দ কথা শুনিয়ে দিতে। কিন্তু বিরজার সব কথা সে মেনে চলে। নির্বিচারে মেনে চলে।

এবার এক কাণ্ড করে বসেছে দুই সতীনে। দু'জনে পোয়াতি হয়েছে প্রায় এক সঙ্গে। ক্ষেতে ফসল কাটার কাছাকাছি সময়ে তাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা।

সে পর্যন্ত টিকে থেকে দুর্গা যদি অবশ্য হাঙ্গামাটা সইতে পারে। দুর্গার শরীর বড় খারাপ, তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দিতে হয়েছে! সময় আসা পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ জেগেছে সকলের মনে এবং এ বিষয়ে সকলেই প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে যে কোন রকমে ততদিন বেঁচে থাকলেও প্রসবের ধাক্কাটা সে সামলাতে পারবে না! সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই সে মারা যাবে।

ডাক্তার কবিরাজ একথা বলেনি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজেরাই তারা জেনেছে। বাড়ির মানুষ শুধু নয়, গাঁয়ের মেয়েরাও দেখতে এসে সায় দিয়ে গেছে এই আন্দাজে গর্ভবতী স্ত্রীলোক যারা মরে ছেলে হবার সময় এমনি অবস্থাই তাদের হয় শরীরের প্রথম থেকে। এমনি যারা সুস্থ সবল তারাই এরকম অবস্থা হলে আর বাঁচতে পারে না, দুর্গা তো চিরদিন দুর্বল, ক্ষীণজীবী।

আপদ চুকে যায় তো যাবে, বিরজার মনে হয়েছে একথা! এরকম অনেক কথাই মানুষের মনে হয়, অধিকাংশ সময়েই কিছু তাতে এসে যায় না। তাছাড়া, ওকথা মনে হওয়ার মানে এই নয় যে আপদ চুকে যাবার প্রক্রিয়াকে বাতিল করার জন্য চেষ্টা করতে সাধ জাগবে না। বিরজা নিজেই গরজ করে রঘুকে দিয়ে দুর্গার চিকিৎসার জন্য মথুর ডাক্তারকে আনাল।

মথুর ডাক্তার বলল, 'ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। নাড়ী একটু দুর্বল, জ্বরের লক্ষণটা ভাল নয়। এরকম পেট খারাপ থাকলে চলবে না। তা, একরকম ঠিক হয়ে যাবে ও সব।

মথুর ডাক্তারের অভয়বাণী শুনে রঘু হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তারের পরীক্ষার সময় সেও কাছে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দুর্গাকে দেখেছে। তারও জানা ছিল দুর্গা এবার মরতে পারে, আজকেই দুর্গা তার নজরে পড়েছে কয়েকবার, অথচ সে সত্য সত্যই জানত না এমন বিশ্রী হয়ে গেছে তার ছোট বৌটার চেহারা। গলা পর্যন্ত কাঁথা ঢাকা দিয়ে চিৎ হয়ে দুর্গা বিছানার সঙ্গে মিশে শুয়ে আছে, পেটটা শুধু তার উঁচু। শীর্ণ বিবর্ণ মুখের দুটি কোটরে জ্বরের ধমকে জ্বল জ্বল করছে কালো দুটি চোখ। বাড়িতে ডাক্তার এলে এমনি মনটা দমে যায় মানুষের, ভুলে যাওয়া রোগ শোক অজানা বিষাদ হয়ে ঘনিয়ে আসে, সমবেদনায় থমথম করে অনুভূতির জগত। দুর্গার দিকে চেয়ে থেকে তার যে কঠিন অসুখ হয়েছে অনুভব করে রঘুর ভেতরে অস্থির করছিল। রঘুর ডাক্তারের মুখে রোগের আশাপ্রদ আলোচনা শুনে সেটা ভয়ে পরিণত হয়ে গেল।

'বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?'

'বাঁচবে না? কেন, ওর হয়েছে কি! ছেলেপিলে হবে বলে একটু যা ভাবনার কথা, নইলে অসুখ তো সেরে যাবে দু'দাগ ওষুধে।'

ওষুধ লিখে দেবার কাগজ বাড়িতে না পাওয়ায় মথুর চটে গেল। রোগের এই মরসুমের সময় চারিদিকে তার অসংখ্য রোগী, তার কি বসে থেকে নষ্ট করবার মত সময় আছে?

'দাও, বাপু, ওই ঠোঙ্গাটা এগিয়ে দাও।'

ঠোঙ্গার কাগজেই মথুর ওষুধ লিখে দিল। তার নিজের দোকান থেকেই ওষুধ আসবে। এমনভাবে সে প্রেসক্রিপসনে লেখে যে সে ছাড়া আর কারো পড়বার ক্ষমতা থাকে না। অনেকদিন কম্পাউণ্ডারী করে মথুর ছোটখাট একটি ওষুধের দোকান খুলে

সস্তায় ডাক্তারী আরম্ভ করেছিল, চাষী মজুরদের মধ্যে তার খুব পশার। ফি সে যে শুধু কম নেয় তা নয়, তার সঙ্গে দরদস্তুর করে আরও দু'চার আনা কমানো যায়, পয়সার বদলে ফলমূল ধান চাল দুধ দই দিয়েও তার পাওনা মেটানো চলে। চাষীরা তাই অত্যন্ত পছন্দ করে তাকে। যাবার সময় মথুর বলে যায়, 'শুধু বার্লি আর ওই ফুডটা খাওয়াবে বাপু। যেমন বললাম তেমনি করে খাওয়াবে। ফুডটা কোথা পাবে জানি না। আমার কাছে নেই। পাও যদি তো দাম দিতে কান্না আসবে, তাও বলে যাচ্ছি আগে থেকে। কিন্তু ওটা চাই। গায়ে জোর নেইকো একদম, পেটে কিছু সইবে না, ওটা এনে খাওয়াতে হবে। দুধটুধ ভাতটাত আর দিও না কিন্তু খপর্দার !'

রঘু নিজের মনে খানিক চিন্তা করে বলে, 'হ্যাঁ শালার ডাক্তার ভালো। ঠিক ধরেছে। ছোট-বৌ শুনছ ? যা তা খেয়োনি।'

চিঁ চিঁ গলায় দুর্গা বলে, 'খেতে দেয় নাকি মোকে ? খিদেয় মরে যাই না ?'

রঘু বিরজার দিকে তাকায়।

বিরজা মাথা নেড়ে বলে, 'চোখের খিদে। কাণ্ডার হয়েছিল মনে নেই ? যেমন খায় ঠিক তেমনি সব বেরোয় আর সারাখন খাই খাই করে মরে ? কতো খাওয়ানু তবু পাঁকাটি হয়ে গেল না অমন ছেল্যা মোর, মরে গেল না ! চোখের খিদে মরণ খিদে বার্লি তোলা রইতে পারে একটুকু, ফুটিয়ে দিচ্ছি, খাওয়াও না কেন।'

বিরজা যেন রাগ করেই বার্লি ফুটিয়ে আনতে যায়। কিন্তু রঘু জানে এটা তার রাগ নয়। মৃত সন্তানের কথা মনে পড়লেই বিরজার সব কথায় কলহের সুর আসে, দুপদাপ পা ফেলে সে হাঁটে। দুর্গার কাছে গিয়ে রঘু তার কপালে হাত দিতে জ্বর অনুভব করে, হাতের তালু এবং উল্টো পিঠে দুদিক দিয়েই জ্বরটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। মথুর ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে বলে গেছে জ্বর কত, কিন্তু রঘুর কাছে স্পর্শ না করে তাপ টের পাওয়ার কোন অর্থ নেই। একশো তিন বেশী জ্বর তা সে জানে, কেমন ধারা বেশী সেটা তো জানতে হবে গায়ে হাত দিয়ে।

হ্যাঁ, কপালটা পুড়ে যাচ্ছে দুর্গার। গলার নীচে বুকের তাপটাও রঘু পরীক্ষা করে। ডানহাতটি বার করে দুর্গা গায়ের কাঁথার ওপরে ফেলে রেখেছিল, মরা সাপের মত হাত। মায়া দেখাতে নয়, তাপ দেখবার জন্যেই সে হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে রঘুর যেন ধাঁধাঁ লেগে যায়। নিজের পরিপুষ্ট সবল হাতের মস্ত থাবায় এইটুকু হাত নেতিয়ে আছে দেখে দুর্গাকে তার খানিক আগের চেয়েও অনেক ছোট্ট, অনেক ক্ষীণ মনে হয়। একটু হতভম্ব হয়ে থাকে রঘু, তার গা ঘিন ঘিন করে। কিছু দিন আগে চাঁদ মাইতির আট বছরের মেয়েটাকে নিয়ে গাঁয়ের ভূতনাথ সা'র কীর্তির কথাটা মনে পড়তে থাকে। ভূতনাথের জেল হয়েছে সাত বছর। যত সে নিজেকে বোঝায় যে এ তার বিয়ে করা বৌ, বয়স এর কম হয়নি, অনেককাল এ তার ঘর করেছে, একবার মা হয়েছে তার ছেলের, ততই যেন শায়িতা দুর্গা ম্যালেরিয়ায় পেট মোটা কঙ্কালসার কচি একটা মেয়ে হয়ে তার আরও বেশী ঘেন্না ধরিয়ে দেয়।

বার্লি করে এনে বিরজা দেখল রঘু বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

স্টেশনের কাছে বাজার, সেখানে সবগুলি দোকান খুঁজে ফুড মিলল না। হাফেজের মনোহারী দোকান আর রামশরণের ডিস্পেন্সারীর সমান কিছু এ অঞ্চলে নেই। ফুডটা দু'জনের দোকানেই ছিল, কিন্তু বিক্রী করার গরজ ছিল না মোটেই। এসব জিনিসের দাম তখন দিন দিন চড়ছে চোরাবাজারে।

'এ যে মুস্কিল হ'ল গোর ?'

'সদরে গেলে হয়।'

দুর্গাকে দেখে অবধি গৌরাঙ্গের চোখ দুটি ছলছল করছিল। বয়স তার বেশী হয় নি, যদিও সাধারণ হিসাবে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। অনেকদিন রঘু সদয় তিনুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যতই কাবু হয়ে পড়ার ভান করুক, বিয়ে করতে পারেনি বলে সংসারের ভাবনাগুলি তার এখনো খুব হাল্কা। এক মা, এক বিধবা ভাজ আর তিন ভাইবোনের ভার অবশ্য কম নয় তার মত গরীবের পক্ষে, এই ভারেই সে নির্ঘাত কাবু হয়ে পড়বে কয়েক বছরের মধ্যে, যদি না তার আগেই ওদের মরণ বাঁচন সম্বন্ধে উদাসীন হতে শিখে যায়। গৌরাঙ্গের চেয়েও অনেক বেশী কোমল হৃদয় যুবকের যে উদাসীনতা আসতে দেখা গেছে। বৌ আর ছেলেমেয়ের ভালমন্দ সম্বন্ধেও মানুষের উদাসীনতা আসে, কিন্তু সেটা সাধারণত জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসে ভোঁতা নির্বোধ হয়ে যাবার লক্ষণ। সদয়ের ভাই হৃদয়ের যেমন হয়েছে, যোয়ান মদ্দ মানুষটার বেঁচে থাকতেই যেন গা নেই।

সদরে যাবার আগে পটলের পরামর্শে রঘু নীলকণ্ঠের কাছে গেল। গৌরাঙ্গও তার সঙ্গে গেল। এ বাড়িতে সে কিছুদিন থেকে দুধ যোগান দিচ্ছে, এই সম্পর্কের জোরে ফুড সংগ্রহ সম্পর্কে বাবুর কৃপা দাবী করা হয়তো একটু জোরালো হবে। পটল আগেই শিখিয়ে দিয়েছিল যে শুধু কাঁদাকাটায় ফল হবে না, একেবারে নগদ টাকা সামনে রেখে বাবুকে ধরে পড়তে হবে। দুটি টাকা নীলকণ্ঠের পায়ের কাছে রেখে কাঁদাকাটার বদলে গভীর উদাস কণ্ঠে রঘু তার নিবেদন জানাল। প্যান প্যান করা তার আসে না। গৌরাঙ্গের কথাগুলি বরং শোনাল ঢের বেশী করুণ—যেভাবে হোক বাবু যদি যোগাড় করে না দেন তাহলে রঘুর ব্যারামী বৌটা যে মরে যাবে, এইটুকু জানাতে গিয়েই গলাটা ধরে এল তার।

নীলকণ্ঠ বৈঠকখানায় তামাক খেতে খেতে এই সকাল বেলাই অর্ধেক চোখ বুজে স্বপ্ন দেখছিল,—টাকার স্বপ্ন। দু'জনের কথা শুনে সজাগ ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'তোরাও মজেছিস ? বলি বাবা, রোগ ব্যারাম কি আগে ছিল না। এদেশে, না, বোতল ভরা ফুড না খেয়ে রোগ সারেনি কারো ? বাপ ঠাকুর্দা তোদের চোখে দেখেছিল না নাম শুনেছিল ফুডের ?'

রঘু সাগ্রহে বলল, 'আমিও তো তাই বলি। ডাক্তারবাবু কিনা ফুড ফুড করে খ্যাপা তাইতে নিরুপায়।'

কাল থেকে রঘুর মনে হচ্ছিল ফুডটা নিয়ে চরম দায়ে ঠেকেছে। ফুডটা দুর্লভ হওয়ায় তার কেমন ধারণা জন্মে গিয়েছিল, এই বস্তুটি সংগ্রহ করার উপরেই দুর্গার বাঁচন মরণ নির্ভর করছে, ফুড খেলে দুর্গা বাঁচবে, নইলে বাঁচবে না। নীলকণ্ঠের কথায় দায়বোধটা একটু হাল্কা হওয়ায় স্বস্তি পেল।

'ডাকিস কেন ডাক্তার ? ও হল বিলিতী চিকিচ্ছে, বিলেতের লোকের জন্যে। যেমন দেশ, যেমন লোক, তেমনি হবে চিকিচ্ছে, এই হল রীতি। আমরা আর সায়েবরা সমান নাকি ? ওরা হল গে স্লেচ্ছ, বর্বর—দেহসর্বস্ব জাত। একটা লোক প্রেমভক্তির সন্ধান জানে ওদেশে ? একটাও না। ওদের চিকিচ্ছে এদেশে খাটবে কেন বাবু ? এদেশের ডাক্তারী নেই ? আয়ুর্বেদ হয়নি এদেশে ? কোবরেজ মশায়কে ডাকতে পারলে না ?'

'আজ্ঞে ভুল হয়ে গেছে। ফুডের বদলিতে তালি কি খাওয়াই ?'

রঘুর এ প্রশ্নের জবাব নীলকণ্ঠ দিতে পারল না। বোতল ভরা ফুডের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ পথ্য আছে ঢের, কিন্তু নীলকণ্ঠ কি মুখস্থ করে বসে আছে তার নামগুলি ?

কবিরাজকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে। শুনে রঘু আবার দমে গেল। দায়বোধটা ভারি হয়ে উঠল আবার।

'তালি ওই এইগোটা যোগার করে দেন বাবু।'

'আমি কোথা যোগাড় করব ফুড ?'

নীলকণ্ঠের মেয়ে সুনীতি ধিনিক ধিনিক নাচের ভঙ্গিতে অকারণেই ঘরে এসেছিল, এবার সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। একটা ফুডের অভাবে একজনের বৌ মরে যাবে শুনে মনটা কেঁদে উঠেছিল বলে নয়, ভেবে চিন্তে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলেই সে বলে ফেলল, 'আমাদের তো দুটো আছে, একটা দিয়ে দাও না বাবা।

মেয়েকে ধমক দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে নীলকণ্ঠ বলল, 'ওর একটাও দিতে পারব না বাবু, আমি কি দোকান খুলে বসেছি ? বিপদ-আপদের জন্য রেখেছি ও দুটো, কখন দরকার হয়।'

'আনিয়ে দেবেন বাবু ?'

'না—না—না। আমি পারব না।' নীলকণ্ঠ গর্জন করে উঠল। তার রাগ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রঘু আর গৌরাঙ্গ জানল কেন যে তার বাড়িতেই দু'টো ফুড আছে ? এ এক দুর্ঘটনা বৈকি ! কপালটাই মন্দ রঘুর। বাড়ির জিনিষ না দিক, নীলকণ্ঠ দয়া করে একটা ফুড আনিয়ে দেবার ভারটা নিশ্চয় নিত। কিন্তু রাগ হলে মানুষ কি দয়া করে ?

ভোরে গৌরাঙ্গ নীলকণ্ঠের বাড়ি দুধ দিতে যায়, গাছের মাথা থেকে রোদ মাটিতে নামার আগে। গায়ের জ্বালায় পরদিন সে অনেক বেলা ক'রে গেল আর এমন জল মেশালো দুধে যে জিনিষটা দাঁড়িয়ে গেল দুধ মেশানো জল। সময়মত চা না পেয়ে সকলে ক্ষেপে ছিল, হিসাব মত অভ্যর্থনা পেয়ে গৌরাঙ্গ খুসী হল। তার এই প্রথম ত্রুটিকে সবাই উদারভাবে ক্ষমা করলে সে বড়ই ক্ষুণ্ণ হত !

'এত দেরী করলি যে বজ্জাত ?'

'দেরী হয়ে গেল বাবু।'

'একি দুধ রে হারামজাদা ?'

'মোর দুধ ওমনি বাবু।'

নিজেকে বেশ নির্দয় ও নির্ভীক মনে হয় গৌরাঙ্গের, যেটুকু রাগ প্রকাশ পাচ্ছে তার চেয়ে বিশগুণ রাগ বাবুদের হয়েছে সন্দেহ নেই। যতটা রাগ চাপা যায় চেপে রেখে শুধু যে বাড়তি অসহ্য রাগটুকুকে বাবু আর তার মাগছেলের চোটপাট, একি আর টের পেতে বাকী আছে গৌরাঙ্গের। তাকে ধরে মারতে না পেরে কি কষ্টই না হচ্ছে এনাদের ! দুধের বেশ টানাটানি পড়েছে চারিদিকে। গোয়ালার গরু কমেছে, গেরস্তের গরু কমেছে, রোগা গরু আরও রোগা হয়ে দুধ দিচ্ছে কম। কিছু কম দামে প্রায় খাঁটি দুধ তার কাছে এতদিন পাওয়া গেছে, তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে মুস্কিলে পড়বার ভরসা এনাদের নেই। নীলকণ্ঠের বন্ধু উকিল মধুবাবু চুপিচুপি তাকে সেধে গেছে এখানে যোগান বন্ধ ক'রে তাকে দুধ দিতে—দাম সে বেশী দেবে, আগাম দেবে। কিন্তু তখন নীলকণ্ঠকে গৌরাঙ্গ খাতির করত, পোয়াতি একটা মেয়েছেলের প্রাণ বাঁচাতে একটা ফুড না দিয়ে সে তখন তাকে চটায় নি। কাকার সঙ্গে ভিন্ন হয়েই দুধের বদলে নীলকণ্ঠের কাছ থেকে অতি দরকারী কটা টাকা পেয়ে গৌরাঙ্গ কেনা হয়ে গিয়েছিল। কাল পর্যন্ত সে ধারণাও করতে পারেনি এ কৃতজ্ঞতার তার কারণ নেই, বাবুর দরদ সেরেফ ফাঁকি। অভিভাবকের,

ভালমন্দের দায়িকের ঋণ যেন সে শোধ করছে কাল পর্যন্ত ভোরে উঠে সবার আগে একটুখানি জল মেশানো দুধ পৌঁছে দিয়ে ! হুস করে উপে গেছে সে ভাব। তার মনের বিরাগে শুধু নীলকণ্ঠের কালকের অপরাধ নয়, এতদিন ধরে তাকে ঠকানোর অপরাধেরও শোধ নিতে পারছে ভেবে হিংসার সুখে মনপ্রাণ তার তাজা হয়ে ওঠে।

অনেক লম্পটের শোষণে ছিবড়ে বনা বাজারের মেয়েলোকের মত এ বাড়ির গিন্নির চেহারা, গলায় মোটা চেন হারটি সোনার শিকলের মত। এতদিন কিছু মনে হয়নি গৌরাঙ্গের ভদ্রমহিলাকে দেখে মৃদু একটা অস্বস্তিবোধ ছাড়া, আজ বারে বারে তার গরুর কথাটা মনে পড়তে লাগল, যার গলায় হারের মত একটা কুকুর বাঁধা শিকল জড়ানো আছে তিন বছর।

সবার শেষে গিন্নি থামল। গিন্নি থামা পর্যন্ত ঠায় বসে রইল গৌরাঙ্গ বারান্দায় একপাশে উবু হয়ে। শেষের দিকে একবার তার সাধ হল যে বেয়াদবির পালা সাঙ্গ করে নাকে খত দিয়ে আবেগে গদ গদ ভাষায় ক্ষমা চেয়ে জানিয়ে দেয় যে, এমন আর হবে না কোনদিন, ফিরে আবার প্রার্থনা জানায় একটা ফুডের জন্য।

কিন্তু সাধ জাগলেও সংকোচের জন্য সেটা গৌরাঙ্গ পেরে ওঠে না। বড় স্পষ্ট হয়ে যায় তার বজ্জাতির মানে। বড় খাপছাড়া ঠেকবে পরের বৌয়ের জন্য তার এমন ধারা ব্যাকুল হওয়া। হঠাৎ সে যেন দিশে পায়। কেউ যা করে না, মোটেই নিয়ম নয় সংসারের যা করা, সে তো তাই করেছে হাবার মত খেয়ালের বশে অসংগত কাজ— তার যে সাত পুরুষের কেউ নয় সেই একটা রোগা ক্যাংটা মেয়েলোকের মরণ বাঁচন নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে ! টের পেলে লোক হাসবে। তাকে ভাববে ছেলেমানুষ, ছ্যাবলা। সকলে হাসি তামাসা করবে, টিটকারী দেবে।

গোবর্ধনের ছেলে কালীচরণ ছিল তার স্যাঙাৎ। বছর চারেক আগে কালীচরণ কলেরায় মারা যেতে পৃথিবী শূন্য দেখে শোকে একটু বাড়াবাড়ি রকম কাতর হওয়ার ফলাফলটা গৌরাঙ্গের মনে পড়ে যায়। শুধু তাকে ভেংগিয়েই সবাই ক্ষান্ত হয়নি, বড়দের পরামর্শে তাকে ধরে বেঁধে জোর করে মাথা ন্যাড়া করে জল ঢালা হয়েছিল কলসী কলসী, মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল মনসা পাতার রস।

'ওবেলা দুধ দেব দিদিমণি।'

সুনীতি পালিশ করা চকচকে আওয়াজে বললে, 'আদ্দেক আর আদ্দেক দুধ জল তো। তোমার নামটি কেন গৌরাঙ্গ ? ফর্সা ছিলে বুঝি ছেলেবেলা ?'

তামাসায় গৌরাঙ্গের প্রাণে আঘাত লাগে। জীবন তার কাছে ভয়ানক ভারী আর গভীর, একটুখানি কুঁড়ে ঘরে বুড়ী মা, কচি বোন আর গাই-বাছুরটি নিয়ে সমারোহহীন যে জীবনটুকু সে যাপন করে। বিয়ে করে গাদাখানেক ছেলেপুলে না'হলে এ ভাবটা তার কাটবে না, বোধশক্তি ভোঁতা হবে না।

খিড়কি দিয়ে গৌরাঙ্গ এ বাড়িতে আনাগোনা করে। মেঠো রাস্তায় তার পথ সংক্ষেপ হয় না, কিন্তু মেঠো রাস্তায় চলে তার আরাম হয়। তার ভারি আশ্চর্য লাগে যে মানুষের পায়ে পায়ে এমন সরু সুন্দর নির্দিষ্ট পথ কি করে গড়ে ওঠে। কে সকলকে বলে দেয় কোন আধ হাত পরিসরের মধ্যে পা ফেলতে হবে ? খেলার মাঠের বুক চিরে নতুন পথের রেখা সৃষ্টি হতে দেখেও সে বুঝতে পারেনি কি করে কি হল। প্রথমে শুধু কয়েকটি অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন এখানে ওখানে ছড়ানো, পায়ের চাপে শুয়ে পড়া ঘাস, তারপর মরা ঘাসের বিবর্ণতার অনির্দিষ্ট রেখা ও ধীরে ধীরে সেই রেখার উদলা মাটির পথে পরিণতি। আরও কি অদ্ভুত ব্যাপার, আবর্জনার পাশ কাটাতে

গোড়ার দিকে পথটি যেখানে একটু বেঁকেছিল, আবর্জনা নিশ্চিহ্ন হবার পরেও পথের সে বাঁক থেকে গেল—কেউ চেষ্টা করল না সে বাঁককে সোজা করতে। মানুষের এসব একর্থকতার প্রমাণ বড়ই দুর্বোধ্য আর রহস্যময় মনে হয় গৌরাঙ্গের। গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কথা বেছে বেছে গান রচনা করে সে তার এই অনুভূতিকে রূপ দেবার চেষ্টা করে।

বাঁকা পথে ছাতিমপাড়া যাতি হবে গো
উদাস নগরে পথ দেখাবে কে।
মানুষ চলা পথে যাবার নাগর কি গো সে॥
আহা হৈ… !
আলো সই !

নীলকণ্ঠের বাড়ির খিড়কির দরজার পরেই একটা পড়ো চালা, তার ওপাশ থেকে হাঁটা পথ গেছে দুদিকে। এদিকে মাঠ পেরিয়ে পুকুর ঘুরে বড় রাস্তার ধারে সেই শিরীষ গাছের কাছে, যার তলে দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তামণি পটলকে সাইকেল থেকে নামিয়ে তার চিঠি পড়ায়। আর পূর্বদিকে পথ গেছে ছোট জঙ্গল ভেদ করে তাঁতিপাড়ার গা ঘেঁষে গৌরাঙ্গের বাড়ির দিকে।

চালার পিছনে চিন্তামণি দাঁড়িয়েছিল। আঁচলের আড়াল থেকে একটা ফুড বার করে সে গৌরাঙ্গের গামছায় জড়িয়ে বেঁধে দিল, ভর্ৎসনা করে বলল, 'তোমার কাণ্ডখানা কি, দুধ মাপতে বেলা কাবার হল? এটা খাইয়ো তাকে সেই যার ব্যারাম। কাল যে জন্যে বাবার কাছে এইছিলে গো তোমরা, কি জ্বালা !'

'কোথা পেলে ?'

বাবুর ঘর থেকে সরিয়েছি, কোথা আবার পাব ? জানাজানি হয়নি যেন, বাবা দূর করে খেদিয়ে দেবে মোকে। বৌটা কেমন আছে ?'

'বাঁচে কি না বাঁচে।'

আপশোষের একটা আওয়াজ করে চিন্তামণি মুখখানা করুণ করতে চায়। গৌরাঙ্গের মনে পাক খেতে থাকে জিজ্ঞাসা যে চিন্তামণির কাজের মানে কি।

চিন্তামণির মনে দরদ আছে নিশ্চয়! অজানা অচেনা পরের বৌয়ের জন্য নইলে কে সাধ করে চুরি করতে যায়। অথচ মুখ দেখে আর গায়ে পড়ে কথা বলতে শুনে মনে হয় যেন ভারি চালাক মেয়েমানুষ, প্যাঁচ আছে তার মধ্যে।

তাকে আরেকটু চিনবার ইচ্ছায় গৌর শুধোয়—'তুমার ঘর কুথা গো ?'

শুনে চিন্তামণি মুচকি হাসে।—'ওটা পৌঁছে দাওগে যাও। আলাপ কোরো'খন পরে যখন সময় পাবে।'

বলেই দমক মেরে পিছন ফিরে সে হাঁটতে সুরু করে দেয় তাড়াতাড়ি ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটার ভঙ্গিতে। অনেকদিন থেকে সে জানে এমনি করে হাঁটার সময় কোমরের নীচে দেহের গাঁথুনি তার মানুষের নজর টেনে নেয়। কোনদিন তার কোমর দুলিয়ে হাঁটা দেখার কপাল যদি নাই হয়ে থাকে এ ছোঁড়ার, আজকে দেখুক। বাবুর মেয়ে নাচে,—কি ছাই সে নাচ! সাপের মত হাত দুলিয়ে এপাশ ওপাশ করে হাঁটু পেতে বসে আর উঠে দাঁড়িয়ে যদি নাচ হত ওই রোগা প্যাঁটকা শরীর নিয়ে, মানুষ তবে কাঠিকে শাড়ী পরিয়ে খুসীমত নাচাত, মেয়েমানুষ চাইত না। মেয়ে নাকি আবার প্রাইজ পেয়েছে নাচ দেখিয়ে! গৌর যদি কোনদিন দেখে থাকে তার দেশের ওই মেয়ের নাচ, আজ বিদেশিনী তার শুধু চলনটা দেখুক। বুঝুক, ভগবান যাকে দ্যান তার

চলার মধ্যেও কত পরাণ আকুল করা নাচ। খানিক গিয়ে চিন্তামণি মুখ ফিরিয়ে তাকায়, তার ঈষৎ হাসির চটুল ভাষা নিয়ে আর গৌরাঙ্গের মুখে সেরকম জবাবী হাসির বদলে সরল সহজ বিহ্বলতা দেখে একটু অবাক হয়ে বাড়ি ঢোকে। মানুষ যে কাঁচা থাকে, নিজে যে সে একদিন কাঁচা ছিল, কতকাল মনে পড়েনি চিন্তামণির! নীলকণ্ঠ আর পটলের বয়স পেতে অনেক দেরী গৌরাঙ্গের, আজ তক্ হয় তো সে কোন মেয়েছেলের গলা পর্যন্ত জড়িয়ে ধরেনি একটিবারের জন্য। মৃদু একটা ব্যাকুলতা মনে আসে চিন্তামণির, বিয়ের আগে গৌরের বয়সী সেই যে একজন তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছিল মৃদু বেদনার সঙ্গে, তার কথা মনে পড়ে এতকাল পরে। আর সেই সঙ্গে সস্তা মনে হয় নিজেকে, ফাঁকা মনে হয়, ফুরিয়ে যাওয়া চিকন গুড়ের চ্যাটালো হাঁড়ির মত।

সেদিন বিকালে দুর্গা মারা গেল। আকাশ ফুঁড়ে ফুডটা পাওয়া গেল, বার চারেক ক্ষীরের মত ঘন করে অনেকখানি ফুড খাইয়ে দেওয়া হল, তবু যে সে বাঁচল না তাতে কারো সন্দেহ রইল না স্বয়ং ভগবান তাকে মেরেছেন। খবর শুনে গৌর ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে দেখল, ফুডটা যোগাড় করে ছোট বৌকে যে খাওয়ানো হয়েছে এই সান্ত্বনায় রঘু নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে।

'ডাক্তর যা বলেছে সব করিছি। করিনি? অ গৌর করিনি?' এই বলে কপালটা দু'বার চাপড়ে দিয়ে পাঁচুর হাত থেকে কলকেটা নিয়ে তিনবার সাঁ সাঁ শব্দে জোরে জোরে টেনে সে কাশতে থাকে। দুদিন ধরে দুর্গার জন্য তার দুর্ভাবনার বাড়াবাড়িতে গৌরের বড় ভয় হয়েছিল! বৌটার ভালমন্দ কিছু হলে রঘু সে আঘাত সহজে সামলাতে পারবে না, হয়তো ভেঙে পড়বে অনেকদিনের জন্য, যতদিন না ভগবান শোকটা সইয়ে দেন। ভাবতেও কত যে আলোড়ন উঠে মনটা মোচড় খেয়েছে গৌরের। মানুষের মন যে কি অবাক জিনিষ ভেবে সে প্রায় রোমাঞ্চ অনুভব করেছে অনেকবার। মনের তলে ছোটবৌয়ের জন্য, দুর্গার জন্য, রঘু যে এমন পাগল এতগুলি বছর রঘুর সঙ্গে মিশেও কে তা ভাবতে পেরেছিল? রঘুর সুখদুঃখ চিরদিন তার মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে বলেই না গৌরের বুকেও সহানুভূতির বান ডেকেছিল দুর্গার জন্য। অথচ কি সহজ আর স্বাভাবিক শোক হয়েছে দ্যাখো রঘুর! তার গত দুদিনের উদ্ভট ব্যবহার বাদ দিলে যেমনটি হওয়া উচিত ছিল ঠিক তেমনি।

শোকে উন্মত্ত প্রায় রঘুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে শোকার্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে সাধারণ চলনসই দুঃখ বোধ করতে গৌর খানিকক্ষণ নারাজ হয়ে থাকে। গরুটা পর্যন্ত দুয়ে রেখে আসেনি ভেবে তার একটু রাগও হয়। ছেলেমানুষী করে করেই সে ঠকেছে চিরকাল। দুধটা চট করে বাবুর বাড়ি পেঁাছে দিয়ে আর দেখা হলে চিন্তামণিকে দুর্গার মরণের খপরটা জানিয়ে এখানে এসে অনায়াসেই সে আটকা পড়তে পারত। কি এসে যেত আধঘণ্টা একঘণ্টা দেরীতে, দুর্গা যখন মরেই গেছে আর রঘু যখন দিশেহারা হয়ে যায়নি সে মরণে।

ঘরে কাঁপা কাঁপা সুরে মেয়েরা গান করে যায় মড়াকান্নার, পাড়ার আত্মীয় বন্ধু বাঁশ কেটে আনে মাচা বাঁধার জন্য। রঘু এদিক গিয়ে ওদিক গিয়ে ধীর শান্তভাবে ছটফট ক'রে বেড়ায়, কখনো একটু দাঁড়ায় অথবা উবু হয়ে বসে, খানিক শূন্যে তাকিয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে আর দু'এক মুহূর্তের জন্য চামড়া কুঁচকে-কুঁচকে মুখখানা তার বিকৃত হয়ে যায়। দুটো কলকে অনেকের হাতে হাতে ঘুরছে। রঘু মাঝে মাঝে তামাক টানে আর কাশে। সাঁ-সাঁ করে বে-কায়দায় টানে বলেই কাশে, নইলে এমন কড়া তামাক ভূ-ভারতে নেই যে রঘুকে কাশাবে, চিটায় মিঠা দা-কাটা তামাকের তো কথাই নেই।

'ধর, গোর।'

গলাটা ভারি রঘুর। ভিজে ঢাকের মত ভারি!

এইসব মিলেমিশে কখন যে গোরের হৃদয়ে যথোচিত বেদনা এনে দেয়! সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলে তার হৃদয়ের সেই বেদনাবোধে কি সব কারণে কয়েকবার খিচ ধরে ধরে তার কান্না পায়। দুঃখ তার বৈরাগ্য হয়ে দু'চোখ দিয়ে গলে গলে পড়তে থাকে টস টস করে। জীবন-যৌবন ঘর-দুয়ার গরু-বাছুর ক্ষেতের ফসল সব মিছে, এ জগতে কেউ কারো নয়। বৌ কিসের, মেয়েমানুষ কি, সব মায়া, সব ফাঁকি!

'দুধ লিতে এইছে দাদা।'

গোরের কচি বোন আন্না তাকে ডাকতে এসেছে। খানিক মূঢ়ের মত বসে থেকে গোর নীরবে উঠে দাঁড়াল।

'যাসনি গোর। অ গোর, যাসনি মাইরি।'

'এখুনি এসবো'খন—এক দণ্ডে।'

রঘুর সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে গোর বেরিয়ে যায়। রঘুর জন্য তার আর চিন্তা ছিল না। ওর কিছু হবে না।

দুধ নিতে এসেছিল চিন্তামণি। তাকে দেখে গোরের একবার মনেও হল না যে নীলকণ্ঠের চাকর-বাকর কুলি মজুর থাকতে চিন্তামণি কেন দুধ নিতে এসেছে। মনটা তার এতখানি বিগড়ে গিয়েছিল।

ছেলেকে দেখেই গোরের মা ব্যগ্রকণ্ঠে জিগ্যেস করল, 'বার করেছে? নিয়ে গেছে?'

গোর বলল, 'না।'

রঘুর বাড়ি গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে হাহুতাশ করার জন্য গোরের মা উতলা হয়েছিল, ছেলের জবাবটা শোনামাত্র সে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

'ফের যাস্ তো ঘরে কুলুপ দিয়ে যাস্।'

ঘরে একটা কুলুপ আছে, তাতে চাবি ঘোরে না। কুলুপ দেবার উপায় থাকলে গোরের মা কি আর এতক্ষণ ঘর আগলে বসে থাকে।

চিন্তামণির সাবান-কাচা সাদা কাপড় একাদশীর চাঁদের আলোর রঙ ফিরিয়ে দিয়েছে গোরের একরত্তি উঠোনে। তার পায়ের কাছে পেঁপে গাছের ছায়ার ডগাটাকেও ঝাঁকড়া চুলো দৈত্যের মাথা বলে কল্পনা করা যায়! মানুষ-মরা সন্ধ্যার আলো ছায়া দিয়ে পৌরাণিক রহস্য চারিদিকে ঘনিয়ে আনা পুরাণঘেষা কল্পনারই কাজ।

'বৌ বুঝি হোথা?'

'বৌ? কার বৌ?'

'ওমা! বৌ নেই?' আঁচলের তল থেকে হাত বার করে গালে দিয়ে চিন্তামণি অবাক হয়ে যায়।—'পালাই বাবা তবে।'

'দুধ লিয়ে যাও।'

গৌরাঙ্গ বিরক্ত হয়েছে বুঝে চিন্তামণির একটু রাগ হয়। এতটা বাড়াবাড়ি তার ভাল লাগে না। প্রথমে সে ভেবেছিল রঘুর বৌ গোরের বোনটোন কেউ হবে, তারপর পটলের কাছে শুনেছে সে ওর জন্যে মানুষ কি মরতে পারে না সংসারে? গাঁয়ের কেউ মরলেই যদি এমনি ধারা করতে হয়; টেঁকাই যে ভার হবে মানুষের।

দুধের পাত্র হাতে নিয়ে চিন্তামণি নালিশের সুরে বলল, 'একলাটি কি করে যাব ভাবছি।'

'কি করে এলে?'

'এখন এইছি ?' সন্দে না লাগতে এসে ঠায় বসে রইছি তোমার জন্যে।'

বাছুর ছেড়ে দিয়ে গৌর চিন্তামণির অনেকখানি তফাৎ দিয়ে গিয়ে দাওয়ায় উঠল। সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাধ জাগলেও কেমন যেন সাহস হল না। চিন্তামণি একটু পিছিয়ে গেলে সে মরমে মরে যাবে। তার ফাঁকা বাড়ির উঠোনে তাকে সামনে দাঁড়াতে দেখে চিন্তামণি পিছিয়ে গেলে তার যে লজ্জা আর অপমান হবে তার বড়ো লজ্জা আর অপমান জীবনে যেন তার জোটেনি, জুটবে বলেও মনে হ'ল না।

'সড়ক ধরে যাওগে না, যদি ইদিক পানে ডর লাগে ? রাত হয়েছে কত, সড়কে লোক চলছে, সাথী পাবে'খন'।

'ডর তো সেখানে গো, কেমন সাথী জুটবে তা কি জানি ? তোমাদের দেশের মানুষ কেমন তোমরাই জানো ভালো, আমি হলাম ভিন্ দেশের লোক।'

একাই ফিরবে ভেবেছিল চিন্তামণি, আগে তার ভয় ছিল কম। ভয়ের কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে এতক্ষণে ভয়টা তার সত্যই বেড়ে গেল। এদিকে মেঠো পথের নির্জনতা আর ওদিকে বাঁধা সড়কের বিদেশী অজানা পুরুষের কথা ভেবে গা তার ছমছম করতে লাগল। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে এল দাওয়ার কাছে। মিনতি জানিয়ে বলল যে গৌর তকে পেঁছে দিয়ে আসুক! ঘরে কুলুপ না দিলে কিছু হবে না, কতক্ষণ আর লাগবে তাকে এগিয়ে দিয়ে গৌরের ফিরে আসতে? এসেই বোকাম করেছে চিন্তামণি—ঘাট সে মানছে গৌরের কাছে।

'শোন বলি কেন এলাম।'

বিদেশ বিভুঁয়ে একা পড়ে গিয়ে কি যে কষ্ট চিন্তামণির! এসে থেকে সে সমান একটা মানুষ পায়নি, চাষী-গেরস্থ ঘরের মানুষ, এক ধাঁচের মানুষ, যে মন খুলে দুটো কথা কয়ে বাঁচবে। বাবুর বাড়ি মানুষ আছে ঢের কিন্তু সবাই তারা ভিন্ন জাতের আলাপ কয়ে সুখ নেই। ঝি আর মজুর মাগীদের সাথে কি তার বনে, সে ছিল চিরটা কাল ঘরের মেয়ে, ঘরের বৌ আর ঘরের রাঁঢ়ী! ওই যে কথায় বলে জলের মাছের ডাঙ্গায় ওঠা, সেই দশা হয়েছে চিন্তামণির। তাই না সে এসেছিল দুধ নেবার ছুতোয় গৌরাঙ্গের মা বোন মাগের সাথে দু'দণ্ড কথা কইতে।

'পেঁছে দেবে না মোকে ?'

'দেব না বলিছি ?'

মেঠো পথে সাপের ভয়। চিন্তামণিকে সঙ্গে নিয়ে গৌর সড়কের দিকে এগিয়ে গেল। অপরিচয়ের সব ব্যবধান তাদের তখন ঘুচে গেছে। বাবুর বাড়ির দাসী বলে চিন্তামণিকে একটু পর মনে হয়েছিল গৌরাঙ্গের, কিভাবে তাকে নিতে হবে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। ওরা কোন জাতের মেয়েমানুষ আর কেমন ওদের হালচাল তা কে জানে! নইলে চিন্তামণির সঙ্গে কথা কইতে কি গৌরাঙ্গের ভাবতে হত, না কোন ব্যবহার উচিত হবে ঠাহর করতে তার ফাঁপর লাগত এতক্ষণ? চাষীর মেয়ের মন না জানুক, মনের গড়ন চাষী জানে। মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে বুলিও চাষীদের এক,—কথার ও ভাষার মনের গণ্ডী সম। এইটুকু পথ যেতে যেতে তাই দু'জনের ব্যগ্রতাহীন অনায়াসে কথোপকথনে অনেক কথার আদান প্রদান হয়ে গেল—পরস্পরের নানা বৃত্তান্ত। হরেনমি রাইস মিলের সামনে যখন তারা পেঁছল, চিন্তামণি তার চোখের কথা বলছে। গত বছর চোখের অসুখ করেছিল বলে ক'দিন থেকে মাঝে মাঝে বাঁ চোখটা একটু কটকট করায় ভাবনা হয়েছে চিন্তামণির।

'চোখে কম দ্যাখো ?'

'না গো, কম কেন দেখব? দুপুরবেলা চোখটা কেমন টাটায়। যা ধুলো বাবা তোমাদের দেশে!'

আজ সকালেও তার দেশ সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধ মন্তব্য গৌরের পছন্দ হত না, হয়তো কলহের সুরে পাল্টা জবাব দিয়ে বলত যে তোমার দেশে ধুলো নেই? এখন কথাটার সায় দিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে বলল, 'পদ্মমধু দিও দিকিন চোখে একটু। ও বড় ভাল ওষুধ।'

সেখান থেকে মেঠো পথেই গৌর সোজা রঘুর বাড়ি গিয়ে হাজির হল। মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে হৈ চৈ করে দুর্গাকে পোড়াতে গেল বালিময় শুকনো নদীর বুকে। কানাই বংশী আর হরিধনের জন্য একটা দেশী মদের বোতল রঘুকে কিনতে হয়েছিল, গৌরও একটু চেখে দেখল। ভাল করে গেঁজে ওঠেনি এরকম অল্প নেশালো তাড়ি সে দু'এক ঢোক খেয়েছে মাঝে মধ্যে, মদ কোনদিন ছোঁয়নি।

খিদির পাড়া, ২৪ পরগণা
৪ঠা ফাল্গুণ

বৈন চিন্তামণি তোমায় কি লিখিব আমার লিখিবার মুখ নাই। আমি কেন জীবন্ত আছি আমার মরণ হয় না ভগবানকে দিবারাত্র জানাইতেছি। কি সর্বনাশ হইয়াছে তুমি কাঁদাকাটা করিবা বলিয়া জানাইতে বিলম্ব করিলাম। ইহার পর আর বাঁচিবার সাধ নাই কিন্তু পোড়া কপালে মরণ নাই আমি কেন মরিব একচক্ষু ভগবান আমাকে কেন লইবে। চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিয়াছে জানিবা। ইহার সব বিত্তান্ত ভাবিলে আমার মাথা ঘুরায় আমি দিবারাত্র মরণ কামনা করি। কাকী থাকিতে দিবে না বলিয়াছে লিখিয়াছিল ইহাতে কেমন করিয়া জানিব কাকী চাঁপাবালাকে মেয়া শুদ্ধু খেদাইয়া দিয়াছে যে তাগো খাওয়া জুটে না হৈমী এবং তাহার মাকে কেমন করিয়া রাখিবে। ইহা কোথার কথা ভাবিয়াছিল তাই টাকা পাঠাই নাই। আমি কেমন করিয়া জানিব টাকাই বা কোথায় পাইব। গলায় দড়ি দিবে জানাইলে চুরি ডাকাতি করিয়া পাঠাইতাম কিন্তু হতভাগী জানাইল না। নবিন টাকা পাঠায় নাই। তাহার দোষ কি নুনা জলে বানের সর্বনাশ হইয়াছে সে কাজ করিয়া টাকা পায় নাই এবং তাহার কি দুর্দশা সে কলে কুলির কাজ করিতে গিয়াছে। চাঁপাবালা কয়দিন খাইতে পায় নাই হৈমীকে লইয়া কোথায় পড়িয়া থাকিয়াছে এজন্য আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছে। গজেন মুক্তারের বাড়ীতে উঠিয়া গলায় দড়ি দিয়াছে তাহা হৈমীর জন্য। গজেন মুক্তারের মহুরির সাথে হৈমী কোথায় চলিয়া গিয়ছে এই কলঙ্কে বুক ফাটিয়া চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিয়াছে। সব গজেন মুক্তারের কারসাজি বলিয়া শুনিতেছি জানিবা। বিন্দী পাড়ার বিপীন হৈমীর জামায়ের বড় ভাই সে গিয়া শুনিয়া আসিয়া বলিয়াছে। সব লোকে আমার মুখে থু থু দিতেছে আমি কেন জীবন্ত আছি। গজেন মুক্তার টাকার কুমীর হইয়া এমন কাজ করিল। মুহুরীকে দিয়া হৈমীকে পলাইয়া লইয়া গেল। গজেন মুক্তার থানায় গিয়া মুহুরির নামে থানা পুলিশ করিয়াছে। বিপিন বলিল ইহা তাহার কারসাজি বজ্জাতি করিয়া করিয়াছে যে লোকে বলিবে যে নির্দুষী: মুহুরীকে তুমি চিনবা সে চাঁপাবালার পিসাতো ভাসুরের ছেলে শরৎ। চাঁপাবালার শ্বশুরবাড়ি থাকিবার কালে হৈমীর কাছে আসিয়া হৈমীকে কত আদর করিত। কাকী তাড়াইয়া দিলে সেই নাকি চাঁপাকে গজেন মুক্তারের বাড়ি ঠাঁই দিয়াছিল। শরৎ এমন ভালোমানুষ আর অল্পবয়সে তাহার কেন এমন সাহস হইবে। আমি এই হুঁশে আছি আমার মরণ

নাই। চাঁপাবালা গলায় দাঁড় দিল হৈমী কলঙ্ক করিল আমি কি করিব। শুধু বুক চাপড়াইয়া মরিব। আমার খাওয়া জোটেনা। কয়টা টাকা পাঠাইতে লিখিলাম তুমি পাঠাইলে না। কয়মাস বেতন পাইয়াছ তথাপি ইহা কিরূপ। তোমাকে কতকাল খাওয়াছি ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি মধুবনী গিয়া সুখে আছ। আমি না খাইয়া মরিব। পত্রপাঠ কয়টা টাকা পাঠাইবা।

'দিদি'

তিন

চোখ মেলে চাইলেই শরৎকালের শোভা নজরে পড়ে, সে শোভার রঙ ভারি সবুজ। লাল ধুলোর কথা তুলে গৌরের এদেশকে নিন্দা করার ছুতো চিন্তামণির বর্ষায় ভেসে গিয়েছিল, এখন যদি বা এখানে ওখানে শুকনো কাদার ডেলা গুঁড়িয়ে ধুলো উড়ছে দু'এক ঝলক, সেটা কিছু নয়। কুয়াশার দিনগুলি পেরিয়ে গিয়ে আবার ভালো করে ধুলো উড়তে সুরু হবে, ফাগুনের দক্ষিণায় হবে তার ওড়নের চরম বড়াই।

মাঠের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর থেকে অলস অকর্মণ্য জীবন যাপন করতে করতে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছে। ধান কাটার সময় এলো এই যা ভরসা। শীষের প্রৌঢ়তা প্রাপ্তির দিন থেকে সবাই নজর পেতে আছে ধানে রঙ ধরবে কবে। খাটুনি আসবে কঠিন, ঝর ঝর ঘাম ঝরবে, গায়ে হাতে ব্যথা হবে, কোমর বাঁকা হয়ে যাবে তাদের বয়স যাদের একটু বেশী হয়েছে। কাজে সুখ নেই, বড় কষ্ট কাজে। নতুন আলু, সোনালী আখ, শাক-সব্জী, বুট মটর সব কিছু কাটা তোলা ধোয়া চাঁছা বয়ে নেওয়া যোগান দেওয়ার কাজে। কাজ সুরু করার খানিক পরেই মনে হবে কি যেন নেই শরীরে,—একটুখানি ছিল কিন্তু ফুরিয়ে গেছে। তারপর থেকে বাকী দিনের কাজ শুধু সহ্য করার ধৈর্য দিয়ে, বাঁধা গতিতে বাঁধা নিয়মে কলের মত। গৌর যে এমন ব্রহ্মচারী যুবক, খেটে যাতে সুখ মেলে তা তারও যেন শরীর মনে মোটে ছটাকখানেক আছে! অকেজো দিনগুলির চাপে কাতর হয়ে পড়ে বলেই তারা কাজের কষ্ট চায়। কতকাল যে চাষীর বেকার কাটাতে হয়!

সবাই নয়। নিজের ও ছেলেমেয়ে মা-বোনের সরু হাড় আর অলম্ব মাংসপেশী কোনমতে যারা টিকিয়ে রাখতে পারে তারা অন্য কাজ খোঁজে না। মজুর হতে খাঁটি চাষী মরমে মরে যায়। ভূমিহীন চাষী পর্যন্ত। পরের জমিতে মজুরগিরিই সে করে, তবু চাষ আবাদ ছাড়া আর কিছু করে না সে চাষী।

সদয়, পচা, ছোলেমান, মৈনুদ্দিন কয়েক টুকরো জমি চষে বটে, কিন্তু তাঁতও বোনে বলে তারা তাঁতি। আকবর, যদু, নাসের, সুখলাল ফসল বোনা আর ফসল তোলার সময় ছাড়া বাড়ি থাকে না, কয়লা তুলতে যায় ঝরিয়ার খনিতে, ওরা তাই কুলি। গাঁওতলীতে ঘরের লাগাও সাত কাঠা জমি আছে জগুর, তাতে জগু বরাবর লাঙ্গল দিয়ে ফসল ফলিয়ে আসছে নিজে, কিন্তু মুচীকে চাষী বলবে সেজন্য, সরোজ বাঁড়ুয্যে মুদীখানা খুলেও যখন মুদী নন।

সরোজ বাঁড়ুয্যের দোকানের সামনের রাস্তার ধারে জগু জুতো সেলাই করতে বসে, প্রায় আপিস টাইম থেকে সন্ধ্যাতক! থানা আদালত জেলখানার বাঁকা আর সাফসুরৎ

এলাকা থেকে মধুবনীর অভিজাততম পথটি আভিজাত্য হারাতে হারাতে গোটা কয়েক মোড় ঘুরে এইখানে বাঁক নিয়ে বাজারের ঘিঞ্জি অঞ্চলে ঢুকেছে, নোংরা আর সংকীর্ণ হয়ে। বাঁকেরই আন্তরিক কোণটার ওপর বাঁড়ুয্যের মুদীখানা— দোকানও বড়, বিক্রীও খুব। জগুর রোজগার মন্দ হয় না, মাসে অন্ততঃ পাঁচ সাতদিন শ'টাকা পুরে যায়। গড়পড়তা তিনদিনে একদিন জগু দু'নম্বর দেশী গিলে বাড়ি ফেরে—সন্ধ্যা পার করে রওনা হয়। অন্যদিন দিনের আলো খানিকটা বজায় থাকতেই উঠে পড়ে। বড় পথটা ধরেই তাকে আসা যাওয়া করতে হয়—থানা আদালত আর জেলখানার সরকারী পাড়া পেরিয়ে। জেলটা তার চেনা, ভেতরে দু'দফায় কিছুকাল বাস করেছে।

বাজার আর আদালতের মাঝে পথের দুধারে বাড়িগুলি বেশীর ভাগ ভাঙ্গাচোরা ইঁট বার করা সেকেলে ধাঁচের পুরানো অথবা বদরঙা সেকেলে ধাঁচের নতুন। কয়েকটি বাড়ির চেহারা শুধু খানিক আধুনিক। সকালে ও বিকালে এসব বাড়ির কোন কোনটা থেকে ডাক আসে ঃ

'এই মুচি! মুচি!'

সকালে আসবার সময় জগু ডাক শোনে, দরে বনলে জুতো সারায়। বিকালে হাজার গলা ফাটানো শুনে সে ফিরে তাকায় না।

মরা খিদেয় আর শ্রান্তিতে মন তখন তার উদাস হয়ে আছে।

পুজো উপলক্ষ্যে পটল একজোড়া জুতো কিনেছিল। দু'দিন পায়ে দিতেই জুতোর একটা পেরেক ডান পায়ে বিঁধতে লাগল। জুতোটা হাতে নিয়ে সে দ্যাখে, খানিকটা সোল কি করে যেন কোথায় খসে পড়ে গেছে। সস্তায় জুতো কেনার প্রায়শ্চিত্ত যে দু'দিনের মধ্যে সুরু হয় পটলের সে অভিজ্ঞতা ছিল না। জুতোটা সারাতে দিয়ে বাঁড়ুয্যের দোকানের ময়লা বেঞ্চে বসে খানিকক্ষণ সে একটানা সেই জুয়াচোরদের গাল দিতে লাগল, মানুষকে যারা নতুন • বলে পুরানো খারাপ জুতো দিয়ে ঠকায়। তার সমালোচনার মোট কথার মানে হল, ওরা ছাড়া পৃথিবীতে আর বুঝি জুয়াচোর নেই।

জগু তার কামানো চিবুক নামিয়ে ঝাঁটার মত আছাঁটা মোটা গোঁফের নীচে হাসি ফোটায়, উল্‌ লু···। বলে, 'ফরমাস দিয়ে জুতো বানান, সাতটি বছর ছুঁতে হবে না জুতো।'

'তুই বানাবি?'

'লয় কেনে? বানাই নি কো ফরমাসি জুতো। ঠাকুরমশায় জানে—কুকুরে যদি না লিয়ে যেতো—'

দু' আড়াই বছরের কথা, জুতোর শোকটা সরোজ বাঁড়ুয্যের কেটে গেছে, মুখে তাই তার কথাটা স্মরণ করে হাসি ফুটতে পায়। শক্ত লোহার মত একজোড়া জুতো তাকে জগু বানিয়ে দিয়েছিল, কয়েক মিনিট পরবার পরেই বাঁড়ুয্যের পায়ে আর ফোস্কা পড়ার স্থান থাকে নি। জুতো জোড়া খুলে রাখা হয়েছিল চৌকীর নীচে। প্রথম দিনটা পরিষ্কার বোঝা যায় নি, পরের দিন টের পাওয়া গিয়েছিলো যে ঘরে বেশ একটু গন্ধ হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়তে তিন চার দিনে ঘর ম ম করতে লাগল সেই জুতোর গন্ধে! বাইরে বার করে রাখা মাত্র রাস্তার এক নেড়ে কুত্তা এসে একপাটি মুখে করে পালিয়ে গেল।

'যদি না নিয়ে যেত—'

'কাঁচা ছাগলের চামড়া দিয়ে ব্যাটা জুতো বানিয়েছিল। না যায় পায়ে দেয়া, না যায় গন্ধের চোটে ঘরে টেঁকা। মুচির কাছে জুতো কিনো না, খপরদার!'

জগ্ন নিজেই কথাটায় সায় দিয়ে বলল, 'ম্নই ম্নচি লই। জাত ম্নচি লই।'

পটল বলল, 'ছাগলের চামড়া? গর্নর চামড়া বল্নন।'

বাঁড়্নয্যে বলল, 'গর্নর চামড়া? খেপেছ! গর্নর চামড়ার জ্নতো পরব আমি!'

চামড়ার মধ্যেও সে যেন টের পায় কোনটা গর্ন কোনটা ছাগল! সবার ব্নদ্ধি ভোঁতা তাই রক্ষা, নইলে হয়ত কেউ জিজ্ঞেস করে বসত, গর্নর চামড়া আর ছাগলের চামড়ার জ্নতোর তফাৎ জানবেন কি করে?

এমনি সময় গোর আর রহিমকে আসতে দেখা গেল কোর্টের দিক থেকে। গোরের হাতে একটি দলিল।

গোরের ম্নখে বজ্জাতির ম্নচকি হাসি। দেখলেই সন্দেহ হয় কোন একটা দাঁও মেরেছে। গরীব চাষী মজ্নরের ম্নখে এই দাঁও মারা হাসি ভাষার চেয়ে প্রাঞ্জল। দেখেই কাঁচ্চাখানেক এক ঝলক বাড়তি রক্ত পটলের ব্নকে উঠে গিয়েছিল। চিন্তামণির জন্য তার মাথা ব্যথা নেই। তব্ন চিন্তামণি তো মেয়েমান্নষ আর বেদখলী মাল! গোরের সঙ্গে কিছ্নদিন থেকে চেনা হয়েছে চিন্তামণির। গোর কি তবে চিন্তামণির—?

'আদ্নলির ভাঙা জমি পেলাম খানিক পটোলবাব্ন।'

'কিনলি নাকি?'

পটল যে বেঞ্চে বসেছিল পটলের সম্মান বজায় থাকে এতখানি তফাতে সেই বেঞ্চের জাঁকিয়ে বসে গোর বলল, 'কিনতি যাব কেনে? ভাগ পেলাম। চাঁদকাকা নিয়েছে জমি, আমি ভাগ পেলাম—ফসল শ্নদ্ধ্ন। কাকা দাপড়াবে, কাটা ছাগলের মত দাপড়াবে।'

রহিমকে সে খাতির করে বিড়ি এগিয়ে দেয়। জিভ দিয়ে গোড়ার দাঁতের ফাঁক থেকে শাকের কণা খসিয়ে এনে উত্তেজনায় সামনের দাঁত দিয়ে কুট্‌কুট্ কাটতে থাকে। রহিমের কাছ থেকে তার চাঁদকাকা আদ্নলির ভাঙ্গা জমি কিনেছে,—তারা ভিন্ন হবার আগে। গোর তা জানত না! এবার মাঠে প্রথম লাঙ্গল দেবার সময় খবরটা শ্ননে মনটা তার গিয়েছিল বিগড়ে, জমি জায়গা কিনবে বলে চাঁদকাকা তবে তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে, তাকে ঠকিয়েছে! তলে তলে সংসার থেকে সরিয়ে টাকা জমিয়েছে কাকা তাকে ভিন্ন করে দিয়ে নিজে একদিন এইসব করবে বলে! পরশ্নতক্ কাঁটাটা খচ খচ করছে গোরের মনে। পরশ্ন আদ্নলিতে রহিমের সঙ্গে তার দেখা। নেহাৎ বিপাকে পড়ে রহিম তার জমিট্নকু বেচে দিয়েছিল, আজ সেই জমিভরা জমকালো ফসল দেখে তার মনটা আঁকুপাঁকু করছে, গাটা জ্বালা করছে, চোখে জল আসছে। তার হাতে কোনবার তো এমন ফসল হয়নি। বেইমান মাটি!

রহিম। বিশ র্নপিয়ায় দ্ন'আনা ফসল দিবে না? না দিলে। খোদা আছেন। না—দিলে।

গোর। আমায় বলছ?

রহিম। সরম নাই, আঁ? জমিটা দিয়ে দিলাম তোমাদের আধা দামে, পয়লা বছরের দ্ন' আনা ফসল বিশ র্নপিয়া দিবে না! বহ্নত আচ্ছা। দেখে লিব।

আদ্নলিতে চাঁদকাকা কার জমি কিনেছে কিছ্নই গোরের জানা ছিল না।

রহিমের সঙ্গে খানিক আলাপ করেই জানা গেল কাকাটা তার কত বড় ঠক্! ভিন্ন হবার আগে জমি কিনেছে তার কাকা তাকে ভাগ দেয়নি!

চাঁদকাকার নামে গোর তাই নালিশ ঠ্নকে দিয়েছে। নিজের ভাগটা পেলেই সে রহিমকে মাগনা দ্ন'আনা ফসল দেবে।

সরোজ বাঁড়ুয্যের হাসির শব্দে গৌর চমকে গেল। বাঁড়ুয্যে হাসে খুব কম, যখন হাসে হাসিটা তার বাজীর বোমার মত দমাস করে ফেটে চীনা পটকার মত পটাস পটাস ফেটে চলে। দেহের অনুপাতে গলার নালিটা তার একটু সরু!

'গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল!'

'আজ্ঞে না' মুক্তারবাবু বললে—

বাঁড়ুয্যের হঠাৎ ফাটা হাসি আচমকাই থেমে যায়! ধমকের সুরে সে বলল, 'মোক্তারবাবুরা অমন বলে! আরে মুখ্যু, তোর কাকীর নামে যদি জমি কিনে থাকে? যদি বলে ভিন্ন হবার পর কিনেছে? যদি বলে সম্পত্তি সব তার, তোকে শুধু মানুষ করেছে খাইয়ে পরিয়ে?

মুখখানা শুকনো করে গৌর দলিলের নকল দেখায়—তাকে ভিন্ন করার প্রায় আড়াই মাস আগে চাঁদকাকা নিজের নামে জমি কিনেছে। রহিম আদালতে হলপ করে বলবে যে জমি কেনার সময় গৌর আর চাঁদ এক বাড়িতে একান্নে ছিল। গৌরীর বাপ এ-বাড়িতে বাস করেছে স্বর্গে যাওয়া পর্যন্ত, চাঁদ কি করে বললে যে দয়া করে আশ্রয় দিয়ে তাকে মানুষ করেছে? না, কোনদিকে ফাঁক নেই। সনৎ মোক্তার তাকে সব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে।

এবার পটলের সঙ্গে চোখ চাওয়া চাওয়ি করে বাঁড়ুয্যে মুচকে হাসল। রহিমের ঠোঁটের কোণেও যেন হাসি দেখা গেল একটু।

'তোমার কাকা কি বলে গৌর?' পটল জিজ্ঞেস করল।

'কাকার কাছে যাইনি!' গৌর দু'বার ঢোঁক গিলল, 'যেমন ঠকিয়েছে আমায় তেমনি জব্দ হোক।'

'ও, ঝাল ঝাড়ছে?' পটল বলল। এতক্ষণে ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়েছে।

'জব্দ তুমিও হবে। বরং বেশী করে হবে। চাঁদার সঙ্গে লড়তে পারবে তুমি? তার চেয়ে আপোষে ভাগটা আদায় করে নিতে পারলে কাকা তোমার জব্দ হত গৌর।'

বাঁড়ুয্যে এক খদ্দেরের জন্য আড়াই সের চিনি ওজন করতে করতে বলল।

'আমিও তাই বলছিলাম বাবু। ও মোটে কান দিলে না।'—রহিম সাগ্রহে সায় দিল।

একেবারে নালিশ ঠুকে কাকাকে শাস্তি দেবার কথা সনৎ মোক্তারের পাল্লায় পড়ার আগে গৌরও ভাবেনি। উত্তেজিত, উল্লসিত অভিভূত করে সনৎ মোক্তার কি যেন করে দিল তাকে, কি যেন করিয়ে নিল তাকে দিয়ে! এখানে এই পাকা লোক দুটির ঠাণ্ডা সাহচর্যে জুড়িয়ে গিয়ে ক্রমেই মনটা দমে যাচ্ছে, একটু বোকা মনে হচ্ছে নিজেকে। সনৎ মোক্তারের হাতে গিয়ে যে কি করে পড়ল তাও সে এখন ঠিকমত ঠাহর করে উঠতে পারছে না। তার জন্যই যেন ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করেছিল সনৎ মোক্তার, ছোঁ মেরে তাকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল চোখের পলকে। খানিক আগে পর্যন্ত তার মনে হয়েছিল ওর মত ক্ষমতাবান দরদী ও শুভার্থী যেন জগতে আর নেই, এই একটি লোকের হাতে সব ভার, সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুমোতে পারে!

নালিশ করার আগে রঘুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করার কথা বা মাকে একবার জানাবার কথা পর্যন্ত তার মনে পড়তে দিল না সনৎ মোক্তার!

বাঁড়ুয্যে বলল, 'ফসল চাঁদাকাকা বেচে দিয়েছে জানিস? নীলকণ্ঠ বাবুকে বেচে দিয়েছে, তোদের ওই হরেনাম নীলকণ্ঠবাবুকে।'

ভয়ের জেদি সাহসে গৌর বলল, 'বেচে দিক্‌না। টাকার ভাগ দেবে।' সাহসটা

আরো বেশী প্রকট করে দেখাতে চেয়ে রহিমকে বলল, 'দু' আনার দামটা তোমায় দেব, তুমি ভেবো না।'

আর দুজন খদ্দের এসেছে সওদা নিতে—ছেঁড়া ময়লা শাড়ী পরা শীর্ণ রুক্ষ একটি বৃদ্ধা আর পথে কুড়ানো তালি দেওয়া হাফপ্যাণ্ট পরা সাত আট বছরের একটি ছেলে। বাঁড়ুয্যে এদের সওদা দেয় না, বাম প্রান্তে নীচু কাঠের বাক্সে বসে এদের কম কম জিনিস দেয় বদ্যি। বদ্যির চারিপাশে মুদীখানার সব জিনিসই সাজানো আছে, তবে ছোট ছোট পাত্রে কম পরিমাণে। বাঁড়ুয্যের এই আড়তের মত বড় মুদী দোকানের কোণে ওখানে যেন আরেকটি ছোটখাট ভিন্ন দোকান করা হয়েছে। বদ্যির বাটখারাটিও ছোট—অনেকের অধিকাংশ সওদা দিতে সেটা ব্যবহারও হয় না। এক পয়সা আধ পয়সার জিনিস কি কেউ ওজন করে বেচে!

বুড়ি বলে, 'এক ছিদাম নুন, এক ছিদাম ধনে, আধপয়সা—'

বদ্যি বলে, 'ছিদাম নেই গো! আধপয়সার কম নেই।'

ক'মাস আগে ছিদামে বেচা ছিল। মোট এক পয়সা পুরলেই হত। কেবল বাঁড়ুয্যের দোকানে নয়, অনেক দোকানেই। দু'পক্ষেরই এতে লাভ। শাকপাতা শুঁকো বা মেছোবাজার কসাইখানার কুড়ানো পটকা হাড় কাঁটা, নাড়ীভুড়ী কান যাকে রাঁধতে হবে দু'পয়সার তেল মশলায়, সে একটু একটু সব জিনিস কিনতে পারে। ছিদামের জিনিস বেচে দাম ওঠে দু'সেরের। রমেশবাবু একবার এক ছিদামের নুন আর তিনি ছিদামের চিনি কিনে কিনে পয়সা পুরিয়ে সওদা করিয়ে ছিলেন মোট চার আনার—এক আনার নুন আর তিন আনার চিনি। তারপর একসঙ্গে পয়সা দিয়ে ওজন করে কিনিয়ে ছিলেন এক আনার নুন আর তিন আনার চিনি। ষোলবারে কেনা সমান পয়সার নুন একবারে কেনা নুনের হল অর্ধেক, চিনি তারও কম। ডগসন মাঠের এক সভায় রমেশবাবু তার অর্থনৈতিক পরীক্ষার কথাটা এমনভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে গোরের ধাঁধাঁ লেগে গিয়েছিল। তারপর ভেবে চিন্তে সে দেখেছে, এক-আধ পয়সার জিনিস-কিনলে দোকানী ঠকায়, তার এবং সকলের এই জানা কথাটাই রমেশবাবু একটু অন্যভাবে জটিল করে বলেছেন।

ছিদামের কারবার এখন আধ পরসায় উঠেছে! কারণ সবচেয়ে কমদামী জিনিসও ছিদামে যতটুকু দেওয়া হত, তার চেয়েও কম জিনিষ কোন কিছুর বিনিময়েও মানুষ মানুষকে দিতে পারে না।

বুড়ী বলল, 'তবে আদলার নুন আর আদলার হলুদ দাও।'

'আরেক পয়সার?'

'আর নয়।'

'পয়সা আছে?'

বুড়ী একটা আনী বাড়িয়ে দিল। বাকী তিন পয়সা তার কিসের বরাদ্দ কে জানে!'

বদ্যি মাথা নাড়ল।—'দু' পয়সার কম সওদা নেই।'

এতক্ষণে বুড়ী গেল চটে।—'নেই তো নেই। ভারি দুকান দিয়েছে।'

বুড়ী চলে যায় কিন্তু আধপয়সা করে আনা দু'আনার খদ্দের ক্রমে বাড়তে থাকে। বদ্যি ক্ষিপ্রহস্তে একটু মসলা, এক চামচ নুন, আধপলা তেল, কিছু চাল কিছু ডাল ইত্যাদি বেচতে থাকে। এত তাড়াতাড়ি এত জিনিস এত বিভিন্ন দামে সে বিক্রী করে। কিন্তু পয়সার হিসেবের জন্য তাকে ভাবতে হয় না, হিসাবে ভুলও হয় না একটা আধলার।

দেখে, চাঁদকাকাকে জব্দ করতে সনৎ মোক্তারকে, আদালত আর আদালতের লোককে দিতে যা খরচ করেছে তার জন্য বড়ই আপশোষ জাগে গৌরের। আত্মপ্রসাদের সঙ্গে জাগে সে গরীব চাষী, কিন্তু এদের মত গরীব নয়। এরা সব বাড়তি ফেলনা মানুষ। চাষীও নয়, কুলীও নয়।

দুধ দিতে গৌরকে আর নীলকণ্ঠের বাড়ি যেতে হয় না। দাম বাড়িয়ে দুবেলা সামনে দুইয়ে দুধ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ধর্ম সাক্ষ্য রেখে সকলেই নির্জলা খাঁটি দুধ কষ্ট করে বাড়ি পর্যন্ত পেঁছে দেয়, কিন্তু অপর পক্ষ কষ্ট করে এসে সামনে দুইয়ে দুধ নিতে চাইলে দর একটু বাড়াতে হয়। ধর্মের দুধের চেয়ে সামনে দোয়া দুধ বোধ হয় খাঁটি হয় বেশী।

কাজটা আরম্ভ করেছে চিন্তামণি। ভোর যখন শুধু আবছা আঁধার তখন সে পাত্র হাতে ঘুমন্ত পুরী থেকে বেরিয়ে যায়, গৌরের সজাগ বাড়িতে পেঁছায় আবছা আলোর ভোরে। বিকালে একটু বেলা থাকতেই আসে, সঙ্গে আনে গিন্নিমার কোলের ছেলেটিকে। ঠেলাগাড়ি চেপে বেড়াবার বয়স হয়েছে ছেলেটার।

ভোরে গৌর বাড়ি থাকে। বিকালে কোনদিন থাকে, কোনদিন থাকে না। ভোরে দুধ নিয়ে ফিরতে হয় তাড়াতাড়ি, বাবুদের চা হবে। বিকালে সময় থাকে, পাড়ার এবাড়ি ওবাড়ি একটু বেড়ায় চিন্তামণি। বিকালের দুধটা তার সামনে দোয়া হয় কদাচিৎ।

তাতে অবশ্য আসে যায় না কিছু। দুধে জল একটু তার সামনেই মেশানো হয়। সে সাগ্রহে অনুমতি দিয়েছে।

গৌরের মা খ্যান খ্যান করত, 'একপো কমিয়েছে টাকায়, একপো! পোষায় বাছা দুধ জুগিয়ে এ আক্রার বাজারে?'

গৌর সায় দেয়।–'ভাল মানুষ পেয়েছে কিনা, সবাই মোকে ঠকায়।'

একদিন দু'দিন চিন্তা করে চিন্তামণির মাথায় বুদ্ধি খেলেছে।

'জল মেশাও না কেন? যাতে পোষায় এমনি করে জল মিশিয়ে দাও!'

'তুমি গিয়ে লাগাবে না?'

'ইস্ সাতপুরুষের কুটুম কিনা ওনারা, লাগাতে যাব! মেশাও তুমি জল।'

তার আপনপনার ঘটা দেখে গৌরের মা কুরিয়ে কুরিয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। ছেলে তার পুরুষ তো বটে, বিয়ে যদ্দিন না করছে মেয়েলোক একটা ঘাটে তো ঘাটুক, সস্তা আর বাজে মেয়েলোক। কিন্তু পীরিত জানা সোহাগবেতর পুরুষচাটা এ মাগীর খপ্পরে পড়লে ছেলে তো তার বিগড়ে যাবে!

দুধ নিতে এসে চিন্তামণি বেড়াতে গেছে রঘুর বাড়ি, কাকার নামে নালিশ করার বিগড়ানো মন নিয়ে নিজের বাড়ি না ঢুকে গৌরও এল রঘুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। বাবুর ছেলেকে চিন্তামণি কোলে নিয়েছে, রঘুর মেয়ে তার ছোট ভাইবোন দুটিকে ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে মহোল্লাসে উঠানময় হাওয়া খাইয়ে বেড়াচ্ছে।

চিন্তামণির কাঁধে বাবুর ছেলে কঁকিয়ে কাঁদছে, তার খেয়ালও নেই। তার নিজের চোখে জল, ধরা গলায় সে বিরজাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছে। রঘু বসেছে একটু তফাতে, তাকেও শোনাচ্ছে। দুঃখের কাহিনী কোন জাতের কোন মেয়ে কোনদিন বলে শেষ করে উঠতে পারে নি। গৌর এসে পড়ায় চিন্তামণিকে থামতে হল, আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে হল।

গৌর তাকিয়ে থাকে। চিন্তামণির দরদ আছে তার জানা ছিল, কিন্তু সে যে কাঁদতে পারে আজ এইমাত্র যেন তার সে বিশ্বাস জন্মালো একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে।

'কাঁদছ কেন গো ?'

'কপালে আছে কাঁদছি।'

এ জবাবে রহস্যের মুখ ঝামটা আছে। সেটা বেমানান হওয়ায় গৌর অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কাল পর্যন্ত চিন্তামণি তাকে তার সমস্ত দুঃখের কথাই বলছে। এর মধ্যে এমন কি ঘটল তার কপালে যে বলতে গিয়ে তাকে কাঁদতে হচ্ছে ?

'সবতো জান, আর জিগ্গেস করছ কি ?'

তখন গৌর বুঝতে পারে যে নতুন কিছু হয় নি, তাকে যেসব কাহিনী বলবার সময় সে শুধু অদৃষ্টকে শেপেছিল আর ভগবানকে বলছিল মুখপোড়া, বিরজা মেয়েমানুষ বলে তাকে সেইসব কাহিনী বলার সময় সে আজ কেঁদেছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে গৌর রঘুকে বলল, 'তোমার কাছে এলাম রঘুদা। একটা কাণ্ড করেছি।

'বটে ?' রঘু বলল।

'ওমা, সিকি !' বলল চিন্তামণি।

গৌর তার নালিশ করার কথা বলে, মেয়েরা উৎসুক হয়ে কাছে সরে আসে। বাবুর ছেলের কান্না থামাতে একটু আদর করেই চিন্তামণি বিরক্ত হয়ে তাকে একটা চড় বসিয়ে দেয়। তাতে কান্না আরও বেড়ে গেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে কোন উপায় না দেখে সে করে কি, কাপড়ের তলে খোকার মাথাটা ঢুকিয়ে স্তনের বোঁটা তার মুখে গুঁজে দেয়। বিরজা মুচকে একটু হাসে।

রঘু যেন আনমনে শুনে যায়, না করে কোন আওয়াজ, না দেখায় কোনরকম ঔৎসুক্য। একটু কেমন ঝিমিয়ে গেছে রঘু আজকাল, কেমন একটু নিরাসক্ত ভাব দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। চলতি কিছুর গতি একটু কম হওয়ার মত জীবন্ত থাকার হাজার হাজার রকমসকমগুলি আগের চেয়ে একটু শ্লথ হয়েছে—একটুখানি। দুর্গার শোক এখনো তার থাকা সম্ভব নয়, নেইও। শোক কারও চব্বিশ ঘণ্টা থাকে না। একটা মানুষ আছে আছে হঠাৎ একটু ডুকরে কাঁদল নয় বুক চাপড়ে হায় হায় করল নয় মুখে মেঘ নামিয়ে আনল—সেটা হল শোক। রঘুর একটু বদল হয়েছে, যার বাড়া কমা নেই, যাতে অসাম্য নেই। বরাবর সে এমনি হলে লোকে জানত যে লোকটাই এমনি। কিন্তু দুর্গার মারা যাবার পর সে বদলেছে বলে সময় সময় মানুষ সেটা টের পাচ্ছে।

সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে বল। গৌর বলে যায়, এদিকে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে আকাশে। সন্ধ্যার আগে বাবুর ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে মুস্কিল হবে চিন্তামণির, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না শুনে সে উঠেই বা যায় কি করে ? উসখুস করতে করতে সে একসময় উঠে দাঁড়ায়।

'শোন, তোমায় বলতে ভুলে গিইছি। বাবু তোমায় ডেকেছেন !'

'সকালে যাব।'

'উঁহু, আজকেই যেও। এখখুনি নয়, খানিক পরেই যেও কথাটথা বলে। যেও কিন্তু, হ্যাঁ: ভারি দরকার—বাবু বললেন, চিন্তামণি, গৌরকে সন্ধের পর আসতে বোলো, ভারি দরকার।'

চিন্তামণি চলে যাবার পর তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে গৌর রঘুকে প্রশ্ন করল, 'কি করবে বল দিকি এবার ?'

'কি করবে ? তাই তো বটে। মুস্কিল হল।'

ভেবেচিন্তে পরামর্শ একটা রঘু দিল, গৌরের সেটা পছন্দ হল না। মামলা যখন ঠুকেই দিয়েছে তখন মামলা চলুক, একি একটা পরামর্শ হল! মামলা করার, সাক্ষী দেওয়ার অভ্যাস রঘুর, সে কি বুঝবে প্রথম উত্তেজনা কেটে যাবার পর ফাঁদে পড়া জন্তুর মত এখন কি হচ্ছে গৌরের মধ্যে!

কিন্তু না, দুর্গা রঘুকে কাবু করে বোকা বানিয়ে দেয়নি।

'আপোষ? তুই বড় বোকা গৌর। মামলা হলে কি আপোষ হয় না? আগে আপোষের চেষ্টা যখন করিসনি, এখন চুপ করে থাক। সমন পেলে চাঁদ মাইতি নিজে আসবে নয়তো তোকে ডেকে পাঠাবে। তখন আপোষের কথা হবে।'

বিরজা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'ওকে তুমি কি শেখাবে? সাঁতরাদের ও সাতঘাটের জল খাইয়েছে।'

প্রশংসায় খুশী হওয়ায় রঘুর মুখে হাসি ফুটল। হাত বাড়িয়ে বিরজার বুক থেকে সে মেয়েটাকে টেনে নিল নিজের কোলে। মেয়েটা মাই টানছিল বিরজার, মুখ থেকে মাইটা ছেড়ে যাবার সময় একটা শব্দ হল অদ্ভুত, যুবক-যুবতীর সাবেগ ও স্বাধীন চুম্বনের মত।

গৌর বিদায় নিচ্ছে, রঘু শুধোল, ফসল বেচে দিয়েছে তোর কাকা? ব্যাপার ঠিক ঠাহর পাচ্ছি না রঘু। অনেকে বেচেছে। কত লোক দর দিচ্ছে বেটার জন্যে ফুসলাচ্ছে, সবুর সইছে না। মাঠের মাল বেচাকেনা হয়, এত তাগিদ কিসের এবার?'

'ঠিক। আমিও তাই ভাবছি। মিল কটার তাগিদ বেশী—আর ওই ভুবন সা আর বাঁড়ুয্যের। বেচবে নাকি?

'নাঃ। ধরে রাখছি।'

হরেরাম রাইস মিলের পুবের প্রাচীর ঘেঁষে বড় রাস্তা থেকে নীলকণ্ঠের বাড়ির সদর পর্যন্ত কাঁকড়ের সড়ক। আধখানা চাঁদের মৃদু আলোয় এই সড়ক ধরে গৌর চলেছে, প্রাচীরের থামে বসানো ছোট দুয়ারটির ওপাশ থেকে চিন্তামণি চাপা গলায় ডাকল, 'এই। এই! গৌর? এই!'

গৌর ভাবছিল তার সঙ্গে নীলকণ্ঠের হঠাৎ কি জরুরী দরকার পড়ল, ডাক শুনে সে চমকে উঠে ভড়কে গেল একেবারে। আরও ভড়কে গেল চিন্তামণি যখন দুয়ারটা ভেতর থেকে বন্ধ করে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল মিল অঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের নির্জনতায়, টিনের শেডটার গোপন আড়ালে। চমক লাগার দপদপানি কমবার আগেই বুকটা তার টিপ টিপ করতে লাগল অসম্ভব কল্পনায়।

মিলের কাজ একরকম বন্ধ হয়ে আছে আজকাল, যদিও নতুন ধান নিয়ে জোর কাজ আরম্ভ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। পাকা উঠানে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে ধানের মড়াই-এর চালার মত ধানঢাকা মটকাগুলি—শেডের ভেতর থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় রহস্যের মত কিছু একটা নিশ্চয় চাপা দেয়া আছে ওগুলির তলে, তলার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এসে উঠানময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে চোখের ধাঁধাঁর মত।

কি সে না শুনেছে আর কি সে না জানে নারীপুরুষের ব্যাপার? তবু ক্ষণে ক্ষণে হৃদকম্প হতে থাকে গৌরাঙ্গের। মানুষ কি বলে আর কি করে মেয়েমানুষকে নিয়ে এ অবস্থায়? চিন্তামণি যদি হেসে ফেলে! চিন্তামণি যদি নীলকণ্ঠের সেই বড় মেয়ে তরুবালার মত গালে টোকা মেরে বলে, 'আ মরণ।'

'রাগ করছ? বাবুর নাম করে ডেকে এনেছি বলে?'

'উঁহুঃ। না।'

'ওদের সামনে কি করে বলি আমার সাথে দেখা কোরো? তাইতো বাবুর নাম করলাম।'

'বাবু ডাকেনি?'

'না গো না। আমি ডেকেছি, সব শুনব বলে। না শুনে যে চলে এলাম। তবু কত কথা শোনালে মাগী একটু দেরীর জন্যে, দাসী বৈ তো নই! তারপর কি হল? ওই যে বলছিলে ফসল বিক্রী করে দিয়েছে না কি করেছে তোমার কাকা?'

গৌর একটু থাতস্ত হয়। একটু জ্বালাও বোধ করে কেমন এক ধরনের।

'এই জন্য ডেকেছে? সকালে শুনলে হ'ত না?'

'রাতে ঘুম হত ভেবেছ আমার?'

শুনে দেহমন যেন চোখের পলকে উল্লসিত হয়ে সাম্যলাভ করায় গৌরের ভয়ভাবনা উপে গেল। উঁচু টানে বাঁধা তারের মত টনটন রণরণ করতে লাগল সে।

সহজ সরল ভাবে সে বলে গেল সব কথা। রঘুকে যতটা বলেছিল তার চেয়ে বেশী, অন্য ভাষায়, অন্য কায়দায়। তার ভয় ভাবনা আপশোষের কথা সে বর্ণনায় আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে গেল।

চিন্তামণি জোর দিয়ে বলল, 'না মামলা কোরো না। কাল গিয়ে বাতিল করে দিও নালিশ। আপোষে যদি পাও তো পাবে নইলে কাজ নেই।'

'টাকাটা মাঠে মারা যাবে নালিশের।'

'বোকার মত কাজ করলে ওমনি যায়।'

অতি বেশী অন্তরঙ্গ আপনজনের মত চিন্তামণির এই বকুনি শুনে গৌরের সাহস যেন বেড়ে গেল। শেডে ভেজা ধানের পচাটে গন্ধ অনুভব করতে করতে ফাটল ধরা চোকলা ওঠা সিমেণ্টের রং মেঝেতে ঘষড়ে গিয়ে সে চিন্তামণির গা ঘেঁষল। চিন্তামণি নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আ মরণ!'

চার

ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। ঋণের বোঝায় চাষী কাতর। ফসল ঘরে তোলা তক্ কটা দিনও কিছুতে কাটাতে না পেরে এখনো বাজু পৈছা ঘটি বাটি বাঁধা পড়ছে। পেট ভরে কজনেই বা কবে তারা খায়, এখন তাতেও টানাটানি পড়েছে ফসল তোলার আগে, সিকি থেকে অর্ধেক নেমে গেছে সেই অ্যাত্‌টুকু খোরাক। মাটির কুঁড়েয় কজনেই বা কবে তারা হাসে, এটুকু তবু যে ভোঁতাটে খুসী খুসী দেখাত তাদের মুখ সে মুখে ঘনিয়েছে প্রাণহানিকর বিমর্ষতা। মাঠে মাঠে এমন যে ভাল ফসল হয়েছে এবার, তা দেখেও না জুড়াচ্ছে তাদের চোখ, না থামছে দেহমনের পোষমানা শান্তশিষ্ট নালিশ-ভোলা জ্বালা। এমন দিনে চাষী হয়েও গৌরের মনে কিনা থৈ থৈ করছে মহুয়ার মিঠে নেশার মত সুখের মাতলামি! একটা মা নিয়ে তার সংসার, সে সংসার ঘাড়ে চেপেছে এই সেদিন, সে কি জানবে চাষ করে বাঁচার মত মজা! চাঁদ বেশ কৃপণ আর হিসেবী। তার সাথে থাকার সময় বরং গৌর খানিক খানিক স্বাদ পেয়েছে গরীব

চাষীর খাওয়া পরার কষ্টের। শুধু ওই কষ্ট, মনের কিছু নয়। অনেকের দায়িক হয়ে অবিরাম ঠেঙ্গানো খাওয়া ভীরু মন ভাবনার ভারে যেভাবে ধুঁকতে থাকে সেটা সে এখনো শিখতে পারেনি। কম করে শ'খানেক ওরকম আধমরা মানুষের সঙ্গে তার জানা শোনা আছে, তবু। চাঁদ কাকার কাছে ভাগ পেয়ে সবে ভিন্ন হয়ে মা আর গাইটা পুষে সে একরকম সুখেই আছে এখনো। গাইটিও আবার রোজগেরে। অঢেল প্রেমে গা ঢেলে দিতে তার বাধা কই ?

চিন্তা বলে যায়, 'আজ যেও।'

বলে যায় সাঁঝের আগে। তারপর সন্ধ্যা নামে তো রাত আর বাড়ে না গৌরের। মন যত চনমন করে অধীরতায়, গা যেন ততই থমথম করে ধৈর্য ধরার জ্বরে। সেদিনের চাঁদ ক্ষয়ে গেছে অনেকখানি, মাঝ রাত্রি পেরিয়ে তবে ওঠে। মাঝ রাত্রির অনেক আগেই গৌর তারার আলোয় পথ দেখে রওনা দেয় হরের্নাম রাইস্ মিলের দিকে।

মা বলে, 'কুথা যাস বাবা ? রেতে ?'

'রঘুর সাথে সলা আছে।'

দরজার হুড়কো খোলা তক্ মা চুপ মেরে থাকে। তারপর আচমকা বলে, 'বিয়া করলে হয়। রেত বিরেতে বাইরে যাওয়া ভাল না বাবা।' বাইরে যেতে নিষেধ করা নয়, সমালোচনা নয়। একটু বিবেচনা করতে বলা, ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে দেখতে বলা যে একটা বিয়ে করলেই যখন চলে, এত হাঙ্গামায় কাজ কি।

'ও সব কিছু না। কপাট দে।'

তা বটে। বিয়ে একটা করলে হয়। চিন্তামণির সঙ্গে ভাব হবার পর থেকে কথাটা বেশী করে গৌরের মনে জাগছে, মার মনে পাড়িয়ে দেবার কোন দরকার ছিল না। বিয়ে করার মানেও যেন তার কাছে বদলে গেছে, একটা অস্পষ্ট অভাব বোধের চাপ পরিণত হয়েছে নতুন পীরিতের মন-কেমন করা ঔৎসুক্যে। চিন্তামণির জন্য সারাদিন তার ছটফট করার ভাগ কাঁচ বয়সের বাড়ন্ত বৌদের পাওনা হচ্ছে, তাকে তারা টানছে চিন্তামণিকে নিজেদের টান ধার দিয়ে। নইলে চালকলের দিকে রওনা দিয়েও যার জন্য রওনা দেওয়া সেই একজনকে ছাড়া তার কেন মনে পড়বে ভোলার মেয়ে কালী, রঘুর ভগ্নী পাঁচী, কেষ্ট শম্ভু পরাণ রসিকদের নতুন বৌ আর দাঁতপুরে তার মামাবাড়ির পাড়ায় যে একটা মোট সোটা মেয়ে থাকে, এদের কথা ? এসব ভাল লাগে না গৌরের। ভেসে যাওয়ার সুখে মসগুল হয়ে তীরে ওঠার কথা ভাবে, একি জলের বানে ভাসা নাকি তার, অ্যাঁ ?

চাষীর গাঁ কখন ঘুমিয়েছে, তার কত পরে বাবুর বাড়ি সংসারের পাট শেষ হয়ে ঘরে ঘরে আলো নিভেছে আন্দাজ করে সে পথে বেরিয়েছে। হয়তো এই একটানা দীর্ঘ প্রতীক্ষার উত্তেজনা শেষ হওয়ার সময় এসেছে বলেই মনটা তার বিমর্ষ হয়ে ঝিমিয়ে যায়। এ প্রণয় তার জুড়িয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়ে একটা তামাসায় দাঁড়িয়ে যাবে ? সে তামাসা কি আজ গৌরের সয় !

ঘেরা শেডের নীচে পচা ধানের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, কিন্তু তারপর চিন্তামণি এলে তার একরাশি চুলে পচা নারকেল তেলের গন্ধ তাকে বাঁচায়। চোখের পলকে সে টের পায় চিন্তামণিকে ছাড়া সে তো বাঁচবে না !

কিছু রাত হাতে রেখে চিন্তামণি বলে, 'ইবারে এসো। এট্টু না ঘুমোলি বাঁচবোনি।'

শক্ত মেঝেতে শুধু একটা চাদর বিছানো বালিশহীন শয্যা ছেড়ে গৌর উঠতে চায় না। বেজার হয়ে বলে, 'কাল ঘুমিয়ো, দুকুর বেলা।'

চিন্তামণির হাসির সঙ্গে হাই উঠে।—'কাজ নেই কো? মোর কাছে বাচ্চা দুটো গছিয়ে গিন্নিমা দুপুরে ঘুমোয়। মজার কথা বলি শোন, ঘুমুলে গিন্নিমার নাক ডাকে! মাইরি বলছি—তোমায় ছুঁয়ে। মেয়ে মানুসের নাক ডাকা। হাসি যা পায়।' আবার হাই তুলে চিন্তামণি বলে, 'দিন ভোর খাটতে হয়। ঘুম পাচ্ছে, সত্যি। দুটি ভাতের জন্য দেহপাত করে খাটছি। ভাতার তো নেই দুটি ভাত যোগাবে পোড়া পেটের জন্যে।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে এই কথাটা দু' একবার বলে চিন্তামণি, তার কেউ নেই বলে পেটের জ্বালায় দাসীগিরি করে জীবন গেল। শুনে মন খারাপ হয়ে যায় গৌরের। দরদ আর সহানুভূতিতে বুকটা তার ব্যথা করে।

'সত্যি পরের খাওয়া বড় কষ্ট।'

এত রাতে আদর দিয়ে তার এই কষ্ট দূর করার চেষ্টা চিন্তামণি কাঠ হয়ে গ্রহণ করে। তারপর সে এলিয়ে যায়। তারও পরে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ে।

গৌর প্রথমে শুধোয়, 'ঘুমোলে নাকি?' তারপর চোখের জলের সন্ধান পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে তার কান্না কেন, কিসের জন্য। শেষে গভীর দুঃখে আর অভিমানে কাতর হয়ে উঠে বসে বিড়ি ধরায়, নিজের হাঁটু মোড়া পা দুটিকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে থাকে।

তখন এক কাণ্ড ঘটে অদ্ভুত। তার পায়ের পাতায় হাত রেখে সলজ্জ খেদের সুরে চিন্তামণি বলে, 'মাপ করো। শুনছ? মাপ চাইছি তোমার ঠেঁয়ে। আর কিছু চাইনে আমি, সত্যি চাইনে। যদি চাইতো খানকি বোলো মোকে।'

ঘুমে যে ঝিমিয়ে গিয়েছিলে এমন হঠাৎ তার আবেগের তীব্রতায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে গৌরের। পা ছেড়ে মাথাটা তার বুকে চেপে ধরে এত জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে চিন্তামণি যে এক মুহূর্তে যুবক গৌর নিজের কাছে শিশু হয়ে যায়।

ভোরের আগে একটু শীত শীত ভাব দেখা দিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে শান্ত অবসন্ন মন দিয়ে গৌর বুঝবার চেষ্টা করে, তার কাছে কি চায় না চিন্তামণি, কি চাইবে না কখনো। এর মধ্যে কোনদিন সে কি কিছু চেয়েছিল তার কাছে, কোন আবদার জানিয়েছিল, সে কানে তোলেনি? সে কি পয়সা কড়ি চায় তায় কাছে! কাপড় গয়না? মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞেস করতেও খেয়াল হয়নি বলে গৌরের আপশোষের সীমা থাকে না।

পরদিন দুধ নিতে এলে দেখা গেল চিন্তামণির মুখচোখ ভারি দেখাচ্ছে। একনজর তাকিয়েই গৌরের মনে হল সে ভয়ানক রাগ করেছে, মুখ ভার করে আছে দুরন্ত অভিমানে। তাদের ভালোবাসার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কিছু যে ঘটতে পারে জগতে গৌরের আজকাল সেটা খেয়াল হতে চায় না।

'না না। রাগ করিনি! গিন্নিমাকে ফাঁকি দিয়ে দু'কুরে খুব একচোট ঘুমিয়ে নিয়েছি। তুমি বললে না কাল?'

'জ্বরজারি হয়নি তো?'

'এট্টু হয়েছে।' দুধ দোয়া বন্ধ করে গৌর ফিরে তাকাতে সে বাঁকা চোখে চেয়ে একটু হেসে বলল, পীরিতের জ্বর গো। তোমায় দেখে সারল।'

গাই বাছুরের গা চাটে, দুধের পাত্রে চোঁক-চাঁক শব্দ হয়, মৃদুস্বরে তারা আলাপ করে। গৌরের প্রশ্নের জবাবে চিন্তামণি গভীর এক রহস্য সৃষ্টি করে জানায় যে কই, সে তো কিছু চায়নি গৌরের কাছে। কিছু যদি তার চাওয়ার থাকেই, গৌর নিজে

থেকে তাকে তা দেবে, সে চাইতে যাবে কেন! তবে কিনা একটু ভয় করছে চিন্তামণির, এভাবে কতদিন তাদের দেখাশোনা চলবে? রোজ তার ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ দেখে গিন্নিমা বোধহয় সন্দেহ করছে মনে হয়। এমন করে তাকাচ্ছে গিন্নিমা আজ কদিন থেকে, এমন সব কথা বলছে তাকে বকবার সময়!

'আজ আবার পটলবাবু মস্ত একটা তালা সেঁটে দিয়েছে মোদের ঘরটার কপাটে।'

'জেনেছে নাকি পটলবাবু?'

গৌরের বিবর্ণ মুখ দেখে আর তার সচকিত প্রশ্ন শুনে চিন্তামণি খানিক তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, শেষে নীচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে নিয়ে বলল, নতুন ধান আসবে বলে তালা দিতে পারে।'

'জানাজানি হলে মুস্কিল।'

'কি মুস্কিল। কার মুস্কিল! তোমার নাকি?'

গৌর চুপ করে থাকায় সে আবার বলল, 'তুমি তো পুরুষ।'

পাকা লোক হলে গৌর মনে করিয়ে দিতে পারত যে সে বিদেশিনী শুধু দেশে ফিরে গেলেই যার আসান হয় সে আর এমন কি মুস্কিল। অত হিসাব গৌর এখনো শেখেনি।

তোমার আমার দু'জনেরি মুস্কিল। তুমি কি করবে?'

কি আর করব, দেশে চলে যাব।'

তা বটে। চিন্তামণির সে উপায় আছে। আটকা পড়বে সে, তার তো পালাবার পথ নেই। অবেলার ঘুমে চিন্তামণির ভারি মুখ যে অন্ধকার হয়ে এসেছে গৌরের আর তা নজরে পড়ল না। নিজের মুখ তার শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। তার গোপন প্রেমের অনেকগুলি বিপজ্জনক পরিণতির সম্ভাবনা আচমকা হুড়মুড় করে তার বুদ্ধি-বিবেচনার ঘাড়ে এসে পড়ায় সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। ঘুরে ফিরে একটা কথাই কেবল তার মনে পড়তে থাকে যে এ শুধু তার চাষীর সমাজে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের জানাজানির ব্যাপার নয়, এ ব্যাপারে যোগ আছে বাবুদের। চিন্তামণিকে মধুবনীতে নিয়ে এসেছে পটলবাবু। বাবুরা যদি তাকে শাস্তি দেয়, যদি বিপদে ফেলে, যদি জেল খাটায়, জানাজানি হয়ে গেলে! চাষীর সমাজে তার শুধু একটু দুর্নাম হবে, কিন্তু বাবুরা রাগী, মানী, নিষ্ঠুর মানুষ, প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের গায়ের জ্বালা কি জুড়োবে সহজে!

পরদিন সকালে গৌর মামাবাড়ি রওনা হয়ে গেল। তার মনে হল, কদিন একটু দূরে গিয়ে থেকে আসাই ভাল। রঘুকে বলে গেল, মাকে যেন দেখাশুনা করে, গরু দুইয়ে দুধ যেন যোগান দেয় বাবুর বাড়ি।

'মামাবাড়ি হঠাৎ কেনে?'

'বড়মামা একটা বাছুর দেবে বলেছিল, নিয়ে আসি।'

গৌরের মামাবাড়ি দাঁতপুরে। বাসে প্রায় আধঘণ্টার পর পৃথ্বীপুর সেখান থেকে দু'কোশ দূরে সিউঁতি নদী পেরিয়ে দাঁতপুর। নদী খুব চওড়া কিন্তু মোটেই গভীর নয়, দুটি তীর নদীর তল থেকে মানুষ সমান উঁচু হবে কি হবে না। বর্ষার ক'মাস নদীতে লাল জলের স্রোত বয়ে যায়, ময়লা থিতিয়ে জল পরিষ্কার হতে না হতে জল যায় ফুরিয়ে। এক তীর ঘেঁষে ছোট একটি ঝরণার মত স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে যায়, নদীর বিস্তীর্ণ সমতল বুকে বালি চিকচিক করে।

বাস আজকাল বন্ধ। ট্রেনে চেপে গৌর সিউঁতি নদীর পুল পেরিয়ে সানকানি

ষ্টেশনে নামল। এদিকে শালবন বেশী, ছোট ষ্টেশনটির লাল কাঁকড় বিছানো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে কিছুদূর গিয়েই রেললাইনের দুপাশে শালবন সুরু হয়েছে।

ষ্টেশনের বাইরে একদল সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো কোথায় কুলির কাজ করতে যাবে, রান্নাখাওয়ার জন্য এবেলা এইখানে ঠাই গেড়েছে। কালো মাটির হাঁড়িতে ভাত চেপেছে, কুপিয়ে কাটা হচ্ছে মোটা একটা ঢ্যামনা সাপ। রান্নার এই মাটির হাঁড়িকুড়ি সব সঙ্গে নিয়েই এরা রওনা দেবে, পুরুষ ও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা টানবে শালপাতা পাকানো মোটা বিড়ি, মায়ের কাপড় দিয়ে শিশুদের বেঁধে নেবে পিঠে। সাঁওতালদের চাষের কাজ সামান্য, বনের ধারে বা বনের মধ্যে জঙ্গল সাফ করে যেমন তেমন খানিক ফসল ফলায়, তাও সকলে নয়। তবু এদের বড় ভাল লাগে গৌরের। জন্ম থেকে এদের চলাফেরা চালচলন দেখে এলেও ওরা তার মনে একটা রহস্যের সৃষ্টি করে রেখেছে, একটি ছিপছিপে কিন্তু পরিপুষ্ট সাঁওতালী মেয়েকে বিয়ে করবার অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা আজও তার মনে উঁকি দিয়ে যায়। অমন মেয়ে চাষীর ঘরে জন্মায় না।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক বেলায় মামাবাড়ির কাছাকাছি পেঁছে গৌরের কানে এক একক একটি শানাই-এর সুর। শানাই শুনলে গৌরের মন কেমন উদাস হয়ে যায়, মনে হয় বাকী জীবনটা ঠাকুরদেবতাকে ভক্তি করে, গুরুজনকে মান্য করে আর পরস্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে কেবল ভাল কাজ করে কাটিয়ে দেওয়া চাই। সে মরলে সবাই যেন বলে, লোকটা বড় ভাল ছিল গো।

গৌরের মামাদের মস্ত সংসার, পায়ের ধুলো নেওয়া দেওয়ার পালা সাঙ্গ করে গৌর শুধোল, 'শানাই বাজে কার বাড়ি গো?'

'ফুনুর মেয়্যার বিয়া—লক্ষ্মীর। সেই যে মুটকী মেয়েটা ঘন ঘন আসত মোদের বাড়ি—'

'বটে!'

বর আজ এসে গিয়েছে, কাল সন্ধ্যাবেলা বিয়ে। আজ কুটুম ভোজন কাল স্বজাতি ভোজন হবে। কুনুর নাকি ভয়ানক ফাঁকি দেবার মতলব আছে শোনা যাচ্ছে, দই চিঁড়ে আর মোটে একটা করে মিষ্টি দিয়ে সেরে দেবে। জোড়া মিষ্টি না দিলে গোলমাল হবে শোনা যাচ্ছে। কুটুমদের দেবে জোড়া মিষ্টি আর মোয়া, স্বজাতির বেলা শুধু একটা মিষ্টি—সইবে কেন স্বজাতিরা?

'তোর বিয়েতে নুচি খাবো গৌর।'

বড়মামী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল। বড়মামী জীবনে আঁতুরে গিয়েছে সতেরবার, একটা বয়সে স্ত্রীলোকমাত্রেরই সন্তান ধারণের ক্ষমতা ফুরিয়ে যাবার ব্যবস্থা বিধাতার না থাকলে হয়তো আরও দু'চারবার যেত। সতরটি এলেও আটটি সন্তান অতি শৈশবে এবং দুটি অল্প বয়সে চলে গিয়েছে তাই রক্ষা। সাতটির মধ্যে তিনটি মেয়ে পরেরা ঘরে নিয়ে পুষছে, তাও রক্ষা। তাছাড়া, সবগুলি এসে পড়ায় আগেই বড় দুটি ছেলে পরপর বড় হয়ে পরপর রোজগার করতে শিখেছে। শেষ বিয়োনোর পর দু'বছর কেটে গেছে, বেঁচে আছে না জেনেই বড়মামী টিঁকে আছে ক্ষয়রোগিনীর মত জীর্ণ শীর্ণ শরীর নিয়ে। জ্বর হয় মরে না, কাসি হয় মরে না, হজম না হওয়ায় প্রায়ই কাপড় বিছানা নষ্ট করে আর নিজের মনে অনর্গল কথা বলে বেঁচে থাকে।

বড়মামা অদ্বৈতের বয়স ষাট হবে। চুল টুল পেকে সে বুড়ো হয়নি কিন্তু বৈষ্ণব হয়েছে।

তার অসাধারণ কৃষ্ণ ভক্তির কথা দাঁতপুর আর আশে পাশের গাঁয়ে ছড়িয়ে গেছে। কত লোক স্বচক্ষে দেখেছে কৃষ্ণলীলার যাত্রার গান ভেঙ্গে চুরে গাইতে দু'চোখে তার জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

এত লোকের মধ্যে সেই প্রথম উদাসীন আপনভোলা সুরে গোরের আসবার কারণ জিজ্ঞেস করল।

'বাছুর? বকনাটা? তোকে দিব কথা ছিল না কি বটে?'

'ছিল না? মা'কে নাহক্ বিশবার বলেছ দুধ ছাড়লে পাঠিয়ে দেবে, মাস দুয়েকের মধ্যে নয়তো খবর দেবে, আমি এসে নিয়ে যাব। ও বাছুর আমার মামা, দিতে হবে, চালাকি নয়, হুঁ।'

অদ্বৈত চোখ বুজে গদগদ হয়ে বলল, 'অ গোর, তোর ভাগ্যি ভাল বড় ভাল তোর ভাগ্যি।'

গোর সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিসে?'

'বাছুরটি প্রভু গরহণ করেছেন।'

অদ্বৈতের গুরুঠাকুর এসেছিলেন মাঝখানে, যাবার সময় পটল রঙের বাছুরটির গলার দড়ি স্বয়ং শ্রীহস্তে ধারণ করে নিয়ে গেছেন। বাছুরটি আগেই যখন গোরকে দেওয়া হয়েছিল, পুণ্যটা তারই হয়েছে সন্দেহ কি!

'জানিস গোর, অ বাবা জানিস? বলি শোন তোকে। শোন কি অবাক কাণ্ড। যাবার আগে বলা নেই কওয়া নেই প্রভু তোর কথা শুধোলেন। তখন টের পাইনি, আজ জানছি, তেনা জানতেন। কিরপা করলেন তোকে। ভক্তির লেশটুকুতো মনে তোর নাই কিনা তাই তোর বাছুরটি গরহণ করে তোকে কিরপা করলেন।'

গোরাঙ্গ থ' বনে থাকে, আপশোষ আর বিস্ময়ে। কুনুর মোটা সোটা মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে শুনে মনটা তার মস্ত একটা ক্ষতি বোধের চাবুক খেয়ে ছ্যাৎ করে উঠেছিল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ছিল ন্যায্য পাওনা ফসকে যাওয়ার ক্ষোভ। এ আরেকটা ক্ষতি, পাওনার ফাঁকি পড়ায় কিন্তু ভাল করে ক্ষুব্ধ সে হতে পারল না। তার বাছুরটি একজন বাগিয়ে নিয়েছে ভেবে সে রেগে উঠতে যায়, কিন্তু সেই একজনটি এমন আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী যে মামারা তাকে বাছুরটি দিয়েছে একথা না জেনেও জানতে পারেন বলে রাগ আর তার করা হয় না।

পুঁই ডাঁটার চচ্চরি আর কুচো চিংড়ির টক দিয়ে তিনটে কাঁচা লংকা চিবিয়ে সে ভাত খায়। কাঁসার ভাত শেষ করে একবার চেয়ে ছোট একমুঠো ভাত পেয়েও আবার সে ভাত চাইতে তার মেজ-সেজ দুই মামী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আর দুজনেই প্রায় এক সঙ্গে অনেক দুঃখের পোড়া একটু হাসি হেসে গোরকে আরও ভাত দেয়! ভাগ্নে এসেছে মামার বাড়ি, নিজেরা উপোস দিয়েও তার পেটটা ভরাতে হবে বৈ-কি মামীদের।

গোরের মামাদের অবস্থা চিরদিনই মন্দ, দুর্বৎসরে বড় কষ্টে দিন যায়। কিন্তু মানুষ তারা পরম শান্ত, সন্তুষ্ট এবং ধার্মিক, একান্নবর্তী আদর্শ চাষীর পরিবার। গোঁয়ার শুধু ছোট মামা রাধাচরণ। তার ঘরে মন নেই, চাষে মন নেই, গাঁয়ে মন নেই। বছরে দুতিন মাসের বেশী সে বাড়ি থাকে না। কোথায় যায়. কি করে স্পষ্ট করে কোনদিন সে কিছু বলে না, হঠাৎ একদিন কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি আসে, বাকী খাজনা বা ঋণ বা অন্যান্য আপদ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয় সংসারকে তখনকার মত, কিছুদিন পরে আবার উধাও হয়ে যায়।

'অদ্বৈত বলে, 'মজুরগিরি করে নির্ঘাৎ, কুলি ঘাটে। চেহারা দেখছ না মজুরের মত হচ্ছে দিনকে দিন ?'

কেউ বলে, 'মজুরগিরি করে টাকা আনবে ইস্ রে !'

অদ্বৈত বলে, 'ভারি টাকা। বিশ পঁচিশটার বেশী টাকা এনেছ কোনবার ?'

গৌরের এই ছোট মামাটির একখানি চিঠি এসেছে অদ্বৈতের নামে দিন তিনেক আগে, এখনো সেই চিঠি নিয়ে পাড়াশুদ্ধ মামার বাড়িটি সরগরম হয়ে আছে। কলকাতার কাশীপুর থেকে শতকোটি প্রণাম দিয়ে রাধাচরণ নিবেদন জানিয়েছে যে চার চারটে জোয়ান মদ্দ পুরুষের বাড়িতে বসে থাকার কি দরকার আছে বাড়ির ভাত ধ্বংস করে ? বড় আর মেজ ভায়ের বয়স বেশী—তারা ঘরে থেকে চাষ আবাদ দেখুক, তার, সেজভাই আর যোয়ান ভাইপোরা চলে যাক তার কাছে সেই কলকাতার কাশীপুরে, কাজ করে রোজগার করুক তার মত। সে কাজ জুটিয়ে দেবে।

গৌরের কৌতূহল জাগে. 'কি কাজ লেখেনি কো ?'

'লিখবার দরকার ? মজুরগিরি, কুলিগিরি কাজ, অবাক কি ! জানিস গৌর, পরভু বলেন, ওটা কংসের সম্বন্দির অবতার, আমার ওই ভাইটা। সংসারটা ওই ছারেখারে দেবে। বাপের কোন অভাব ছিল মোদের ? জমিজমা, গাইগরু, গাছপুকুর সব ছিল সে থাকার মত। ওটার ওম্মো থেকে অবস্থা পড়তে লাগলো মোদের।'

নাম জপের প্রক্রিয়ায় অদ্বৈতের ঠোঁট নড়তে থাকে।

'জবাব দাওনিকো ?'

'দিব। জবাব দিব।'

গৌরের যোয়ান যোয়ান মামাতো ভাই রাখাল, প্রসাদ, কানাই বংশীরা মুখ বাঁকায় আর হাসে, হাসে আর মুখ বাঁকায়। ওরা প্রায় সকলেই জোতদার ভূষণ নন্দীর মজুরি করে—জমিতে, চাষের কাজে।

কুনুর বাড়ি শানাই বাজায় চণ্ডী। সস্তা শানাই, খাওয়া আর দৈনিক চার আনা। শানাই বাজানো চণ্ডীর ব্যবসা নয়। বাড়ীতে একটা বাঁশী আছে, আশে পাশে গাঁয়ের কেউ ডাকলে বাজিয়ে আসে। পোঁ ধরারও কেউ তার সঙ্গে থাকে না। তবু তার সেই বেসুরা বেতালা শানাই গৌরকে উতলা করে দেয়। রাত্রে চাটায়ে শুয়ে শানাইয়ের সুর কানে না এলেও ব্যাকুলতা তার বেড়েই চলে। হাঙ্গামার ভয়ে গণ্ডগোলের প্রথম চোটটা এগিয়ে যাবার জন্যেই সে যে পালিয়ে এসেছে এ চিন্তাটিকে সারাদিন আমল দিতে অস্বীকার করেই নিজের কাছে সাফাই খাওয়ার প্রয়োজনকে সে এড়িয়ে গেছে, এখন এসব ভণ্ডামি তার ভাল লাগে না, কাজেও লাগে না।

চিন্তামণির দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। নীলকণ্ঠবাবু তাড়িয়ে দিলে সে হয়তো তার বাড়িতে আসবে তার খোঁজে, কিন্তু তাকে কিছু না জানিয়ে সে মামাবাড়ি চলে গিয়েছে শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বে। ভাববে, এমনিই হয়, গৌরের মত লোকের সঙ্গে পীরিত করলে এমনিই হয় শেষতক্।

মামাদের সঙ্গে সে দুপুরে কুনুর বাড়ির ফলার করতে গেল। বিয়ে আজ গোধূলি লগ্নে কিন্তু জাতভায়েরা অনুমোদন না করলে বিয়ে হতে পারবে না। দুপুরে সকলের ভোজনটা হবে অনুমোদন। প্রায় জন ত্রিশেক লোক হয়েছে, ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়ে। এদের মাতব্বর নবকান্ত মাইতি। তারই আশে পাশে এলোমেলো ভাবে বসে বয়স্কেরা জোড়ায় দু'জোড়ায় নানা কথা আলাপ করছে আর মাঝে মাঝে খিদেয় কাতর ছেলেমেয়ে-গুলির ওপর খিঁচিয়ে উঠে চড় চাপড় মারছে। কুনু দু'বার জোড় হাতে সকলকে

তাগিদ দিয়েছে কিন্তু কেউ উঠে গিয়ে খেতে বসেনি। খিদে পেয়েছে সকলেরই, খিদে নিয়েই সকলে নেমন্তন্ন রাখতে এসেছে, কিন্তু খাওয়া সম্বন্ধে সবাই যেন একান্ত উদাসীন!

কুনু আবার আসে, বলে, 'বেলা' যে অনেক হল! দয়া করে গা তুলতে আজ্ঞা হয় মাইতি মশয়।'

এবার নবকান্ত বলে, 'কুটুমদের একগণ্ডা মিষ্টি মিলছে কুনু?'

'একগণ্ডা?' কুনু কপালে চোখ তুলে জবাব দেয় 'একটার বেশী মিষ্টি দেবার খেমতা আছে যে দেব? একটা মিষ্টি দিইছি, নার্কলে—। আপনাদের জন্যে চন্দ্রপুরি আর মোয়া।'

'মোয়া?'

'মুড়কি নয়তো মোয়া, যার যা পছন্দ।'

'কটা মোয়া?'

কুনু একটু ভাবে। চকিতে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নেয়।

'দুটো মোয়া। মোয়ার বদলি পোয়া মুড়কি।'

তখন সকলে গাত্রোত্থান করে খেতে গেল। কুটুমদের সমান সম্মান আদায় করা হয়েছে, এখন আর ভোজন করতে অপমান নেই।

দাওয়ায় বসে খেতে খেতে লক্ষ্মী বার তিনেক গোরের নজরে পড়ল। কাঁচা হলুদ মাখিয়ে মাখিয়ে তার নিজের বাদামী রঙ মেয়েরা প্রায় লোপ করে দিয়েছে। কেমন শুদ্ধ আর পবিত্র দেখাচ্ছে মোটা মেয়েটাকে।

গোর তাকে না বলে আচমকা মামাবাড়ী চলে গিয়েছে শুনে প্রথমটা চিন্তামণি রাগে অভিমানে চারদিক অন্ধকার দেখেছিল, তারপর ভেতরে কেমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গিয়ে তার নিজেরই মনে হল সে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচে গেছে। এমন ভীষণভাবে কোন মানুষের কাছে ধরা পড়ার স্বভাব তার নয়। গোরকে নিয়ে নিজেকে একেবারে বেমালুম ভুলে যেতে বসেছিল, কি এমন মানুষটা গোর? চালচুলো ছাড়া কিইবা আছে ওর যে ওকে নিয়ে মেতে থাকলে তার সুখের সীমা থাকবে না? কি প্রত্যাশা আছে ওর কাছে?

অন্ততঃ ক'দিনের জন্য গোর দূরে চলে গেছে, দিনান্তে তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হবার সম্ভাবনাও এখন নেই, এটা খেয়াল করার সঙ্গে চিন্তামণি আজ প্রথম সচেতন হয়ে উঠল, মনটা তার কিভাবে গোরময় হয়ে উঠছিল দিন দিন। ঘুম ভেঙে সে ভাবতে আরম্ভ করত গোরের কথা, দেখা হলে কি বলবে, কি করবে, আর কি হবে এই কথাই ভাবত বিভোর হয়ে সারাটা দিন। বাড়ির গিন্নি আর তার মেয়ের কাছে এজন্য কতবার যে বকুনি খেয়েছে, যা হয়েছে তার জন্য চিন্তামণির কোন আপশোষ নেই। অপরূপ স্বপ্ন দেখার আনন্দেই বরং হৃদয় তার ভরাট হয়ে আছে। গোরের কথা সে এখনো ভাববে, গোরের জন্য যে মন কেমন করছে তাও মানবে, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি আর নয়। একটু সামলে নিতে হবে নিজেকে, চারিদিকে তাকাতে হবে। দু'একজন যে কামনা করছে তাকে, অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যায় এমন দু'একজন, তাদের সম্বন্ধে এমন উদাসীন হয়ে থাকলে তার চলবে না। গোপনে দু'দণ্ড দেখা দেওয়া ছাড়া গোর তাকে কিছু দেবে না সে জানে! তাকে নিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে বসবাস করার সাধ্যও বোধহয় গোরের নেই। সাধ থাকলেও ভরসা পাবে না। জানাজানি হবার আশঙ্কায় গোরের মুখ সেদিন কি রকম পাংশু হয়ে গিয়েছিল চিন্তামণি তা ভুলতে পারেনি।

এই জ্বালাটাই তার বেশী। যোয়ান ছেলে, মা ছাড়া সংসারে কেউ নেই, কোথাও কারও কাছে বাঁধন নেই কোনরকম, তার কেন এত ভয় তাকে নিয়ে ঘর করার, তাকে ভাত কাপড় দেবার! পটলের অস্তিত্বই সে একরকম ভুলে গিয়েছিল। চিঠিপত্র লেখা আর পড়ার কাজটা আজকাল তার গৌরই করে দিত—পটলের মত অনায়াসে অবশ্য নয়, অতি কষ্টে। প্রত্যেক চিঠির দু'দশটা কথা সে তো পড়তে পারে নি। চিন্তামণি যেচে পটলের সঙ্গে আবার আলাপ জমায়। বলে, 'কথাই দিকি বলেন না পটলবাবু।'

পটল বলে, 'যা তোমার দেমাক।'

মুখখানা কাঁদ কাঁদ করে চিন্তামণি করুণ সুরে বলে, 'দেমাক দেখলেন? আমার দেমাক? দুঃখী মানুষ আমি দাসীগিরি করে খাই—'

পটল তখন মুচকে হেসে বলে, 'না করলেই হয় দাসীগিরি!'

দিনের আলোয় মানুষটার মুখের পাকামির ছাপের মধ্যে চিন্তামণি সাংসারিক বাস্তব দেনা-পাওনার সম্পর্ক গড়ে তোলার শক্ত পাকা বনিয়াদ খুঁজে পায়। এ যা নেবার নেবে, যা দেবার দেবে। তাদের দুজনের কারো বলবার থাকবে না আদান-প্রদান কোন দিন কোনপক্ষ ফাঁকি দিয়েছে। সম্পর্ক হবে সহজ সাধারণ, দিনগুলি কাটাবে নিশ্চিন্ত স্বাভাবিক সুখে। গৌরের কাছে তো চড়া নেশা আর বুক ধড় পড়ানির আনন্দই শুধু মেলে। পর পর দু'রাত্রি গৌরের জন্য বড় বেশী মন কেমন করার যন্ত্রণা সয়ে চিন্তামণির মেজাজটা তাই আরও বেশী খিঁচড়ে গেল। দিনের বেলা খুঁজে খুঁজে যেচে যেচে আরও বেশী আলাপ করল পটলের সঙ্গে।

পরদিন বিকালে একখানা চিঠি এল চিন্তামণির নামে। পড়ে দেবার জন্য চিঠিখানা হাতে নিয়েই পটল পকেটে পুরে দিল।

'রাতে পড়ে শোনাব চিন্তামণি।'

'ওমা, রাতে কখন?'

'অনেক রাতে, সবাই যখন ঘুমোবে। আজ এখানে শুয়ে থাকব, বৈঠকখানায়।'

চিন্তামণির মনে হল, তাই হোক। গৌর কবে এসে পড়ে ঠিক নেই, আজ রাতেই বোঝাপড়া চুকে যাক পটলের সঙ্গে। সাতটা দিনও আর সে পার হতে দেবে না, নিজের ঘরে নিজের সংসার পাতবে। নিজের রান্না করবে নিজে, পরবে নিজের কাপড়, জল তোলা বাসন মাজা ঘর মোছা বিছানা পাতার কাজ করবে নিজের, রাতে পাশে নিয়ে শোবে নিজের পুরুষটিকে। কি জ্বালাতেই জ্বলে যাবে গৌরের বুক!

কি করবে গৌর?

সকাতর গৌরকে নানাভাবে কল্পনা করার চেষ্টায় সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়, অন্ধকারের সঙ্গে এক অজানা আতঙ্ক ঘনিয়ে আসে চিন্তামণির মনে। হিংসায় বুক ফেটে কি যাবে গৌরের? দুঃখে সে কি মুহ্যমান হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য? জীবনের সাধ-আহ্লাদ কিছুই কি তার অবশিষ্ট থাকবে না? কে জানে কি করবে গৌর! হয়তো হাঁপ ছেড়েই সে বাঁচবে যে যাক, সব চুকেবুকে গেল! হয়তো দেখাই সে আর কোনদিন পাবে না গৌরের!

তা পাবে না। পটলের ভাড়া করা ঘরে গেলে কি করে সে গৌরের দেখা পাবে? এ বাড়ি ছেড়ে গেলে গৌরকেও তার ছাড়তে হবে জন্মের মত।

চিন্তায় ভাবনায় যেন অম্বল হয়েছে মনে হল চিন্তামণির। না খেয়ে সে শুয়ে পড়ল। বৈঠকখানায় যাবে কি যাবে না স্থির করতে করতে রাত তিনটে বাজিয়ে এক-সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন রুদ্ধ পটলের কাছ থেকে চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে সে তোরঙ্গে তুলে রাখল। কাউকে দিয়ে চিঠিখানা পড়িয়ে শুনবার জন্য মনটা তার এমন আকুলি-বিকুলি করতে লাগল যে চারদিন পরে তার মনে হল এ যাতনা সহ্য করা যায় না। গৌরের ভাবনার চেয়ে না-পড়া চিঠির জ্বালা তার বেশী হয়েছে।

পরদিন দুপুরে গৌর ফিরে এল।

বড়নিছিপুর

বৈন চিন্তামণি আমি বড়নিছিপুর আসিয়াছি জানিবা। না আসিয়া কি করিব আমার কে আছে আমাকে পুষিবে। পোড়া কপালে এত কষ্ট ভগবান কেন দিয়াছিল মরিয়া গেলে সুখ পাইতাম তা মরণ অদিষ্টে নাই। তুমি আমি দুই বইন মন্দ অদিষ্ট তুমি আট টাকা পাঠাইয়াছ তাহাতে কি হইবে জিনিসপত্র আগুন হইয়াছে। বাবুরা শুদ্দ দিশা পাইতেছে না কি দিয়া কি করিবে। ছেলাপিলা মাগের ভাত কাপড় দিতে মাথায় হাত দিয়া কান্দে। তুমি আমাকে টাকা পাঠাইয়াছ তাতে কত সুখী হইয়াছি যে দিদিরে তুমি ভুলিলা না নিজে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইলা। নিজ বয়স বুঝিয়া সাবধানে চলিবা মন্দ লোক বুঝিলে কোন সংসর্গ রাখিবা না। পেটের খিদায় তুমি ধুধুবনী গিয়াছ ইহা আমারই অদিষ্ট। বড়নিছিপুরে আমি ভুষণবাবুর বাসায় আসিয়াছি। ভুষণবাবুরে তুমি চিনিবা তিনি মোদের গাঁয়ের হালদার মশায়ের বড় জামাই তোমার হাত ধরিয়া টানিতে দেখিয়া যাহাকে গালমন্দ করিয়াছিলাম কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে প্রকাশ করি নাই। আমি ভুষণবাবুর বাড়িতে আসিয়া আছি। ইনি এমন ভালো লোক তাহা জানিতাম না। আমাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এখানে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। খিদিরপাড়ায় বাপের বাড়ি বৌ প্রসব হইতে আসিয়াছিল তাহাকে আনিতে আসিয়া বলিলেন যে হরমণি তুমি জানাশুনা লোক তোমারে চাকরাণী হইতে বলিতে পারিব না। তুমি খাওয়া পরা পাইবা সব পাইবা আপনজনের মত ঘরে থাকিবা। বাসনমাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া সব কাজ করিবা তাহাতে তোমার কিসের অপমান, আমার মা বৈন সংসারের কাজ করে না। তুমি জানিবা যে আমরা নীচু জাতের মেয়ালোক আমার সহায় সম্পদ কিছু নাই ছাড়াও এখন না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছি তথাপি আমার মান রাখিলেন। ভুষণবাবুকে দেবতা বলিয়া জানিয়া পায় ধরিয়া কত কাঁদিয়াছি তাহাতে কিরূপ লজ্জিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন তুমি কেন কান্দিতেছ পায় ধরিতেছ কেন আমি নিজ কর্তব্য করিয়াছি ইহা কিছু নয় তিনি এরূপ দেবতা অপেক্ষা বড়। বড়নিছিপুরের যে মস্ত কারখানা আছে তাহাতে ইনি কাজ করেন। কারখানা তুমি কি দেখিয়াছ এখন কি হইয়াছে। সিংপাড়া গাঁয়ের চিহ্ন নাই সেখানে কারখানা বসিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া থ বানিয়া গিয়াছি।

আশির্বাদিকা দিদি

পাঁচ

পৃথিবীতে বড় একটা যুদ্ধ বেধেছে খবর পেয়েছিল মধুবনী ও তার আশেপাশের সবাই। বাতাসে বাতাসে খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল চারিদিকে। তা যুদ্ধ যদি বেধে থাকে থাকুক, বিলাত দেশে যুদ্ধ বাধবে সেটা আশ্চর্যের কথা কি এমন, গরু শুয়োর মদ খাওয়া ম্লেচ্ছ জাত, রক্ত গরম, মাথা গরম, ওরা তো যুদ্ধ করবেই যখন তখন। হিংস্র পশুর মত ও লালমুখো জাতের পরিচয় কি আর জানতে বাকী আছে কারো। ছাব্বিশ আর পঁয়ত্রিশ সালে বাপ বলানো গুঁতোর চোটে মর্মে মর্মে টের পেয়েছে সবাই। ওরা যদি হানাহানি কাটাকাটি না করে করবে কারা?

এই তো সেদিনও একটি কুরুক্ষেত্র হয়ে গিয়েছিল ওদের নিজেদেব মধ্যে। বেশীদিনের পুরানো কথা নয় যে বুড়োদের শুধু মনে থাকবে, যোয়ানদেরও স্পষ্ট মনে আছে সে যুদ্ধের কথা। পুরো একটা যুগ ধরে এরা কি হানাহানি করে মরেনি নিজেদের মধ্যে, সাবাড় হয়ে যায়নি বেশীর ভাগ পুরুষ? মাঝখানে এতদিন যে ওরা যুদ্ধ করেনি সে তো শুধু এইজন্য যে যুদ্ধ করার পুরুষ ছিল না দেশে।

জিনিস ওজন করা স্থগিত রেখে বাড়ুয্যে বলে, 'কথা তুললে যদি তো বলি শোনো রঘু। লড়াই থামলে সবাই দেখলো কি জানো? দেখলো দেশ ভরা শুধু মেয়েলোক, বুড়ী মাঝবয়সী যুবতী কিশোরী সব বয়সের গাদা গাদা মেয়েলোক—পুরুষ যে কটা হাতের আঙ্গুলে গোনা যায়, তার আবার আদ্দেক কাণা খোঁড়া। সর্বনাশ! এ যে জাত শুদ্দু লোপ পাবার যোগাড়। সবাই মিলে তখন ঠিক করলে বিয়ে টিয়ে তুলে দাও, বলনাচ চালাও। বলনাচ জান না?'

রঘু, গৌর, নিতাই, পচা সুবলদেব অজ্ঞতায় আমোদ পেয়ে বাড়ুয্যে বেশী করে খ্যা খ্যা করে খানিকটা হেসে ফট করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নেয়।

বলে, 'বল মানে ফুটবল নয় হে, গর্ভ। বলনাচ গর্ভ ধারণের নাচ, আমাদের শাস্ত্রে যাকে গর্ভাধান বলে। যেদিন যত মেয়েছেলে মাস কাবারি চান করে, তারা সবাই সেদিন থেকে বলনাচের আসরগুলিতে যায়,—সেদিন থেকে দশদিন, ব্যাস্। যে কটা পুরুষ বেঁচেছিল যুদ্ধে, কাণা খোঁড়া সবশুদ্ধ বলনাচের আসরে থাকে। খানিক নাচানাচি হয়, তারপর—

বাঁড়ুয্যে গম্ভীর হয়ে বলে, উপায় কি বলো, জাত কি লোপ পেয়ে যাবে? আমাদের গাই গরুর কথাই ধরো। এতগুলো গাই, ষাঁড় আছে কটা? গাই নিয়ে সবাই ছোটে একটা দুটো ষাঁড়ের কাছে, উপায় কি!' যুদ্ধ বেধেছে বাধুক! যুদ্ধের জন্যই যারা এমন করে বংশবৃদ্ধি করে, যুদ্ধ করে তারা ধ্বংস হয়ে যাক!

বিদেশে বিদেশীদের যুদ্ধ, মধুবনীর চাষীদের কি সম্পর্ক সে যুদ্ধের সঙ্গে? জাপান যুদ্ধে নেমেছে? জাপানও তো বিদেশী। বিলিতী মাল আসে মধুবনীতে, জাপানী মাল আসে। বিলাতও যেমন বিদেশ, জাপানও তাই!

বঞ্চিত নিষ্পেষিত জীবন এদের কাছে স্বাভাবিক সঙ্গত ও অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, সুদূরের বিদেশের যুদ্ধের চাপটা তারা অনুভব করে ধীরে সুস্থে। কোনমতে বেঁচে

থাকার সামান্য প্রয়োজনগুলি এলোমেলো হয়ে থাকার চাপ। কোনদিকের চাপটা বাড়ে ক্রমে ক্রমে, কোনদিকের চাপ অকস্মাৎ বেড়ে গিয়ে তাদের দিশাহারা করে দেয়। তেল চুন মশলার দোকানে আধলা ছিদামের বিক্রী বন্ধ হওয়ার মধ্যে তারা ব্যক্তিগতভাবে টের পায় যুদ্ধের ধাক্কা।

জিনিষের দর বাড়ে। কতগুলি জিনিষের দাম একেবারে হয়ে যায় চড়ক গাছ। কতগুলি দরকারী জিনিষ একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় বাজার থেকে। সারা মধুবনীতে বিলেতী ফুড কেনার সমস্যা চাষীদের মধ্যে এক রঘু ছাড়া আর কেউ বোধ করেনি, কিন্তু লাঙ্গলের ফাল, দা কাস্তে পেরেকের সমস্যায় ভুগেছে অনেক চাষী। নিতাই কামারের হাপর বন্ধ নয়, কিন্তু হাপর চলেছে শুধু সারাইয়ের কাজে, কিছু তৈরী হবে না, লোহা নেই। বাজারের পুরানো লোহার কারবারী রামচরণ কদিন আগে হঠাৎ এসে ডবল দাম দিয়ে লোহার গুঁড়োটি পর্যন্ত কুড়িয়ে নিয়ে গেছে নিতাই-এর দোকান থেকে। নিতাই কি জানত তখন এমন ব্যাপার হবে? গরুর গাড়ির একটা লোহার ডাণ্ডা রামচরণ কিনে নিয়ে গিয়েছিল সাড়ে পাঁচ টাকায়, আড়াই টাকা লাভ হয়েছিল নিতাই-এর! মিউনিসিপ্যালিটির গাড়িটার জন্য সেই ডাণ্ডা হরেকৃষ্ণবাবু কিনেছেন তের টাকায়। সাড়ে সাতটাকা লোকসান নিতাই-এর।

লাজনতলার সোমবারের হাটে কাপড় কিনত চাষীরা, আট দশ আনা চড়া দেখে দু'তিন হাট তারা কেনা বন্ধ রেখেছিল। পরের সোমবার দ্যাখে কি হাটে কাপড় এসেছে মোটে দু'চারখানা।

ইঁদুনাথার বরুল তাঁতি কেঁদে বলল, 'হায়রে ঝকমারি! একা বুনি দু'চারখানা, তাতে কি ভাই সংসার চলে? দশজনেরটা কিনে এনে বেঁচে আছি দু'-চার গণ্ডা লাভ পেয়ে। শালা ছিনাত নন্দী টাকা দিয়ে সাপটে সব কিনে নিল; ভাবলাম বড় দাঁও মেরেছি। দেখবি যা নন্দীর ঠেঁয়ে, দু'য়ের তিনের কাপড়ের দর হাঁকছে সাত আট নয়। ইদিকে সুতো পাইনে মাইরি। নন্দী বেটা বলছে সুতোর আমদানী নেই, কোথা পাব সুতো! কিছু আছে দিতে পারি, তা দর কিছু বেশী লাগবে। কি দর জানো? সোনার দর! আর সালে সোনা কিনেছি ওই দরে নেতার মার নাকছাবির জন্যে। তাঁত বন্ধ গাঁয়ে। সব কটা তাঁত বন্ধ। এ কি হল কাণ্ডখানা?'

এখনো কিছু কাপড় আছে বরুল তাঁতির ঘরে। দিবারাত্রি তার স্বস্তি নেই, ঘুম নেই। যে কাপড় বেচে দিয়েছে সামান্য কিছু বেশী লাভে তার জন্যে আপশোষ, বাজারের দর দেখে বাকী কাপড় ছেড়ে দেবার তাগিদ, দর আরও চড়ছে দেখে অপেক্ষা করার লোভ, দর পড়ে যাবার ভয়—কত কি চিন্তা যে ঘুরপাক খাচ্ছে বেচারীর মাথায়! সাতান্ন জোড়া কাপড় একশো তেইশ জোড়া গামছা, দু'চারখানা গামছা আবার বেশী দরে কিনেও রেখেছে।

এসব অভ্যাস নেই বেরুলের, বেশিদিন টিকবার সাধ্য তার হয় না। ভেবে ভেবে এমন মাথা ঘোরে আর বুক ধড়ফড় করে তার যে নন্দী বাবুর লোক এসে আরও আট আনা বেশী দিতে চাওয়া মাত্র সব মাল ছেড়ে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

'মিলের কাপড় মেলা কষ্ট।'

'মিল কাপড়ের দর চাড়িয়ে নিলে। এই ফাঁকে সুতো পেলে মোরে কিছু হত।'

চালের দাম বারো টাকা। ঘরে গোরের চাল বাড়ন্ত, দুধ বেচা পয়সা নিয়ে চাল কিনতে গিয়ে সে শোনে, চালের মণ বারো টাকা, মোটা ভাঙ্গা চাল। আড়াই টাকায় গত ফসলের যে ধান সে নিজে বেচেছে, সেই ধানের চাল বারো টাকা।

রঘুর কাছে গিয়ে সে বলে, 'এত ভারি মুস্কিলের কথা হল ?'

রঘু হেসে বলে, 'ভড়কে গেলি তো ? চুপ করে থাক না ক'দিন। তড়কানি খেলছে ওরা, যুদ্ধ লেগেছে খবর এয়েছে কিনা তাই ভেবেছে তড়কিয়ে দিয়ে মেরে নেবে ফাঁকতালে। শালার বোয়ের মাই কিনা চাল, বারো টাকা মণ বেচতে চান যুদ্ধুর নামে। কোথায় যুদ্ধ, কোথায় কি, মোর পান্তায় নেই কো ঘি। যেমন হাবা তুই, ঘাপটি মেরে থাক না বসে চুপটি করে দশটা দিন !

'চাল যে বাড়ন্ত ঘরে, কিছু বোঝ না তুমি।'

'চাল বাড়ন্ত, চাল নে যা দু'কুনো। কথা কিসের অত ?'

রেজকি যখন সবে কর্পূরের মত উড়ে যেতে আরম্ভ করেছে বাজবে থেকে, গোরের চাঁদকাকা একদিন শম্ভু সা'র দোকানে যায় তার মেয়ে পুঁটুর পায়ের মল সারাতে। ফিরে সে আসে চাপা উত্তেজনা আর মলের বদলে টাকা নিয়ে, কাগজের টাকা অবশ্য।

পুঁটু পোঁ করে কান্না ধরতেই চাঁদ তার হাত চাপা দিয়ে চাপা গলায় গর্জাতে থাকে, 'চুপ যা চুপ যা, বলছি হারামজাদি। টুঁ শব্দটি করবি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।'

মেয়ে ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে চুপ করলে মুখ থেকে হাত সরিয়ে চাঁদ শুধোয়, কান্না কিসেয় শুনি ?'

পুঁটু বলে, 'মল কই মোর ? মল এনে দাও মোকে।'

'সারাতে দিলাম যে মল ?'

'পুঁটু সন্দিগ্ধভাবে বলে, 'তবে যে বললে মাকে মল বেচে টাকা এনেছ ?'

'কই বললাম। বলিনি তো, কি বললাম তুই কি শুনলি আবাগীর বেটি।' মেয়ের সন্দেহ উড়িয়ে দেবার জন্য চাঁদ জোর করে সস্নেহ কৌতুকের হাসি হাসে, মেয়েকে কাছে টেনে তার মাথা চাপড়ে বলে, 'পরশু মল এনে দেব তোর, পরশু। হা দ্যাখ মলের রসিদ দিয়েছে শম্ভুদা।'

পকেট থেকে একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বার করে চাঁদ মেয়েকে দেখায়। তারপর আর বিলম্ব না করে ঢক্ ঢক্ করে আধঘটি জল খেয়ে যায় পাশের বাড়িতে কালাচাঁদের কাছে।

কালাচাঁদের অবস্থা বড় শোচনীয়। ক'বছর আগেও তার অবস্থা এখানকার অনেকের চেয়ে ভাল ছিল, সারাবছর একটি দিনের তরেও বৌ ছেলেমেয়ের তার পেটভরা খাবারের অভাব হয়নি, জোতদার করালী শাসমলের অতি বড় একটা অন্যায় মেনে নিয়ে আপোষ করতে রাজী না হওয়ায় তার হয়ে গেল সর্বনাশ, মামলা মোকদ্দমায় আর একদিন অন্ধকার রাতে অজানা কার লাঠির আঘাতে ডান হাতটা দু'জায়গায় ভেঙ্গে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাওয়ায়। কপাল মন্দ হলে সবদিক দিয়ে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে তার প্রমাণও কালাচাঁদ পেয়েছে, রোগের বাড়াবাড়িতে। অসুখ বিসুখ আগেও তার সংসারে ছিল, সব সংসারে যেমন থাকে, যার তাল সামলাতে রীতিমত খানিকটা বেগ পেতে হয় শুধু, কিন্তু দিন খারাপ পড়ার সঙ্গে জগতের সব রোগ যেন ভিড় করে আসছে শুধু তারই বাড়িতে।

চাঁদ তাকে বলে, 'ঘেটুর মা কেমন আছে আজ কালাচাঁদ ?'

কালাচাঁদ বাঁ হাতে চোখ কচলে একটা অস্ফুট শব্দ করে, কথার চেয়ে মানে যার বেশী স্পষ্ট।

চাঁদ একেবারে তামাক সেজে খেলো হুঁকোয় কল্‌কে বসিয়ে টানতে টানতে এসেছিল, দাওয়ায় উবু হয়ে বসে হুঁকোটা সে এগিয়ে দেয় কালাচাঁদকে। খানিক একথা সেকথা বলে নিয়ে শুধোয়, 'পৈছেটা বেচে দেবে শুনেছিলাম, দিয়েছো নাকি ভায়া ?'

দু'বছর সে যার সঙ্গে কথা কয়নি আজ তাকে চাঁদ ভায়া বলে।

'দেব আজকালের মধ্যে।'

'অ্যাদ্দিন বেচো নি ওটা, এ বড় আশ্চর্য !'

'ঘেঁটুর মা লুকিয়ে রেখেছিল। নিশ্চিত মরবে জেনে ভয় পেয়ে তবে না ফাঁস করলে। ওটা বেচে ডাক্তার আনব, ওকে বাঁচাব, সখ কত বাঁচার! ডাক্তার এসে বাঁচিয়ে দিছে আমার ন'কড়ি, সাত কড়িকে, জন্মের মত বাঁচিয়ে দেছে। এবার এসে বাঁচাবে ওকে?'

হুঁকোয় জোর টান দিতে গিয়ে কাশির ধমকে দম আটকে আসবার উপক্রম হয় কালাচাঁদের, এক হাতে হাড় পাঁজর বার করা শীর্ণ বুকটা চেপে ধরার জন্য তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখতে গিয়ে হুঁকোটা কাত হয়ে কল্কের আগুন ছড়িয়ে যায়।

'বেচবে যখন, দাও, আমিই কিনে নি।' কালাচাঁদ একটু সুস্থ হলে চাঁদ বলে, 'কিনতে একটা হবে আমার পুঁটুর জন্যে, পৈছে পৈছে করে ক্ষেপে গেছে একদম। বড়ও হয়েছে, বিয়ে শীগগির না দিলে নয়। তাই ভাবছি কি, বিয়ের সময় করতে হবে একটা, দুদিন আগেই কিনি, মেয়েটা বায়না করেছে যখন। মজুরি বাদে যা পড়েছিল তোমায় তাই দেব'খন। রুপো আছে কতটা ওতে?

কালাচাঁদ চুপ করে থাকে। তার পক্ষে উৎসাহের একান্ত অভাবটা বড় খাপছাড়া, বড় বিচ্ছিরি লাগে চাঁদের।

'নগদ দেব—সব টাকা নগদ। বাকী কিছু রাখব না।'

'রুপোর দর খুব চড়েছে শুনলাম?'

কথা শুনে চাঁদের বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

গোর যাচ্ছিল কাল রাস্তা দিয়ে, ডেকে বললাম, ও বাবা গোর, পৈছেটা বেচে দিবি বাবা কারো কাছে, দুটো টাকা যাতে বেশী পাই? গোর বললে—রুপোর দাম বেড়েছে, দেড়গুণ দুগুণ টাকা। সা'র দোকানে দর কষিয়ে গোর নিজে কিনবে বললে পৈছেটা। বলি বিয়েটিয়ে করবে না কি ভাইপো তোমার?'

'কি জানি।'

'শুধিয়েছিলাম। তা চাপা দিয়ে দিলে কথাটা। মন লাগে কি, বিয়েটিয়ে করবে নয়তো পৈছে দিয়ে কি করবে ও, বৌ আছে না বোন আছে না মেয়ে আছে ওর? যোয়ান ছেলে, তুমি তো দিলে না, পিথক হয়ে নিজেই জোগার করেছে বিয়ের। ছেলেটা ভাল চাঁদ, ওর ভালো হবে। দেখে নিও ভাল হবে তোমার ভাইপোর।'

সবাই তবে জানে রুপোর দাম চড়ার খবর? কেন সবাই জানলো ভেবে বুকটা জ্বলে যেতে থাকে চাঁদের। সে একা না জেনে কেন সবাই জানল!

জ্বলতে জ্বলতে একটা কথা স্মরণ করে মনটা শান্ত হয়। মল কিনে সা তাকে শুধিয়েছিল; 'কাঁচা টাকা আছে চাঁদ? থাকলে এনো।' কাঁচা রুপোর পুরানো টাকা, এডোয়ার্ড মার্কা, রাণী মার্কা টাকা। চাঁদ জানে তারই বাড়ির ঘরের ভিটিতে মাটির তলায় পোঁতা আছে এক ঘটি পুরানো টাকা, তার বুড়ী শাশুড়ীর চাটাই কাঁথার বিছানার নীচে।

প্রায় চারকুড়ি বয়স হবে চাঁদের শাশুড়ীর, কাঁকাল বাঁকা হয়ে সামনে নুয়ে গেছে, লোল চামড়া ঢাকা কংকালসার দেহটা, লাঠি ধরে ছাড়া দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তবু এই একভাবে বুড়ী দিব্যি টিঁকে আছে চাঁদের বাড়িতে আজ পাঁচ বছর। তবু টাকা ভরা ঘটেটা কোলে রেখেই বুড়ীকে একদিন স্বর্গে যেতে হবে জেনে এতদিন চাঁদ নিশ্চিন্ত ছিল। ধরতে গেলে ও টাকা তো তার নিজেরই সঞ্চয় বলা যায়।

সারাদিন চাঁদ চঞ্চল হয়ে থাকে ঘটিটার কথা ভেবে। একটা টাকার দাম হয়েছে এক টাকার বেশী, এমন কথা শুনেছে কেউ কোনদিন? এমন সুযোগ এসেছে কোন কালে? কে জানে ক'দিন থাকবে এই সুযোগ! আর শুধু কি এই একটা সুযোগ? রুপোর গয়নার কথাটাই ধর। সত্যি সত্যি কি আর দেশশুদ্ধ লোক জেনে গেছে রুপোর দাম চড়বার খবর, রেলের কাছে মধুবনী বড় জায়গা, এখানে হয়তো জানাজানি হয়ে গেছে। দূরে ছোট ছোট গাঁয়ে হয়ত খবরও পে'ছায়নি এ ব্যাপারের। মধুবনীরও সবাই হয়তো জানে না! গৌর চালাক চতুর, বাজারে যাতায়াত আছে, দশটা লোকের সঙ্গে মেলামেশা আছে, ওরা জানতে পারে। সবাই কি ওদের মত মধুবনীর? বোকাহাবা লোক কি নেই এখানে? রুপোর পুরানো টুকিটাকি গয়না যদি সে কিছু কিনতে পারে ওদের কাছে থেকে! মাটির টাকাগুলো যা'কে বেচে লাভ হবে, টাকার বদলে পাওয়া বেশী টাকাটা এভাবে খাটিয়েও তার লাভ হবে!

চাষী চাঁদের মনে এই সব চিন্তা পাক খেয়ে বেড়ায়—অনভ্যস্ত এলোমেলো চিন্তা বলে একেবারে উতলা করে দেয় তাকে। রুপোর মল বেচে অশাতীত লাভ করেছে বলে শুধু এই পণ্যটির কথাই সে ভাবে, আরও কত কিছু কেনাবেচার মধ্যেও যে এরকম লাভের সুযোগ দেখা দিয়েছে সে সব তার মনেও আসে না, সোনার কথাটা পর্যন্ত নয়!

দেখা গেল, বুড়ীর ঘটি চুরি করার কাজটা মোটেই সহজ নয়। ঘর ছেড়ে বুড়ী বড় একটা কোথাও নড়ে না। বেশীর ভাগ সময় ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকে, বাকী সময়টা ঘরেরই সামনে দাওয়ায় উ'চু হয়ে দু'পায়ের হাঁটু মাথায় ঠেকিয়ে বসে থাকে, কখনো আপন মনে বিড়বিড় করে, কখনো কাঁপা গলায় তারস্বরে চে'চিয়ে একে ওকে গাল দেয়। নাইতে খেতে ও প্রকৃতির তাগিদে বুড়ীকে অবশ্য সরে যেতে হয় কিছু কিছু সময়ের জন্য কিন্তু চাঁদ ভরসা পায় না। বিছানা তুলে মাটি খুঁড়ে আবার গর্ত বুজিয়ে এমনভাবে বিছানা পেতে রাখতে হবে, বুড়ীর যাতে সন্দেহ না হয়। বুড়ীর অনুপস্থিতির সময়-টুকুতে সেটা সম্ভব নয়।

'চণ্ডীতলায় পুজো দিতে যাবে বলছিলে না মা? তা যাও না, দিয়ে এসো পুজো।' চাঁদ বুড়ীকে জপায়।

হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বুড়ি বলে, 'মাথায় থাক পুজো দেয়া। অদ্দুর কি চলতে পারি? তুই যা না বাপ, দিয়ে আয়না পুজোটা?

'বুড়ো মানুষ, সাধ হয়েছে, ডুলি করেই যাও। ডুলির পয়সা দেব'খন আমি। বিন্দুকে বলে দিচ্ছি।'

ডুলি চেপে চণ্ডীতলায় পুজো দিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বুড়ি চাঁদকে দিয়েই ঘরের দরজার কুলুপ আঁটায়। শিকল কপাটের নীচের দিকে, কুলুপটা বুড়ী আবার নিজে টেনে দ্যাখে ঠিকমত লাগল কি না!

ডুলি ভাড়া গচ্ছা যাবার দুঃখের সঙ্গে নতুন নির্ঘাৎ মতলব ঠাউরাবার চেষ্টায় মাথা ঘামানোর পরিশ্রম মিশে প্রায় কাবু করে আনে চাঁদকে। ভাবতে হয় একা বৌয়ের সঙ্গে যে একটু পরামর্শ করবে তারও উপায় নেই। যতই হোক, সে তো মেয়ে বুড়ীর। বোকা মেয়েমানুষ, হয়তো গণ্ডগোল করে বসবে। বুড়ী চণ্ডীতলায় গেলে ছুতো করে বৌকে গৌরের রুগ্ন মার খবর আনতে পাঠিয়ে কাজ হাসিল করবে ভেবে রেখেছিল। পুরানো মর্চে ধরা এক কুলুপের জন্য সব ফস্কে গেল!

গৌরের গরুর দুধ কমে গেছে। নীলকণ্ঠবাবু চাঁদের কাছ থেকে এক সের করে দুধ নেবার ব্যবস্থা করেছেন। এ বাড়ীতে দুধ নিতে আসবার কোন তাগিদ চিন্তামণির

ছিল না। কিন্তু সাধ করে গৌরের বাড়ি দুধ নিতে আসবার ভারটা নেওয়ায় এ বাড়িতেও তাকে খুব যেতে হয়। দুজনের বাড়ি বেশী দূরে নয়।

পরদিন সকালে চিন্তামণি এসেছে দুধ নিতে, চাঁদ চেয়ে দ্যাখে কি বিধবা মেয়েটা রুপোর পৈছে পরেছে বেহায়ার মত। ঘেঁটুর মার গায়ে যেটা লটকে থাকতো এ পৈছেটাও যেন তারই মত।

'পৈছে দিলে কে?' চাঁদ শুধায়।

'কে দেবে, কিনিছি।'

'কার কাছে কিনলে? গৌরের কাছে নাকি?'

'অত খোঁজে কাজ কি তোমার? দুধ নিতে এইছি, দুধ দুয়ে দাও, নিয়ে চলে যাই!' চিন্তামণি ঝাঁঝালো সুরে জবাব দেয়। ঝোঁকের মাথায় সখের বশে পৈছেটা গায়ে চাড়িয়ে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল, ভোরের এই সুন্দর পৃথিবীতে সব মানুষ সব ভুলে তার এই গয়নাটির দিকেই শুধু তাকিয়ে থাকছে হাঁ করে।

'তোমার তো বড় মুখ বাছা?' বলে চাঁদ চুপ করে যায়।

রাত্রে পুঁটু তার দিদিমার কাছে শোয়। দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে সে কেমন এক খাপছাড়া ভীতকণ্ঠে ডাকে, 'বাবা।'

দুধ দোয়া স্থগিত করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাঁদ বলে, 'কিরে পুঁটু?'

'দিদিমা যেন কেমন করে শুয়ে আছে, দ্যাখোসে বাবা।'

'ডাক না?'

'ঠেললাম তো। নড়ে চড়ে না।'

তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে গিয়ে এক নজর তাকিয়েই চাঁদ টের পায় বুড়ী মরে গেছে। বুকটা তার ধড়াস করে ওঠে, মাথা ঝিমঝিম করে। তার মনে হয় সেই যেন মনেপ্রাণে জোরালো কামনা করে বুড়ীকে মেরে ফেলেছে। আর কি এ মরণ! রোগবালাই নেই, সাড়াশব্দ হৈ চৈ নেই, রাত্রে ঘুমের মধ্যে চুপি চুপি নিঃশব্দে স্বর্গে যাওয়া।

পুঁটু কেঁদে ওঠে, তার মা ছুটে এসে কান্নায় যোগ দেয়, আশেপাশের বাড়ির লোক দু'চারজন এসে জুটতে আরম্ভ করে। দুধ আর চিন্তামণির নেওয়া হয় না। বুড়ীর শোকে চাঁদের দুধ দেওয়ার শক্তি লোপ পাওয়ার জন্য নয়, যে বাড়িতে সদ্য সদ্য একটা মানুষ মরেছে সে বাড়ি থেকে দুধ নেওয়া চলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখে শুনে চিন্তামণি চলে যায়। ভাবে গৌরকে খবরটা দিতে হবে।

বুড়ীকে পুড়িয়ে এসে চাঁদ খন্তা নিয়ে ঘটি উদ্ধার করতে যায়, পুঁটুর মা ডেকে বলে, 'ও কি করছ?'

'টাকার ঘটিটা বার করি মেঝে থেকে?'

পুঁটুর মা বলে, 'ওখানে ঘটি কই? ঘটি নেই ওখানে।'

চাঁদ অবাক হয়ে বলে, 'কোথায় আছে তবে? এইখানে তো পোঁতা ছিল ঘটি?'

পুঁটুর মা বলে, 'শোন ইদিকে বলছি সব। ব্যাপার আছে অনেক।'

ভূমিকা শুনে মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় চাঁদের। তীব্র জ্বালাবোধের সঙ্গে সে ভাবে আশাভঙ্গের কি শেষ নেই তার?

পুঁটুর মা বলে, 'ব্যাপারখানা কি জানো, ঘটি থেকে টাকাগুলো মা বার করে নিয়েছিল। বাবুকে বলে পোষ্টাপিসে জমা রেখেছে ওবছর। বলাই ঘোষের ঘর পুড়ে মাটির টাকাগুলো গলে তাল পাকিয়ে গেলো না সেবার, মা তখন ভয় পেয়ে গেল।'

টাকা তবে আছে? চাঁদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

'আমায় বলনি কেন?'

'তুমি যদি গোলমাল কর?'

কিছু হাঙ্গামার পর চাঁদ টাকাগুলি পেল—রুপোর টাকা নয়, নোট কাগজের নোট।

বিয়ে করা কাঁচ বৌকে নিয়ে সংসার করার অস্পষ্ট সাধটা গোর মামাবাড়ি থেকে আরও জোরালো করে নিয়ে ফিরে আসে। চিন্তামণির শক্ত বাঁধন কেটে নিজেকে সরিয়ে নেবার অস্পষ্ট ইচ্ছাও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিন্তামণির সম্পর্ক তুলে দেবার কথা ভেবে মনটা বড় বেশী কেমন করায় তার ভয় বেড়ে যায়। এভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে চিন্তামণিই হয়তো শেষে তার সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পাইয়ে দেবে, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যা থাকে কপালে বলে চোখ কান বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত মনের অবস্থা তার ঘটিয়ে দেবে চিন্তামণি।

না, এ পিরীত টেনে চলে তার মঙ্গল নেই। সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে চিন্তামণির সঙ্গে।

বড় কষ্ট পাবে চিন্তামণি।

অদ্ভুত উল্লাসভরা গর্ব অনুভব করে গোর। তার জন্য চিন্তামণি পাগলিনী, সে বর্জন করলে বুক চিন্তামণির ভেঙ্গে যাবে, চোখের জল ফেলে ফেলে তার দিন কাটবে, একথা ভাবলে টনটনে একটা ব্যথা-বোধের সঙ্গে গোরের পুরুষ মন অহঙ্কারে ভরে যায়।

ভোরে এসে চিন্তামণি শুধোয়, কেমন যেন ভাসাভাসা গাছাড়া গাছাড়া ভাবে শুধোয়, 'ফিরলে কবে?'

'কাল ফিরেছি।'

'ও। কাল ফিরেচ।'

তারপর চুপ করে থাকে চিন্তামণি, উদাস সম্ভীর মুখে। দুধ দুইতে দুইতে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকিয়ে গোরের মনটা বিগড়ে যাবার উপক্রম করে। চিন্তামণির এ ভাব তার ভাল লাগে না।

'একটা কাজ করবে? চিঠিখানা পড়ে দেবে আমায়?'

পাঠশালায় পড়া বিদ্যায় টানা হাতে লেখা চিঠি পড়তে গোর গলদঘর্ম হয়ে ওঠে। চিঠির সিকি অংশের বেশী পাঠোদ্ধার করার ক্ষমতা তার হয় না। দু' কান তার ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

চিন্তামণি টের পেয়ে বলে, 'ওই হয়েছে নাও। আমি তো ভাবছিলাম তুমি পড়তেই জানো কিনা! চাষার ছেলের পড়ার বালাই দিয়ে কাজটা কিসের?'

তারপর তাকে যেতে না বলে, ভালমন্দ সুখদুঃখের দুটো কথা না কয়ে, চিন্তামণি চলে যায়। তাতে আরও বিগড়ে যায় গোরের মন।

ঠিক এমনিভাবে কেটে যায় কয়েকটা দিন, দু'দণ্ডের জন্য পরস্পরের দেখা হয়ে, ভাসাভাসা দুটো কথার বিনিময় হয়ে, আবেগ ও অন্তরঙ্গতা উহ্য থেকে। একদিকে গোর স্বস্তি পায়, ভাবে এমনিভাবে চলতে থাকলে বিনা চেষ্টায় বিনা হাঙ্গামায় সম্পর্ক ভাঙ্গার ব্যাপারটা তাদের চুকে যাবে। অন্যদিকে ভিতরটা তার এক দুরন্ত ব্যথায় হু হু করতে থাকে। চিন্তামণিকে মনে হয় ম্লান, নিস্জীব! কি যেন দুঃখ বয়ে বেড়াচ্ছে সে,

কথাবার্তা চালচলন চোখমুখের ভঙ্গি সব যেন তার বদলে গেছে সেই দুঃখের চাপে। ছেলে মরবার পর মেয়েলোকের এরকম শোকাতুর মূর্তি হতে দেখেছে গোর। চিন্তামণিও কি নিজে থেকে সংকল্প করেছে, বুক ফেটে গেলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেবে?

এমনিভাবে দিন যাচ্ছে, একদিন কালাচাঁদের পৈছেটা গোর নিজেই কিনে ফেলল একটা খেয়ালের বশে। বেচবার জন্য সা'র দোকানে পৈছেটা ওজন করাতে গিয়ে তার মনে হল, চিন্তামণিকে সে কখনো কিছু দেয়নি। চিন্তামণির মনে সে যে ভয়ানক কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছে, তার কাছে এই পৈছেটা পেলে কি সে কষ্ট কি কিছু কম হবে না?

পৈছেটা কিনে তার মনে হল, এই পৈছে দেওয়া উপলক্ষে শেষবারের মত একদিন চিন্তামণিকে একটু আদর করে দুটো মিষ্টি কথা বলা তার উচিত! পরদিন সে তাই নিজে থেকে সেধে চিন্তামণিকে বলল, 'আজ রাতে যাব?'

'যাবে? যেও।'

বৈন চিন্তামণি,

কতকাল তোমারে পত্র লিখি নাই ইহাতে মনে কষ্ট করিবা না। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় পত্র দিতে গোণ হইল। আমি কাজ করিতেছি জানিবা! ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কী দুঃখ পাইয়াছি না খাইয়া উপাস করিয়াছি এখানে পোড়া পেটের জ্বালায় বজ্জাত ডাকাইতগুলার দাসী হইলাম ইহা অদেষ্টে ছিল। কিরূপ হৈ চৈ হইয়াছে লম্বা লম্বা কত বাড়ি উঠিয়াছে অবাক কাণ্ড দেখিয়া তুমি চোখের পলক ফেলিতে পারিবা না। ইহাকে বারাক বলিয়া জানিবা। ইহার মধ্যে গাদায় গাদায় মাতাল গুণ্ডা গিজ গিজ করিতেছে। আমার মত শতাবধি পোড়া-কপালী ঝি কাজ করিতে আসিয়াছে কাহারো ধর্ম নাই সতীত্ব নাই এরূপ কাণ্ড। বয়স হইয়াছে তথাপি আমারে টানাটানি করে কোনমতে ধর্ম রাখিয়াছি। না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছিলাম ইহা ভিন্ন গতি কি। দুই স্থানে বাসন মাজিয়া তের টাকা করিয়া ছাব্বিশ টাকা পাই। যেরূপ কাণ্ড তোমারে আসিতে বলিতে ভরসা পাই না।

ইতি—তোমার দিদি

ছয়

গোরের ঘরে আজ আবার চাল নেই।

মা বলে, 'ওবেলা হাঁড়ি চড়বে না গোর। চাল বাড়ন্ত।'

আরও কয়েক দিন চলত, পুঁটুকে না খাওয়াতে হলে। কি ভাতটাই খায় এতটুকু মেয়ে! কম দিয়ে এড়িয়ে যাবার যো নেই, যতক্ষণ না পেট ভরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদে চলবে ভাতের জন্য। পেট মোটা ক্যাংটা পুটুর দিকে চেয়ে গোরের মনে আজ আপশোষ জাগে যে চাঁদকাকা তার না খেয়ে মরে গেছে। বেঁচে থেকে আরও কিছুকাল তিলে তিলে তার মরা উচিত ছিল। বৌ আর ছেলে শুধু নয়, এই মেয়েটা চোখের সামনে মরবার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা উচিত ছিল চাঁদকাকার। নিজের আত্মীয় এত বড় শত্রু হয় মানুষের? বেঁচে থাকতে আজীবন শত্রুতা করে গেছে, মরেও শত্রুতা করে গেল।

কতকাল না খেয়ে না খেয়ে পেট চিমসে হয়ে গিয়েছিল পুটুর, হঠাৎ দু'বেলা বেশী ভাত গিলে মরতেও সে পারত। উচিত ছিল তাই। অথচ কাণ্ড দ্যাখো অদ্ভুত, কদিনে চেহারা যেন ফিরতে সুরু করে দিয়েছে মেয়েটার। মুখের বীভৎস শীর্ণতা থেকে মৃত্যুর ছাপ মুছে যেতে আরম্ভ করেছে।

পাতে ভাত কম ছিল, রোজ যা খায় তার অর্ধেক। শেষ করে ভাত চাইতে মা একটু ইতস্ততঃ করে, কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। তারপর আরও ভাত এনে ঢেলে দিতে যায় গোরের পাতে।

মা'র রকম দেখে খটকা লেগেছিল গোরের মনে, দু'হাতে পাত ঢেকে সে বলে 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আর আছে তো ভাত?'

'তুই খা না।'

কিন্তু তা কি হয়? মাকে উপোসী রেখে পেট ভরাতে পারার মত খিদের স্বাদ এখনো গোর পায়নি। লোভে পড়ে শেষ পর্যন্ত কিছু ধান রঘু আর সে বেচে দিয়েছিল কিন্তু সে খুব বেশী নয়। তাদের দু'জনের বাড়িতে তাই এখন পর্যন্ত দুবেলা হাঁড়ি চড়ছে। গোরের মন মুচড়ে গেছে আতঙ্কে, গরু ছাগলের মত চারিদিকে জানাশোনা মানুষগুলিকে মরতে দেখে, দিশেহারা হয়ে পালাতে দেখে দুদিন পরে তার কি অবস্থা হবে এই চিন্তায়। মোটামুটি পেট ভরে খেতে না পেলে হয়তো আতঙ্কে এতটা কাবু হয়ে পড়ত না গোর। পেটের খিদে তার চিন্তা আর অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিত, বিরামহীন কল্পনায় ভয়াবহ ভবিষ্যৎ এমন পাহাড় হয়ে চেপে বসত না তার মনে।

ধীরে ধীরে গোর বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে। পা তার চলতে চায় না। পর হয়েও এ জগতে রঘুই তার সবচেয়ে আপনার, পরমাত্মীয়ের চেয়ে ঘনিষ্ঠ। তবু আবার রঘুর কাছে ধান বা চাল ধার চাওয়ার কথা ভাবতেও তার কেমন বিশ্রী সঙ্কোচ হচ্ছে। রঘু দু'বার তাকে ধার দিয়েছে। মুখ ফুটে দেব না বলেনি, কিন্তু শেষ বার কেমন যেন বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট মনে হয়েছিল রঘুকে, ধান মেপে দেবার পর ভাল করে কথা কয়নি। মুখ হাঁড়ি হয়ে গিয়েছিল বিরজার। বাড়ির অন্য সকলের কথায় ব্যবহারেও একটা চাপা শত্রুতার ভাব গোর অনুভব করেছিল।

কিন্তু উপায় কি। পয়সা কড়ি কিছুই নেই গোরের হাতে। চিন্তামণিকে পৈছে কিনে দেবার সখ না জাগলে হয়তো গোটা কয়েক টাকা থাকত তার হাতে, আজ আবার গিয়ে হাত পাততে হত না রঘুর কাছে।

রঘু তামাক টানছিল দাওয়ায় বসে, চিন্তিত গম্ভীর মুখে। উঠানের এক কোণে মাঝারি পাত্রটায় ধান সেদ্ধ হচ্ছে। সুমিষ্ট চেনা গন্ধে গোরের পেটের অল্প দুটি ভাত যেন চোখের পলকে হজম হয়ে গিয়ে দুর্দান্ত খিদে পাক দিয়ে ওঠে। তাকে রেখে রঘু বিশেষ খুশী হয়েছে মনে হয় না গোরের। হুঁকোটা দিয়ে অভ্যর্থনা করতেও সে যেন ভুলে গেছে। গোরের মনে পড়ে, গতবার ধান দেবার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি বারের জন্যও রঘু খবর নিতে যায়নি সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে।

গলা শুকিয়ে যায় গোরের। আরও একটা নতুন আতঙ্ক তাকে প্রায় দিশেহারা করে দেয়। রঘুও কি সত্যই তাকে ত্যাগ করবে তার বিপদের দিনে? নিজেকে কি যে অসহায় মনে হয় গোরের। আজ সে ভাল করে টের পায়, চিরটাকাল সে কতখানি নির্ভর করে এসেছে রঘুর ওপর, এখনো সে কতটা ভরসা রাখে ওর কাছে। ধান আজ চাইবে কি চাইবে না ভেবে পায় না গোর। ধান চাইলে যদি ভেঙ্গে যায় তাদের বন্ধুত্ব, সম্পর্ক চুকে যায় আজ থেকে? যদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সত্যটা যে সাহায্য দূরে থাক,

রঘুর কাছ থেকে সহানুভূতি পাবার আশাও তার নেই? অথচ কথাটা আজ স্পষ্ট করে না নিলেই বা তার লাভ কি! রঘু যদি তাকে বরবাদ করেই থাকে, সেটা জানলে তার কি আর বেশী ক্ষতি হবে?

এলোমেলো ছাড়া ছাড়া কথা হয় দু'জনে। নিজেই হাত বাড়িয়ে গৌর হুঁকোটা নেয়। বলে, 'কদিন চলবে আর এরকম?'

রঘু বলে, 'ভগবান জানে। নিতায়ের মেয়েটা নাকি কোথায় ভেগেছে কাল।'

'মাইরি বলছিস্? কার সাথে গেল?'

'ভগমান জানে। পটল নাকি পেছনে ছিল শুনলাম—সহরে সরিয়েছে।'

বিরজা এসে ঘুরে যায়। ধান কেমন সেদ্ধ হচ্ছে দেখতে। খানিক পরে আবার আসে। মনে কথাটা ধৈর্য ধরে আর সে চেপে রাখতে পারে না।

'কি শলা হচ্ছে শুনি তোমাদের? ধান যদি চাইতে এসে থাকো গৌর ঠাকুরপো—'

গৌর সজোরে মাথা নাড়ে।—'না ধান চাইতে আসি নি।' তারপর অন্তরঙ্গের মত হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'চাই যদি, দেবে না? বল কি গো, আমি চাইলে দেবে না।'

এ যেন তামাসার ব্যাপার!

বিরজা বলে, 'থাকলে কি দিতে অসাধ? কোথায় পাব যে তোমায় দেব! আধপেটা খাচ্ছি সব—মুঠি মেপে চাল নিচ্ছি।'

তবু গৌর কথাটাকে গায়ের জোরে তামাসার পর্যায়ে রাখতে চেষ্টা করে, হাল্কা হাসির ভান করে বলে, 'আমার জন্যেও নিও বৌঠান আজ থেকে। বিশ মুঠো নিও, তাতেই হবে, বেশী চাই না।'

রঘু বলে, 'ধান যদি কিছু যোগাড় করতে পারিস গৌর—'

'যোগাড় কিসের? গোলা ভর্তি ধান রয়েছে।'

'তামাসা নয়! ধান পেলে কিছু কিছু শোধ দিস তোর কাছে যা পাব।'

বিরজা যোগ দেয়, 'একটা পেট তোমার—মা বুড়ী আর কতই বা খায়? তোমার ভাবনা কি বলো। এত লোকের সংসার হলে টের পেতে।'

গৌর তবু হাসে।—'বড়লোকের বড় সংসার। আমার মত বড়লোক যদি হতে— '

মন এদিকে তার পুড়ে যেতে থাকে। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে সে একরকম পালিয়ে আসে রাস্তায়।

দুপুরের রোদে যেন উজ্জ্বলতা নেই, শুধু ঝাঁঝ। দু'চারটি জীবন্ত কঙ্কাল শুধু চোখে পড়ে—মানুষ ও গরু ছাগল, ঘোষেদের কেলো কুকুরটা মরে পড়ে আছে আস্তাকুঁড়ের ধারে। চাঁদকাকা আর কালাচাঁদের শূন্য ভিটে খাঁ খাঁ করছে। চারিদিকে প্রাণহীন স্তব্ধতায় নিজেকে গৌরের আরও বেশী একা, আরও বেশী অসহায় মনে হয়।

মনে হয় চিন্তামণির সঙ্গে যদি ভাব রাখত! প্রাণ খুলে মনের দুটো কথা কয়ে নিজেকে হাল্কা করা যেত একটু। আজ তিন চার মাস চিন্তামণির সঙ্গে সে দেখা করেনি, কথা কয়নি। রঘু আজ যেভাবে বর্জন করেছে তাকে, একরকম এমনি ভাবেই সেও সম্পর্ক তুলে দিয়েছিল চিন্তামণির সঙ্গে। অবশ্য পৈছেটা সে দিয়েছিল চিন্তামণিকে—দামী ভারী একটা পৈছে। সে চাওয়ার আগেই রঘু তাকে জানিয়ে দিয়েছে ধান সে তাকে দিতে পারবে না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মত সেই সঙ্গে ধার দেওয়া ধান শোধ চাইতেও তার বাধে নি।

আচ্ছা, চিন্তামণির কাছে সে যদি পৈছেটা ফেরত চায়? যদি বলে যে এখনকার মত ওটা ফেরত দাও, সুদিন ফিরে এলে আবার তোমায় নতুন পৈছে গড়িয়ে দেব?

বিয়ে করে ঘর সংসার করার সাধ মেটাবে বলে যাকে সে ত্যাগ করেছে, এতকাল একটা খবরও নেয়নি যে বাঁচল না মরল, তার কাছে পৈছে ফেরত চাওয়ার কথা ভাবতে গোরের লজ্জাবোধ হয় না। বরং রঘুর কাছে ধান চাইতে যাওয়ার চেয়ে একাজটা বরং ঢের বেশী সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এমন কি, পৈছে দিতে চিন্তামণি যে অস্বীকার করতে পারে এটা তার খেয়ালও হয় না একবারের জন্য। তার যেন দাবী আছে পৈছেটাতে এবং চাইলেই যেন চিন্তামণি বিনা দ্বিধায় সেটা তাকে ফিরিয়ে দেবে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই এতটুকু। অসঙ্গতিও নেই।

চিন্তামণির সঙ্গে ভাব হবার পর আজ প্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে গোর তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। এমন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে যে বাবুদের বাড়ির খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে বাবুর মেয়েটাকেই অনুরোধ জানায় চিন্তামণিকে ডেকে দিতে।

চিন্তামণি আসে অনেক দেরী করে। একটু রোগা হয়ে গেছে চিন্তামণি। রোগা হওয়ায় আরও যেন সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে, কম মনে হচ্ছে বয়স।

চিন্তামণি এসে গোর মুখ তুলবার আগেই প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'বেশ করেছ এসেছ। তোমায় খুঁজছিলাম ক'দিন থেকে। তোমার গয়না ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

চিন্তামণি পৈছেটা গোরের হাতে তুলে দেয়।

'ফিরিয়ে দিচ্ছ? কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ?'

'যে ব্যাভারটা করলে তুমি, তারপর তোমার জিনিস নেব? চিন্তামণির গলা ধরে আসে, 'মাস কাবারে দেশে ফিরে যাব। তোমার জিনিস তোমার থাক, আমার কাজ নেই ওতে।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে গোর চিন্তামণির হাত চেপে ধরে, মিনতি করে বলে, যে চিন্তামণি যদি তাকে ছেড়ে দেশে চলে যায় সেও তাহলে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে ঘর ছেড়ে নয়তো আত্মঘাতী হবে। আর সে এমন ব্যবহার করবে না চিন্তামণির সঙ্গে। চিন্তামণি মাপ করুক তাকে।

দুপুরবেলা খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে গোরের কথা শুনতে শুনতে চিন্তামণির মনে হয় সে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন মনে হলে রোমাঞ্চ হয় চিন্তামণির।

পৈছের টাকায় কিছুদিন গেল! তারপর গেল জমিজমা ঘরদুয়ার বাসনপত্র। তারপর গেল পুঁটু ও গোরের মা।

চিন্তামণি বলল, 'এখানে থেকে কেন শুকিয়ে মরবে? তার চাইতে চল বড়নিছিপুরে দিদির কাছে যাই। মস্ত কারখানা হয়েছে, তুমি কাজ করবে আমি কাজ করব, একরকম করে চালিয়ে নেব দুজনে মিলে। সেথায় তো, জানা চেনা কেউ নেই তোমার, এক সাথে থাকতে ভয় পাবে না তুমি।'

গোর বলল, 'ভয়? কিসের ভয়? এখানেই একসাথে থাকছি এসো না আজ থেকে।'

আজ গোরের আত্মীয় নেই, ঘরবাড়ি নেই, জমিজমা নেই, পেটের ভাত নেই— কাকে তার ভয়, কিসের তার লজ্জা।

বড়নিছিপুর

বৈন চিন্তামণি,

তুমি আসিতেছ জানিয়া কিরূপে সুখী হইয়াছি তাহা কিরূপে বলিব। মনে খালি ভয় পাই যে তোমার কাঁচা বয়স, পুরুষ রক্ষক না থাকিলে না জানি কি বিপদে পড়িবা!…………

আদায়ের ইতিহাস

এক

বৈশাখ মাস, ত্রিভুবনের জন্ম হইয়াছিল। ছাব্বিশ বছর পরে বৈশাখ মাসেই একদিন তার খেয়াল হইল, এ পর্যন্ত জীবনে সে পাওয়ার মত কিছুই পায় নাই।

সে দিনটা তার জন্মদিন নয়। জীবনের সব প্রথম কান্না সে কোন মাসে কাঁদিয়াছিল, এটা তার জানাছিল বটে; কিন্তু তারিখের কোন হিসাব ছিল না। হিসাব থাকিলে জন্মদিনে মানুষ জন্মমৃত্যুর দুর্বোধ্য রহস্যের কথা হয়তো একটু ভাবে, মনের এলোমেলো খাপছাড়া দার্শনিকতার কষ্টিপাথরের জীবনের দাম কষিবার সাময়িক ইচ্ছাও হয়তো একটু জাগে। ওসব সমস্যা নিয়া ত্রিভুবন আজ মাথা ঘামাইতে বসে নাই! সাধারণ হিসাবে এমন কিছু ঘটেও নাই যে, মনটা তার খারাপ হইয়া যাইবে এবং মনে হইবে এ জগতে সবই ফাঁকি আর জীবনটা তার একদম ফাঁকা। আসলে সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া তখন সে সবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে।

তবে রাত্রে সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিল। বড়ই খাপছাড়া অদ্ভুত স্বপ্ন। তার ছেলেটি যেন মরিয়া গিয়াছে। ছেলের শোকে সে যেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে আর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব টিটকারী দিয়া তাকে বলিতেছে, তার মত মানুষের কি ছেলের জন্য শোক করা উচিত। স্বপ্নে সে অবশ্য সকলের মনের ভাবটা চমৎকার বুঝিতে পারিয়াছিল। ছেলের শোকে পাছে সে পাগল হইয়া যায় অথবা সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় সকলে তার শোককে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতেছিল।

উদ্দেশ্য খুব ভালো সন্দেহ নাই। স্বপ্নে সে কারও উপর রাগ করে নাই শুধু একটু সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল হইয়া শোকের প্রকাশটা আরও জোরালো করিয়া তুলিয়াছিল। কেমন করিয়া সকলকে সে বুঝাইয়া দিবে যে, তারা ভুল করিতেছে, এভাবে তার শোক শান্ত করা যাইবে না; সকলে তার সঙ্গে একটু কাঁদিলেই বরং তার ব্যথা জুড়াইয়া যাইবে, ভাবিয়া স্বপ্নে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিবার পর সকলের উপর সে একটা তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করিতেছে। স্বপ্ন মিলাইয়া গিয়াছে স্বপ্নে, এখন শুধু আছে একটা বেদনামাখা বিস্ময়কর ভার-বোধ এবং সকলের নির্মমতার বিরুদ্ধে অভিমান-ভরা নালিশ।

ছেলে তার নাই। এ পর্যন্ত বিবাহ সে করে নাই। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া তার হাসি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নের কথা সে ভাবিতেছে না, স্বপ্নের প্রভাবটা শুধু তার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

তার কেউ নাই। সকলে তার পর। তার কিছু নাই। কেউ তাকে কিছু দেয় নাই।

সংসার কলরব কানে আসিতেছিল। তাকে বাদ দিয়াই সকলে কলরব করিতেছে।

স্বপ্নের মত সে যদি এখন শূন্যে মিলাইয়া যায়, কারও কিছু আসিয়া যাইবে না, এমনিভাবে কলরব করিয়া চলিবে দিনের পর দিন। এ যে ছেলেমানুষী চিন্তা, ত্রিষ্টুপ তা বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু উপায় কি! চিন্তাগুলি আজ যেন স্বাধীন হইয়া গিয়াছে, এতদিনের ধরা-বাঁধা পথে শিক্ষিত সৈন্যের মত সংস্কারগত নির্দেশের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে রাজী নয়। এ ধরনের আরও কত চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া তার মনে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সংযত করিবার কোন চেষ্টাই কাজে আসিল না।

সাত বছরের একটি মেয়ে দরজার ফাঁকে ডাক দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, 'বারোটা পর্যন্ত ঘুমাবে নাকি মামা, বিছানা ছেড়ে উঠবে না?'

'এদিকে শোন, রাণু।'

রাণু নির্ভয়ে কাছে আসিল। মামা তাকে বড় ভালবাসে। হয়তো কাল রাত্রে বাড়ি ফেরার সময়ে তার জন্যে কিছু কিনিয়া আনিয়াছে, নয় তো তাকে একটু আদর করিবার শখ জাগিয়াছে মামার। মুখে প্রত্যাশার হাসি ফুটাইয়া রাণু কাছে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র ত্রিষ্টুপ সজোরে তার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল।

'ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে, না?'

এ তো আদর নয়, রাগের ভানে খেলার ছলে শাসন করা নয়। চমক ভাঙ্গিয়া আঘাতের বেদনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে রাণুর একটু সময় লাগিল। ততক্ষণে বিছানা হইতে নামিয়া ত্রিষ্টুপ গট্ গট্ করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

একটি ছোট দোতালা বাড়ির একতলায় তাদের অধিকার। ত্রিষ্টুপ ঘুমায় বৈঠকখানায়। দিনের বেলা তার বিছানা ভিতরে টানিয়া আনা হয়, রাত্রে আবার বৈঠকখানায় চৌকিতে বিছানাটি পাতিয়া দেওয়া হয়। ঘরটিতে দোতলার ভাড়াটেদের ভাগ আছে; দিনের বেলা ত্রিষ্টুপ একা ঘরটি দখল করিয়া থাকিলে তারা আপত্তি করে। সারাদিন একটি লোকও তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে কিনা সন্দেহ, তবু তারা সব সময়ে কোন এক অজানা আগন্তুকের প্রতীক্ষা করে এবং কেউ আসিয়া পাছে কিছু মনে করে, এই ভয়ে দিনের বেলা ত্রিষ্টুপের বিছানাটি চৌকির উপর গুটাইয়া রাখিতেও দেয় না।

উঠানের এক কোণে তার দিদি প্রভা টিউবওয়েলের জল তুলিয়া বড় একটা বালতি ভরিতেছিল, ত্রিষ্টুপকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'রাণু কাঁদছে কেন রে?'

ত্রিষ্টুপ গম্ভীর মুখে বলিল, 'মেরেছি।'

'কেন, কি করেছিল মেয়েটা?' কৌতূহলের বশেই প্রভা কথাটা জিজ্ঞাসা করিল, অনুযোগের জন্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া ত্রিষ্টুপ যেন ক্ষেপিয়া গেল।

'অত কৈফিয়তে তোমার দরকার? খুসী হয়েছে—মেরেছি।'

প্রভা খানিকক্ষণ অবাক হইয়া ভায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ত্রিষ্টুপ তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া রান্না ঘরে গিয়াই দাবী জানাইল, 'আমার চা কই?'

মা খুন্তি দিয়া তরকারী নাড়িতেছিলেন, বলিলেন, 'এই যে করে দি। এত বেলা করে উঠলি, চা-ই বা খাবি কখন, চান করে খেতেই বা বসবি কখন। ও'র সঙ্গে তো যেতে হবে তোকে?'

'না।'

'তোর বুঝি দেরীতে অফিস? তা হোক, ও'র সঙ্গেই তুই যা বাবা, প্রথম দিনটা। তিনি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারেন।'

'আমি চাকরী করব না।'

কথা শুনিয়া মা হাতের খুন্তি উঁচু করিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর পঁচাত্তর টাকা বেতনের এই চাকরীটি জুটিয়েছে, আজ তার ছেলে প্রথম চাকরীতে যোগ দিবার কথা, এখন সে বলিতেছে চাকরী করিবে না! প্রথমটা মা থতমত খাইয়া গেলেন। তারপর মনে করিলেন তাই কি কখনও হয়? ছেলে তার সঙ্গে দুষ্টামি করিতেছে।

'নে খুব হয়েছে, আর ফাজলামি করে না! প্রভাকে ডাকতো, তোকে খেতে দিয়ে চা'টা করুক।'

গামছা কাঁধে ত্রিষ্টুপের বাবা অবিনাশ তেলের খোঁজে রান্নাঘরে আসিলেন। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, এখন আর চা খেতে হবে না চান করে ফ্যাল। সাড়ে আটটা বেজে গেজে, ন'টা পঁচিশের গাড়ীটা ধরতেই হবে। আজ ফিরবার সময় মানথলিটা করে ফেলিস কিন্তু, ভুলিস না।'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'আমি যাব না বাবা!'

'যাবি না? যাবি না মানে?'

'চাকরী করা আমার পোষাবে না।'

অবিনাশ তেলের বাটি হইতে হাতের তালুতে তেল ঢালিতেছিলেন, খানিকটা তেল মাটিতে পড়িয়া গেল। মার হাতের খুন্তি আবার কড়াই-এর অনেকখানি উঁচুতে নিশ্চল হইয়া রহিল।

প্রথম কথা কহিলেন অবিনাশ।—'কি বলছিস তুই পাগলের মত?'

এমন সময় রাণুর হাত ধরিয়া প্রভা সেখানে আসিল। রাণুর গালে ত্রিষ্টুপের আঙ্গুলের দাগ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! মেয়েটা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, ঠিক স্বপ্নে ত্রিষ্টুপের ছেলের শোকে কাঁদার মত। প্রভার মুখ মেঘে ঢাকা আকাশের মত অন্ধকার। মেয়ের গালটি সকলের সামনে ধরিয়া সে বলিল, 'দ্যাখো বাবা, কেমন করে মেরেছে মেয়েটাকে। বেলা হয়ে গেছে, আজ আবার আপিস যাবে, আমি তাই মেয়েটাকে বলেছিলাম তোর মামাকে ডেকে দে তো রাণু। ও গিয়ে যেই ডেকেছে, অমনি মেরে একেবারে খুন করে দিয়েছে। ওর কি দোষটা? তোমরাই বল ওর দোষটা কি? বিশেষ দু'টি খেতে পরতে দিচ্ছে বলে—' প্রভা নিজেও ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রভার নালিশ ও কান্না সকলের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, বিশেষ বিচলিত কেউ হয় না! সারাদিনে অন্ততঃ একবার প্রভার নালিশ ও কান্না না শুনিলেই বরং সকলে একটু আশ্চর্য হইয়া ভাবে, কি হইয়াছে প্রভার আজ? তবে এক হিসাবে প্রভার মন খুব উদার, একটি ধমকেই সে সন্তুষ্ট হয়, কান্না থামিয়া যায়, ঘ্যান-ঘ্যান প্যান-প্যান করে না। কেবল ধমকটা দিতে হয় কতকটা এই ভাবেঃ চুপ কর প্রভা, কি বকছিস তুই পাগলের মত? তুই কি পর এসেছিস্ এ বাড়িতে, কুটুম এসেছিস্?'

আজ কেউ ধমক দিল না, কিছুই বলিল না! প্রভা আশ্চর্য হইয়া সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তার মেয়ের গালে চড় মারার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে বুঝিতে পারা মাত্র কৌতূহলের বন্যায় অভিমান ভাসিয়া গেল।

'কি হয়েছে মা?'

'হয়েছে আমার অদৃষ্টে আমার পোড়াকপাল।'

কি হইয়াছে বুঝা গেল না বটে, কিন্তু ভয়ানক কিছু যে সত্যই হইয়াছে, সে বিষয়ে

আর সন্দেহ রহিল না প্রভার। ধৈর্য ধরিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জলভরা চোখের সে দৃষ্টি কামিনী বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন, 'তিষ্টু চাকরী করবে না বলছে।'

'ও, এই! তিষ্টু ফাজলামি করছে।'

প্রভার স্বামী রমেশের আজ চাকরী নাই তিন বছর, প্রভা ভাবিতেও পারে না মানুষ চাকরী পাইয়াও বলিতে পারে, সে চাকরী করিবে না।

বাপের সঙ্গে এ ধরনের ফাজলামি করা ত্রিষ্টুপের স্বভাব নয়, তবু অথই জলে পড়িলে মানুষ যেমন হাতের কাছে যা পায় তাই আঁকড়াইয়া ধরে, অবিনাশ ও কামিনীও তেমনি প্রভার কথা শুনিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আশ্চর্য কি, সকলকে একটু চমক দেওয়ার জন্য ত্রিষ্টুপ হয় তো ফাজলামিই করিতেছে। ত্রিষ্টুপ কথা বলিল না, সে তখন অবাক্ হইয়া খোলা দরজা দিয়া ওদিকের রোয়াকে একটা তুচ্ছ ঘটনা লক্ষ্য করিতেছিল। রোয়াকে একটি আধপোড়া বিড়ি পড়িয়াছিল, কোথা হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া রমেশ হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিড়িটা কুড়াইয়া নিয়াছে। বিড়ি নিয়া রমেশ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, সেখান হইতে ডাক আসিল রাণুর। ঘরে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাণু ফিরিয়া আসিল।

'দেশলাইটা দাও না দিদিমা, বাবা চাচ্ছে।'

আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া খায়, তিন বছরে রমেশের এমন অবস্থা হইয়াছে? প্রভার জন্য ত্রিষ্টুপ হঠাৎ গভীর মমতা বোধ করে। রমেশকে আজ আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া বেড়াইতে হয় বলিয়াই তো প্রভা সারাদিন নালিশ করিয়া কাঁদিবার অজুহাত খোঁজে। আর কয়েক বছর পরে দু'জনের অবস্থা কি দাঁড়াইবে কে জানে!

অবিনাশ আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না, একবার একটু কাসিয়া বলিলেন, 'তা'হলে চানটান ক'রে—'

'দাঁড়াও, আসছি।'

ত্রিষ্টুপ একেবারে বাড়ির বাহিরে চলিয়া গেল, গলির মোড়ে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি করা উচিত তার একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য সে এখানে পলাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু ভাবিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছে না! দ্বিধা ও সন্দেহে সমস্ত চিন্তা এলোমেলো হইয়া যাইতেছে। মা ও বাবার জন্য, প্রভা রমেশের জন্য কিছুদিন চাকরী সে করিতে পারে, কিন্তু কেন করিবে? নিজের বিশ্বাস, আদর্শ আর নবলব্ধ প্রেরণা বলি দিয়া লাভ কি হইবে। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রথম বাধার কাছেই যদি সে হার মানে, অত বড় প্রতিজ্ঞা করার দরকার কি ছিল? মন যার এমন দুর্বল, তার অত বাহাদুরি করা কেন নিজের কাছে? খানিক আগে যে স্থির করিয়াছে সে চাকরী করিবে না, পৃথিবী রসাতলে গেলেও করিবে না, এত শীগ্‌গির তাকে বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছে—চাকরী করিবে কি না, আর একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য! সে যে সত্যই অপদার্থ, এর চেয়ে তার বড় প্রমাণ আর কি আছে?

কিছুদিনের জন্য—? নিজের মনেই ত্রিষ্টুপ সংশয়ভরে মাথা নাড়ে। কিছুদিন পরে তো আর অবস্থা বদলাইবে না, বরং সে আরও জড়াইয়া পড়িবে। আজ চাকরী আরম্ভ না করা যত কঠিন মনে হইতেছে, কিছুদিন পরে চাকরী ছাড়া তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে!

তার আর একটা কথা আছে। চাকরী না করিলেই বা এখন সে কি করিবে? বড় একটা আদর্শ সামনে খাড়া রাখিয়া চুপচাপ ঘরে বসিয়া দিন কাটাইলে তো আর চলিবে

না। নিজের জীবনকে সব দিক দিয়া সার্থক করিবার প্রতিজ্ঞা সে গ্রহণ করিয়াছে, মানুষ হিসাবে তার যা প্রাপ্য সব সে আদায় করিয়া ছাড়িবে, জগৎকে বুঝাইয়া দিবে তার কাছে আর ফাঁকি চলিবে না ; কিন্তু সে সম্ভব করিবার জন্য সকলের আগে একটা উপায় তো তার খুঁজিয়া বাহির করা চাই ? ভাবিয়া চিন্তিয়া উপায় স্থির করার সময় অবশ্য সে পায় নাই, কিন্তু সময় পাওয়ার পরেও যদি সে স্থির করিতে না পারে ? যে পথে চলিলে নিচে নামিতে হইবে না, পিছনে হাঁটিতে হইবে না, আগাইতে আগাইতে সার্থকতায় পোঁছিতে পারিবে, সে পথ যদি খুঁজিয়া না পায় ? পথ খুঁজিয়া পাইলেও পথ ধরিয়া চলিবার ক্ষমতা যদি তার না থাকে ?

গভীর বিষাদ অনুভব করিতে করিতে নিজেকে তার বড় একা আর অসহায় মনে হয়। আর নিজের মত জগতের প্রত্যেক মানুষকে একা মনে হয় বলিয়া নিজের অখণ্ড ও অবর্জনীয় একাকীত্বের বোঝা যেন দুঃসহ হইয়া উঠে। কত লোক চলিতেছে পথ দিয়া, কত চিন্তার ঢেউ উঠিতেছে প্রত্যেকের মনে, কিন্তু কেউ কারও চিন্তার খবর রাখে না। কত কাছাকাছি সকলের দেহগুলি, তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া একটি দেহের সঙ্গে আর একটি দেহের কতবার ঠোকাঠুকি হইতেছে, কিন্তু একজনের জগৎ কি এতটুকু কাছে আসিতেছে আর একজনের জগতের ? এমন একটি মানুষও যদি থাকত—যে তার আপন, যার সঙ্গে তার প্রকৃত যোগাযোগ আছে, হাসি-কান্না ছাড়াই যে বুঝিতে পারে সে সুখী কি দুঃখী, এখন তাকে সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত তার কি করা উচিত।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে ত্রিষ্টুপের মনে পড়িয়া গেল, সকালে সে চা খায় নাই, রীতিমত অস্বস্তিবোধ হইতেছে ; ডাইনে বিধুর চায়ের দোকান,—'স্বাধীন ভারত রেস্টুরেণ্ট' এক কাপ চা খাইতে খাইতে আর একবার চাকরীর কথাটা ভাবিয়া দেখা যাক ! তক্তার মত চ্যাপ্টা বিধুর করাতের মত দাঁতাল অমায়িক হাসির জবাবে একটু হাসিয়া, দেওয়ালে জরিপাড় শাড়ী পরা জগদ্ধাত্রীর ছবির পাশে পাকা ফলের মত টস্‌টসে গোলাকার উলঙ্গ জাপানী মেয়ের ছবির দিকে আনমনে চাহিয়া চুমুক দিতে দিতে চায়ের কাপ খালি হইয়া গেল, এলোমেলো ভাবনাগুলিকে কোনমতেই আয়ত্ত করা গেল না।

'কলেজ স্কোয়ারে সস্তায় পাওয়া যায়, তিষ্টু।'

মণীশ কাছে আসিয়া বসিয়াছে, আলগোছে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়া আড়চোখে চাহিয়া আছে। জুতা আর চুলে চকচকে পালিশ, পাঞ্জাবির হাতা গিলাকরা, তলায় গেঞ্জি দেখা যায়, সোনার বোতামগুলি সাদা শূন্যতার মধ্যে টুকরো টুকরো সোনার অলঙ্কারের মত।

'কি পাওয়া যায় ?'

'চীন জাপানের মেয়ে—এদেশীয়ও পাওয়া যায়। কষ্ট করে এখানে না এসে কয়েকটা কিনে এনে ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখিস, সারাদিন যত খুসী দেখতে পারবি।'

মনে মনে বিরক্ত হইলেও, ত্রিষ্টুপ একটু হাসিল !

'তবে একটা বিয়ে করলে, অবশ্য সব হাঙ্গামা চুকে যায়। তাই কর না ?'

এই ধরনের পরিহাস করিতে মণীশ খুব পটু ! বোধ হয় সেইজন্যই মণীশকে সে পছন্দ করে না। মানুষটা মণীশ খারাপ নয় ; সাজসজ্জার দিকে তার অতিরিক্ত ঝোঁকটা ভাল না লাগিলেও, সেটা ত্রিষ্টুপ অপরাধ মনে করে না। মণীশের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, পড়াশোনাও সে অনেক করিয়াছে, ত্রিষ্টুপ বুঝিয়া উঠিতে পারে না সব সময়ে সে কেন এমন বাবু সাজিয়া থাকিতে ভালবাসে। ত্রিষ্টুপের সবচেয়ে খারাপ লাগে, মণীশের অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় আর সবজান্তার ভাব। কিছুই সে যেন গ্রাহ্য করে না

সমস্তই তার কাছে যেন তুচ্ছ। রাজপুত্রের বেশে এই নোংরা চায়ের দোকানে চা খাইতে আসিয়া এখানকার সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে সমানভাবে হাসিগল্প করা আর ছেঁড়া জামা গায়ে চৌরঙ্গীর বড়-সাহেবী হোটেলে খানা খাইতে গিয়া বড় বড় লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যেন তার কাছে সমান। মাঝে মাঝে সে এখানে আসে, বিনা চেষ্টাতে সকলের সঙ্গে মিশ খাইয়া যায়, তবু যেন একটা দূরত্ব ও ব্যবধান কোন সময়েই ঘোচে না। ঠিক অহংকার নয়, মানুষগুলিকে অবজ্ঞা করা নয়, এমন একটা নির্বিকার উদাসীনতার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ করিয়া চলা…প্রতিবেশীর নিন্দায়, গুজবের সৃষ্টিতে, ঘরের ব্যাপার সঙ্গে মিশাইয়া পৃথিবীর রাজনীতির আলোচনায়. তর্কে আর কলহ-বিবাদে সকলে যখন মশগুল হইয়া যায় মণীশ তাহাতে যোগ দিতে কসুর না করিলেও, ত্রিষ্টুপের মনে হয় সকলের ছেলেমানুষীতে সে তলে তলে নিছক আমোদ উপভোগ করিতেছে।

দু'দিন আগে বিকেলবেলা পরিতোষ আসিয়াছিল, শোকে মুহ্যমান পরিতোষ। একটি চেয়ারও খালি ছিল না, সকলের আগে নিজের চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মণীশ তাহাকে বসিতে দিয়াছিল। কিন্তু তখনও তার মুখে এতটুকু সহানুভূতির চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। মুখ দেখিয়া বরং মনে হইয়াছিল. সে বুঝি ভাবিতেছে অনেক দূরে নৌকাডুবিতে এক পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে, এখানে একটা মানুষ আধমরা হইয়া যায় কেন!

ভালো লাগে না, কিন্তু মণীশকে তুচ্ছও সে করিতে পারে না। সময়ে সময়ে ত্রিষ্টুপের মনে হয়, আসলে এটা তার ভাল না-লাগা মোটেই নয়, আর দশজনের মত মানুষের সুখ দুঃখ মানুষটাকে বিচলিত করে না বলিয়া তার অভিমান হইয়াছে। তার. প্রতিকারহীন অভিমানের জ্বালাকে মনে হইতেছে বিরাগ।

'মনটা ভাল নেই, মণীশদা।'

'মন ভাল নেই? সে কি কথা? মন খারাপ করেছ কেন?'

'আমি করিনি। ব্যাপারটা শুনুন—'

মণীশ শুনিয়া যায় আর শুনিতে শুনিতে তার মুখ গম্ভীর হওয়ার বদলে যেমন ছিল তেমনি থাকে, হাসি হাসি ভাবটুকু পর্যন্ত মিলাইয়া যায় না। দেখিয়া ত্রিষ্টুপের ভাল-না লাগা অথবা অভিমান উথলিয়া উঠিতে থাকে।

কথা শেষ করিয়া ঝাঁঝালো সুরে সে তাই জিজ্ঞাসা করিল 'হাসবার কি হ'ল?'

মণীষ বলিল, 'হাসি নি। চাকরী করতে চাও না বলছ, বড় কিছু করতে চাও। কি করবে সেটা এখনও ঠিক করো নি। তা যতদিন সেটা ঠিক করতে পারছ না ততদিন চাকরীটা করলে হত না? কিছু পয়সা জমাতে পারলে বড় কিছু আরম্ভ করতে একটু সুবিধা হবে।'

'কিছুদিন চাকরী করলে যদি—'

'ও ভাবে যদির কথা ভাবলে কিছু হয় না তিষ্টু। প্ল্যান করবার সময়ে যদির হিসাব করতে হয়—যদি এরকম হয়, তবে এই ব্যবস্থা করতে হবে, যদি ওরকম হয়, তবে ওরকম ব্যবস্থা করতে হবে; ব্যাস, সেইখানে যদির শেষ। যদি এরকম না হয়ে ওরকম হয়, ভেবে প্রথমেই ভড়কালে তো চলে না! তা'ছাড়া, কিছুদিন চাকরী করে, সময়মত চাকরীটা ছাড়াবার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে, তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে—বড় কিছু করবার ক্ষমতা তোমার নেই। চাকরী করে যাওয়াটাই তখন সবচেয়ে ভাল হবে তোমার পক্ষে।

'কিন্তু চাকরী করলেই জড়িয়ে পড়ব যে। বাড়ির লোকের মুখ চেয়ে চাকরী নেওয়ার মানেই দাঁড়াবে—'

'বাড়ির লোকের মুখ চেয়ে চাকরী নেবে কেন? নিজের জন্য চাকরী নেবে, বড় কিছু করবার অঙ্গ হিসাবে চাকরী নেবে। কি করব, এখনও ঠিক করতে পারিনি, চাকরী করে যা পারি উপার্জন করা যাক—এই ভেবে চাকরী নেবে। বাড়ির লোকের মুখ চেয়ে বড় কিছু করা যায় না, তিষ্টু। সাক্‌সেসের জন্য স্বার্থপর না হলে চলে না। অবশ্য বাড়ির লোকের মুখ কেন, পৃথিবীর লোকের মুখ চাইতে কোন বারণ নেই, সকলকে বঞ্চিত করে নিজের সুখ খোঁজার স্বার্থপরতার কথা বলছি না—সাক্‌সেসের পথে বিঘ্ন হিসাবে যা কিছু দাঁড়াবে, সে সমস্ত বিসর্জন দেওয়ার কথা বলছি। যেমন ধর—তুমি যেদিন চাকরীটা ছেড়ে দেবে, বাড়ির লোক সেদিন কেঁদে-কেটে চোখ ফুলিয়ে ফেলবে, তুমিও তাদের সঙ্গে কাঁদবে, অন্ততঃ মনে মনে কাঁদবে। কিন্তু ভাববে, কাঁদুক, উপায় কি!'

সাড়ে দশটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বাড়ি ফিরিল। অবিনাশ রান্নাঘরের দরজার কাছে মোড়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, তখন পর্যন্ত তিনি স্নানও করেন নাই।

'আপিস যাওনি যে?'

'লজ্জা করে না তোর? যোয়ানমদ্দ তুই ঘরে বসে থাকবি, বুড়ো বয়সে আমি খেটে মরব? তুই যদি না যাস, আমিও আর যাব না।'

'চল, চল আমি যাচ্ছি।'—এক খাব্‌লা তেল নিয়ে মাথায় ঘষিতে ঘষিতে ত্রিষ্টুপ তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেল।

বড়বাবু পদ্মলোচন অভিমান করিয়া বলিলেন, 'প্রথম দিনটাতেই দেরী হল!'

অবিনাশ কাচুমাচু করিয়া বলিলেন, 'মন্দিরে একবার পুজো দিতে গিয়ে—'

পদ্মলোচন তাড়াতাড়ি কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, 'তা বেশ, তা বেশ।'

ত্রিষ্টুপ অবাক্ হইয়া দু'জনকে দেখিতে থাকে। একজনকে অনায়াসে মিথ্যাকথাটা বলিয়া ফেলিল; পুজো দিতে গিয়া আপিস পেঁছিতে দেরী করার জন্য বিরক্ত হইলে পাছে অপরাধ হয়, এই ভয়ে আর একজনের বিরক্তি সঙ্গে সঙ্গে উপিয়া গেল। দু'জন সমবয়সী নিরীহ গোবেচারী মানুষ, জীবনটাও হয়তো দু'জনের একই ছাঁচে ঢালা—পরীক্ষা পাস, চাকরী ও সংসার—কিন্তু একজন মন্দিরের নামে মিথ্যা বলিতে ভয় পায় না, আর একজন মন্দিরের নাম শুনিলেই ভড়কাইয়া যায়।

আপিস ত্রিষ্টুপের অপরিচিত নয়, আগে মাঝে মাঝে দরকার পড়িলে বাপের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; চাকরী হওয়ার সময়ে বিনা দরকারেই ঘনঘন অনেক বার আসিয়াছে। অনেকের সঙ্গেই তার চেনা ছিল, অবিনাশ আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন—প্রত্যেকের ভদ্রতা ও শুভ কামানার জবাবে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, 'আপনার দয়া।'

বাড়ি ফিরিবার সময় ট্রামে ও ট্রেনে অবিনাশ ছেলেকে অনেক রকম উপদেশ দিলেন, আপিসে কোন্ লোকটা ভাল আর কোন্ লোকটা বজ্জাত মুখে মুখেই তার লম্বা তালিকা শুনাইয়া দিলেন; কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিতে হইবে তাও বুঝাইয়া দিলেন।

'—আস্তে আস্তে ডিপ্লোমেসী শিখতে হবে, নইলে উন্নতির কোন আশা নেই বাপু! দেরী করার জন্য পদ্মলোচন চটে ছিল, দেখলি তো কেমন সামলে নিলাম?'—অবিনাশ সগর্বে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন—'অন্য কেউ হলে কেঁউ কেঁউ করত, ব্যাটা

আরও চটে যেত, আমি তো জানি কত ধানে কত চাল, এমন কৈফিয়ৎ দিলাম যে আর টুঁ-শব্দটিও করতে পারল না !—একটু থামিয়া উপসংহার করিলেন, তবে লোকটা সত্যি ধার্মিক। মন্দির দেখলেই আধঘণ্টা ধরে প্রণাম করে।

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'আর প্রার্থনা করে, আমার মাইনে বাড়ুক ?'

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'সে তো সবাই করে !'

বিধুর চায়ের দোকানে মণীশ বসিয়াছিল। সূর্য চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এত আগে মণীশ কখনও বিধুর চায়ের দোকানে আসে না।

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'তুমি এগোও বাবা, আমি আসছি।'

চায়ের দোকানে ঢুকিতে যাইতেছে দেখিয়া অবিনাশ শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, 'খালি পেটে চা খেও না তিষ্টু।'

ত্রিষ্টুপ মাথা নাড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মণীশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগিল তিষ্টু ?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'কেমন যেন লাগল, মণিদা।'

'কেমন লাগল বুঝতে পারছ না ? তার মানে ভালও লাগেনি, খারাপও লাগেনি।'

'সব যেন কেমন খাপছাড়া মনে হল।'

মণীশ মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, 'বোস, চা খাও।'

ত্রিষ্টুপ দ্বিধাভরে বলিল, 'খালি পেটে—'

মণীশ হাসিল, 'পেট খালি থাকবে কেন ? চপ খাও, কাটলেট খাও, টোস্ট খাও,—বাড়ির খাবার না হলে কি তোমার পেট ভরে না ?'

মণীশের কাছে চিরদিন নিজেকে ত্রিষ্টুপের ছেলেমানুষ মনে হয়, আজ আরও বেশী মনে হইতে লাগিল। একটু শ্রান্তিও সে বোধ করিতেছিল, শারিরীক নয়, মানসিক শ্রান্তি।

সন্ধ্যে হইয়া গিয়াছে, তবু সকালবেলার লড়াই-এর জের যেন এখনও মেটে নাই, কেবলি মনে হইতেছে, সে যেন সন্ধি করিয়াছে হার মানার ভয়ে। কেমন একটা অনির্দিষ্টভাবে নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছে।

'থাক্‌, দোকানের খাবার খেতে হবে না তিষ্টু। আমার বাড়িতে কিছু খাবে চল।'

'আপনার বাড়ি মণীশদা ? খাবার-টাবার করার হাঙ্গামা—'

'হাঙ্গামা আর কিসের ? খাবার তৈরী হয়েই আছে, চা'টা শুধু করতে হবে।'

মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইল।—'এস।'

মণীশের বাড়ি বেশী দূরে নয়, দু'চারবার ত্রিষ্টুপ তার বাড়িতে গিয়াছে। আগে কোনদিন মণীশ তাকে ভিতরে ডাকে নাই একবার দোতলায় তার নিজের ঘরে নিয়া গেল।

'বস তিষ্টু।'

একটা রঙ্‌চটা কাঠের চেয়ারে বসিয়া ত্রিষ্টুপ বিস্ময়ের সঙ্গে চারদিকে চাহিতে লাগিল। এ ঘর যে মণীশের, তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। যার মাথায় একটি চুল সে কোনদিন স্থানভ্রষ্ট দেখে নাই, তার ঘরে এমন বিশৃঙ্খলা এমন দারিদ্র্যের ছাপ।

টেবিলে আর টেবিলের নিচে বই গাদা করা, এক কোণায় জমা করা কতকগুলি ইংরাজী বাংলা সাময়িক পত্রে ধুলা জমিয়া আছে, ট্রাঙ্ক ও সুটকেশটির রঙ বিবর্ণ, অনেক দিনের পুরানো খাটের বিছানায় চাদরটা ময়লা। নূতন সোফা-টেবিলে

জমকালো বাহিরের ঘর পার হইয়া বাড়ির ভিতরের গরীবানা অপরিচ্ছন্ন চেহারা দেখিয়াই ত্রিষ্টুপ একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল, মণীশের নিজের ঘর দেখিয়া সে একেবারে থ বনিয়া গেল।

তাকে বসিতে বলিয়াই মণীশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। একটু পরেই সে ফিরিয়া আসিল। আরও খানিকক্ষণ পরে দু'হাতে দুটি থালায় লুচি আর তরকারি নিয়া একটি মেয়ে ঘরে আসিল।

মেয়েটিকে ত্রিষ্টুপ কলতলায় বাসন মাজিতে দেখিয়াছিল।

দুই

মণীশের বোনের নাম কুন্তলা। বিবাহ-দেওয়া-দরকারের বয়স হইয়াছে—দু-এক বছর বেশীই হইয়াছে। এই বয়সে সময় হিসাবে দু-এক বছর যে কত দীর্ঘ আর অ-তুচ্ছ কে তা না জানে? দাদা যে ত্রিষ্টুপকে বাড়িতে ডাকিয়া আনিয়াছে কেন সেটুকু বুঝিবার মত আর বুঝিয়া যে জোরালো লজ্জা সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া দিতে চায়, সেটা জোর করিয়া লুকাইয়া রাখার চেষ্টা করার মত জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কুন্তলার জন্মিয়াছে।

প্রথমটা তাই ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, মেয়েটা বুঝি একটু পাকা। তারপর দু-চার দিনেই এ ভুল ধারণা তার ঘুচিয়া গিয়াছে। কুন্তলার চাল-চলন কথাবার্তায় যেটুকু অস্বাভাবিকতা ধরা পড়িয়াছিল, এখনও কিছু কিছু ধরা পড়ে, সাধারণ গৃহস্থ সংসারের এই বয়সের দেয়াল-চাপা ভীরু মেয়ের পক্ষে ওটুকু অস্বাভাবিকতাই স্বাভাবিক। তৃতীয়বার কুন্তলা যখন খাবারের থালা হাতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন ত্রিষ্টুপের খেয়াল হইয়াছিল যে বেচারী জানে, তাকে পছন্দ করাইতে পারিলে সে তাকে বিবাহ করিলেও করিতে পারে। পঞ্চম বার মণীশের বাড়িতে গেলে কুন্তলা যখন চলনসই কাঁপা গলায় রবিবাবুর একটি গান শুনাইয়াছিল তখন ত্রিষ্টুপের আরেকটা বিষয় খেয়াল হইয়াছিল ; তার মন ভুলানোর চেষ্টার মত কিছু পাছে বলিয়া বা করিয়া বসে এই ভয়ে কুন্তলা বড়ই কাবু হইয়া গিয়াছে।

ত্রিষ্টুপ মমতা বোধ করে। ভাবে যে মণীশের বাড়িতে আর আসিবে না। এভাবে মেয়েটাকে পীড়ন করা, তার মনে মিথ্যা আশা জাগিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। কেবল কুন্তলা নয়, মণীশও তো অনেক কিছু আশা করিতেছে। তাকেও এ আশা পোষণ করিয়া চলিতে দেওয়া অন্যায় বৈকি।

আগে হইতে যদি মণীশের বাড়িতে তার যাতায়াত থাকিত, তবে কোন কথা ছিল না। চাকরী হওয়ার পর তার কাছে বোনকে গছানোর ইচ্ছা মণীশের জাগিয়াছে টের পাইয়াও ওদের বাড়ি যাওয়া আসা বজায় রাখা দোষের হইত না। কিন্তু চাকরী আরম্ভ করার দিন তাকে বাড়িতে ডাকিয়া নিয়া গিয়া কুন্তলার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার মধ্যে মণীশ তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট রাখে নাই। জানিয়া শুনিয়া এখন ঘন ঘন মণীশের বাড়ি যাওয়া চলে না।

কিন্তু দু'দিন যাওয়া বন্ধ রাখিয়াই ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, কাজটা সহজ নয়। সন্ধ্যার পর মণীশের ছোট ভাই ক্ষিতীশ আসিল। কুন্তলা নয়, মণীশের মা নিজে

পিঠা তৈরী করিয়াছেন, এখনও ত্রিষ্টুপ যায় নাই কেন? অবিলম্বে ক্ষিতীশের সঙ্গেই সে যেন গিয়া হাজির হয়।

'ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে, চলুন শীগগির।'

ত্রিষ্টুপের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল।

'ক্ষিতু তোমাকে কে বলল ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে?'

ক্ষিতীশ একটু ভড়কাইয়া গেল, বড় বড় চোখ মেলিয়া ত্রিষ্টুপের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'আমি দেখে এলাম যে?'

'ও তুমি দেখে আসছ। দাদা বলতে বলে নি, না?'

ক্ষিতীশ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'দাদা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।'

'কেন?'

ক্ষিতীশের মুখে এবার একটু হাসি দেখা দিল। বড়রা কি বোকার মত কথা বলে!

'পিঠে খাবার জন্য।' ছোড়দি কি বলে জানেন? আপনি শুধু পিঠে খেতে পারেন, আর আমি পারি। দু'টো তিনটের বেশী খেলেই দাদার অসুখ করে।'

এতক্ষণে ত্রিষ্টুপের গাম্ভীর্য কাটিয়া গেল। মনে মনে সে রীতিমত লজ্জাই বোধ করিতে লাগিল। পছন্দ হইলে কুন্তলাকে সে বিবাহ করিতে পারে ভাবিয়া বোনের সঙ্গে তার মেলামেশার ব্যবস্থা করিয়া দিতেও তাকে গাঁথিবার জন্য চালবাজী আরম্ভ করিয়া ব্যাপারটাকে কুৎসিৎ করিয়া তুলিবার মানুষ মণীশ নয়। তার নিজের মনটাই বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তাকে পিঠা খাওয়ানোর জন্য কুন্তলা তার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে; হয়তো পরণে ছেঁড়া ময়লা শাড়িখানি বদলাইয়া একখানা ফর্সা শাড়ী পরিয়াছে—সস্তা সাধারণ শাড়ী, পাছে সে মনে করে যে তার জন্যই সাজগোজ। একবার ত্রিষ্টুপের মনে হইল, পিঠা খাওয়ার নিমন্ত্রণটা রাখিয়া আসে। একেবারে যাওয়া বন্ধ না করিয়া ধীরে ধীরে কমাইয়া আনাই কি ভাল নয়? দুদিন যায় নাই, আজ ক্ষিতীশ ডাকিতে আসিয়াছে, আজ একবার গেলে কি আসিয়া যাইবে? আবার চার পাঁচ দিন একেবারে না গেলেই চলিবে। তারপর ত্রিষ্টুপ ভাবিল, না আজ না যাওয়াই ভাল। যাওয়ার ইচ্ছাটা তার নিজেরই বড় বেশী জোরালো হইয়া উঠিয়াছে, যাওয়ামাত্র সকলে তার আগ্রহ টের পাইয়া যাইবে! কাল পরশু বরং দশ মিনিটের জন্য গিয়া দেখা করিয়া আসিবে, কতকটা ভদ্রতা রক্ষার জন্য দেখা করার মত। আজ নয়।

'আমার শরীর তো আজ ভালো নেই ক্ষিতু, কি করে যাব?'

'অসুখ করেছে?'

'হ্যাঁ অসুখ করেছে।'

ক্ষিতীশ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলে ত্রিষ্টুপ অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিল। মিথ্যা অজুহাতে ক্ষিতীশকে ফিরাইয়া দিবার জন্য নয়, যায় নাই বলিয়া কুন্তলা ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়াও নয়, মণীশের বাড়ির আকর্ষণ অনুভব করিয়া। এত অল্প সময়ের মধ্যেই কুন্তলা যদি তার মনকে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকে, নিজের সম্বন্ধে তার আশা ভরসা করিবার কিছু নাই।

আধঘণ্টা পরে মণীশ আসিল।

'কি হয়েছে তিষ্টু?'

'এমনি শরীরটা একটু—'

'বিশেষ কিছু নয় তো? তবে এসো—দু'টো একটা পিঠে তোমায় খেতেই হবে

ভাই। কাল থেকে আয়োজন করে পিঠে তৈরী হয়েছে, তুমি চেখে দেখে সার্টিফিকেট না দিলে কেউ খুসী হবে না।'

সুতরাং ত্রিষ্টুপ গেল। আগের দিন সহরের অন্য প্রান্ত হইতে স্বামী ও দুটি মেয়েকে নিয়া কুন্তলার দিদি বাপের বাড়ি বেড়াতে আসিয়াছে। পিঠার আয়োজনটা হইয়াছে ওদের জন্যই, ত্রিষ্টুপের জন্য নয়।

কুন্তলার দিদি রমলাকে দেখিয়া ত্রিষ্টুপ আশ্চর্য হইয়া গেল। কুন্তলার চেয়ে সে বয়সে চার পাঁচ বছরের বড়, সাত বছর আগে তার বিবাহ হইয়াছে এবং মেয়ে হইয়াছে দুটি; তবু প্রথমবার তার দিকে তাকাইয়া ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, কুন্তলাই বুঝি শাড়ী গহনা পরিয়া সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া বৌ সাজিয়াছে। যমজ না হইয়াও যে দুটি বোনের চেহারায় এত মিল থাকিতে পারে, ত্রিষ্টুপ কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

কেবল বাহিরের নয়, দুজনের ভিতরের মিলটার যে বিস্ময়কর, প্রথমে ত্রিষ্টুপের কাছে তা ধরা পড়ে নাই। কুন্তলা ভীরু লাজুক নয়; রমলা হাসিখুসী, মিশুক কথা বলিতে পটু। সাত বছরের বিবাহিত জীবন অধিকাংশ মেয়েকেই ভোঁতা করিয়া দেয়, রমলার বেলা ফলটা হইয়াছে যেন ঠিক তার উল্টা। তার অনুভূতি তীক্ষ্ন হইয়াছে, জীবনীশক্তি বাড়িয়াছে, আনন্দ আহরণের ক্ষমতা বাড়িয়াছে। স্ফূর্তি আর উৎসাহের জন্য যেন বিশেষ উপলক্ষ্য দরকার হয় না; জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে উৎসাহের প্রেরণা যেন সঞ্চিত আছে, চয়ন করিয়া নিলেই হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে দুজনের এতখানি পার্থক্য সত্ত্বেও মিলটা ত্রিষ্টুপের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, কুন্তলার সঙ্গে রমলার শুধু বিকাশের পার্থক্য—কিশোরীর সঙ্গে যুবতীর। যে কথায় কুন্তলার মুখে মৃদু হাসি ফুটিতেছে, সেই কথাতেই রমলা হাসিয়া উঠিতেছে উচ্ছ্বসিত ভাবে, যে মমতায় কুন্তলা কচি মেয়েটাকে কোলে নিয়া সন্তর্পণে তার গালে চুমা দিয়া বলিতেছে, কেঁদো না, সেই মমতাতেই রমলা বড় মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া দলিয়া মলিয়া তাকে বুকের সঙ্গে যেন মিশাইয়া দিতে চাহিয়া বলিতেছে, 'কাঁদে না যাদু, মামা বাড়ি এসে কেউ কাঁদতে আছে রে দুষ্টু পাজী সোনা?'

যে সুখদুঃখের হিসাব কুন্তলা ভবিষ্যতে কল্পনায় জমা রাখিয়া ভাবিতেছে, কে জানে আমার কপালে কি আছে, সেই সুখ-দুঃখের স্বাদ নিতে রমলা ভাবিতেছে কে জানে আমার কপালে এত সুখ টিকবে কি না! রমলা সত্য সত্যই সুখী। কেবল নিজে সে সুখী হয় নাই, আরেক জনকেও সুখী করিয়াছে। রমলার স্বামী ধীরেনের শান্ত, পরিতৃপ্ত আনন্দোজ্জ্বল চোখের দিকে চাহিয়া ত্রিষ্টুপের হঠাৎ এক সময় মনে হয় জীবনের হিসাব নিকাশের অঙ্ক-শাস্ত্রটাই কি তবে তার ভুল? তিরাশী টাকার একজন কেরাণী এমন সুখী হইল কি করিয়া?

তিন

ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে—এটা সে পছন্দ করিতে পারিতেছে না। মণীশকে দেখিয়া কোথায় সে নিজেও সুখী হইবে, তার বদলে মন তার বিরূপ হইয়া পড়িতেছে—তিরাশী টাকার কেরাণীর জীবনে সুখ-শান্তির অস্তিত্ব মানিতে সে রাজী নয়। দেখিয়া যা মনে হইতেছে তা সত্য নয়, আসলে এদের দুজনের জীবন দুঃখময়—এ ধারণা সে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

কদিন এদের কথাই সে ভাবিয়া যায়। চিন্তাধারায় প্রতিবাদের মত অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রমের মত দুজনে তাকে পীড়ন করিতে থাকে। চারিদিকে সে দেখিতে পায় মানুষের মুখে দুঃখের কালো ছায়া, দেহে ক্ষয়, জীবনে অপচয়, সংকীর্ণ নিঃস্ব আবেষ্টনীর পোষণ। এই পরিচয়েরই ছাপমারা তার বর্তমান। তাই তো সে ভবিষ্যৎ রচনা করিতে চায়। আজ কিছু নাই, কাল ঐশ্বর্য চাই। এই অবস্থায় ধীরেন ও রমলা আবার কি ধাঁধা সৃষ্টি করিল।

মণীশকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'ধীরেনবাবু বেশ লোক না ?'

'হ্যাঁ ও ভালো মানুষ, খাঁটি।'

মণীশের কথার মানে তার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল কয়েক দিন পরে। নিজেদের সংসারে ধীরেন ও রমলাকে দেখিয়া আসিবার ইচ্ছাটা সে দমন করিতে পারিতেছিল না। রবিবার বিকালে সে সহরের এক প্রান্তে তাদের ছোট একতলা বাড়িতে গিয়া হাজির হইল।

আগের দিন প্রথম রাত্রে অসময়ে ঝড় উঠিয়াছিল। ঝড় উঠিলে, ত্রিষ্টুপ গভীর উল্লাস বোধ করে। ঝড়ের বেগে বাড়ির কাছে সিধা তরুণ আমলা গাছটি যত বাঁকা হইয়া যায়, তার বাঁকা মন যেন অনির্বচনীয় পুলকে ততই খাড়া হইয়া ওঠে। এই সতেজ গর্বিত আনন্দে সাপের মত মনের কোন অন্ধকার কোণে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে, সাপুড়িয়ার বাঁশীর মত ঝড়ের সাঁ-সাঁ আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়া ফণা উঁচু করে। ঝড় থামিয়া যাওয়ার পরেও এই উত্তেজনার প্রভাব মিলাইয়া যাইতে কয়েকদিন সময় লাগে ত্রিষ্টুপের, অনুভূতি রসে ভিজিয়া সজীব হইয়া থাকে।

ধীরেনের বাড়ির অবস্থানটি ত্রিষ্টুপের ভারি ভাল লাগিল। এ সহরতলী পুরানো, সহরের পরিসর বাড়ানোর প্রয়োজনের নূতন সৃষ্টি হয় নাই। পুরানো বাড়িগুলি এলোমেলো ভাবে বসানো, রাস্তা আঁকাবাঁকা। আগাছাভরা বাগানের কয়েকটি টুকরা এখানে ওখানে বসানো আছে। ধীরেনের বাড়ির অদূরে পানার আস্তরণ বিছানো একটি পুকুর। কাছে ও দূরে অনেক নারিকেল গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তায় ছোট ছেলেদের মার্বেল খেলায়, বাড়ির সামনে রোয়াকে বসিয়া বুড় ছেলেদের জটলা করায়, উবু হইয়া বসিয়া এক প্রৌঢ়ের হুঁকা হাতে তামাক খাওয়ায়, ছেলে কোলে এক বাড়ির দুয়ার হইতে বাহির হইয়া একটি আধ ময়লা শাড়ী পরা তরুণীর আরেক বাড়ির দুয়ারে ঢুকিয়া পড়ায়, তার এখনকার শান্ত মানসিক অবস্থার সঙ্গে কেমন একটা আশ্চর্য সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতেছে।

বাড়ির ভিতরে গৃহসজ্জার মধ্যেও একটি সর্বাঙ্গীন সঙ্গীত তার বড়ই তৃপ্তিকর মনে

হইল। এ সব সংসারে বিশৃঙ্খলার চেয়ে বেশী চোখে পড়ে অসঙ্গতি। ভাঙ্গা চৌকির পাশে মস্ত দামী ড্রেসিং টেবিল, পেরেক মারা কাঠের চেয়ারের পিঠে রঙীন সুতার কাজ করা খোল, দামী ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রের পাশে আঠা দিয়া দেয়ালে আঁটা মাসিকের ছবি, ময়লা বিছানার চাদরে ধবধবে পরিষ্কার ওয়ার-পরানো তেল-চটচটে বালিশ, পিঁড়ির সঙ্গে কার্পেটের আসন, সযত্নে সাজানো জিনিষের একটি তাকের নিচেই অযত্নে ছড়ানো জিনিষের আরেকটি তাক। এ বাড়ির গৃহোপকরণে সেই বিসদৃশ বিরোধ নাই, চারিদিকে ছড়ানো একটি বিস্ময়কর সাম্যের ভাব দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়।

ত্রিষ্টুপের মনে হয়, এ ঘর যারা সাজাইয়াছে তাদের সত্যই বুদ্ধি আছে। অতিরিক্ত ঝকঝকে কিছু তারা চায় নাই বলিয়া একেবারে রঙচটা কিছু তাদের রাখিতে হয় নাই। তিনটি ভাঙ্গা চেয়ারের মধ্যে একটি খুব দামী চেয়ারে তাকে বসানোর গৌরব বাতিল করিয়া দিয়াছে বলিয়া চারটি সাধারণ শক্ত চেয়ারের যে কোন একটিতে তাকে নিশ্চিন্ত মনে বসিতে বলিতে পারিয়াছে।

ধীরেন ও রমলা যে আগ্রহের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানাইল, ত্রিষ্টুপের বিশ্বাস করাই কঠিন হইয়া পড়িল যে, তার সবটাই আন্তরিক। তার সঙ্গে এদের পরিচয় শুধু একদিনের। রমলা একবার শুধু তাকে বলিয়াছিল, সে এ বাড়িতে আসিলে তারা খুসী হইবে। ভদ্রতা করিয়া ও কথা কে না বলে? ওই আহ্বানেই কেউ বাড়িতে আসিলে, ভদ্রতা করিয়া কে না খুসী হয়? কিন্তু সে আসায় সত্য এদের যেন আনন্দের সীমা নাই। তার এই অনুগ্রহে তারা যেন কৃতার্থ হইয়াছে।

রমলা বলিল, 'আপনি একদিন আসবেন জানতাম।'

'কি করে জানতেন?'

'অনেকে বলে যায়, কিন্তু আসে না। দু'চার মাস পরে দেখা হলে বলে, সময় পাইনি, বড্ড ব্যস্ত ছিলাম, এবার একদিন নিশ্চয়ই যাব। আপনি তাদের মত নন! সেদিন কথা বলেই বুঝতে পেরেছিলাম।'

ছোট মেয়েটিকে কোলে করিয়া রমলা বসিয়াছে, বড় মেয়েটি চেয়ার ঘেঁসিয়া মার মার পিঠে এক হাত রাখিয়া শান্ত কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। রমলার ভাব দেখিলে সত্যই মনে হয়, ত্রিষ্টুপ আজ ঠিক এই সময়ে আসিবে জানিয়া নিশ্চিন্ত মনে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আগে হইতেই সব কাজ, সব হাঙ্গামা চুকাইয়া রাখিয়াছে। অন্য সমস্ত বিষয়ের চিন্তাও সে এখনকার মত মনের একপাশে সরাইয়া দিয়াছে, তার সবটুকু মনোযোগ এখন অভ্যাগতের প্রাপ্য। সংসারের কোন কাজ, কোন দায়িত্ব যাদের নাই, বাড়িকে কেউ আসিলে তাদেরও ত্রিষ্টুপ এমন স্থির শান্ত একাগ্রভাবে কখনও এক মিনিট আলাপ করিতে দেখে নাই, প্রতি মুহূর্তে রমলা যেন তার আত্মমর্যাদা বাড়াইয়া দিতে থাকে। একজনের প্রথম বাড়িতে আসার অপরিহার্য অস্বস্তি ও সংকোচ আপনা হইতে যেন কোথায় মিলাইয়া যায়।

আজ ত্রিষ্টুপ প্রথম বুঝিতে পারে—অন্যে তুচ্ছ করিলে নিজের কাছে মানুষ কিভাবে তুচ্ছ হইয়া যায়, অন্যে দাম দিলে কিভাবে দাম বাড়ে। জীবনকে রমলা শ্রদ্ধা করে। ধনীকে নয়, মানীকে নয়, গুণীকে নয়, জীবনের প্রতীক মানুষকে সে সম্মানের অর্ঘ দিয়া পূজা করে। তার কাছে থাকিলে ব্যর্থতার ক্ষোভ মানুষের তুচ্ছ হইয়া যায়। কারণ, কিছু না বলিয়াও সে যেন ক্রমাগত বলিতে থাকে, ব্যর্থতা ও সার্থকতার চেয়ে মানুষ অনেক বড়, যে অবস্থায় জীবন যাপন করুক, মানুষ চিরদিনই মানুষ।

রাত প্রায় আটটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বিদায় নিল। পথে এবং বাড়ি ফিরিয়া রাত্রে ঘুম

আসা পর্যন্ত এই নূতন অভিজ্ঞতাই সে মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তিরাশী টাকার এক কেরাণীর জীবন রমলা সুখে ও শান্তিতে ভরিয়া দিয়াছে! অপূর্ণতা তাকে পীড়ন করে না, রমলা তার আত্মগ্লানি জাগিতে দেয় না। দুঃখের ছোঁয়াচ লাগিলে রমলা তাতে নিজের আনন্দে প্রলেপ লাগাইয়া দেয়। এক বিষয়ে হতাশা জাগিলে অনেক বিষয়ে আশা জাগাইয়া রমলা তাকে সঞ্জীবিত করে। যা আছে, তারই সন্তোষে মন ভরিয়া রাখিয়া, বাঁচিবার প্রয়োজনে মাসে মাসে তিরাশী টাকা দানের জন্য দেবতার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিয়া দারিদ্র্যের পেষণ ভুলাইয়া রাখে।

মণীশ বলিয়াছিল, ধীরেন ভালমানুষ, খাঁটি। তাকে কাঁদাইলে সে কাঁদে, হাসাইলে সে হাসে। তাই কি রমলা তার মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? অন্য কোন মানুষ হইলে পারিত না?

এই একটা খটকা ত্রিষ্টুপের মনে জাগিয়া থাকে। রমলাই যে ধীরেনকে সুখী করিয়াছে তাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেটা যে ধীরেনের ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্য সম্ভব হইয়াছে তাও সে বিশ্বাস করিতে পারে না। ধীরেনের পরিচয়ও সে আজ ভাল করিয়া জানিয়া আসিয়াছে। দুর্বল পরনির্ভরশীল হাবাগোবা মানুষ সে নয়। ত্রিষ্টুপের তাই মনে হয় শুধু ধীরেন নয়, যে কোন মানুষকে রমলা সুখী করিতে পারিত; বিকারগ্রস্ত অস্বাভাবিক মানুষ ছাড়া!

তাকেও পারিত।

বিছানায় শুইয়া এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আধা ঘুম আধা জাগরনের মধ্যে ত্রিষ্টুপের চিন্তা ও কল্পনা জড়াইয়া যাইতে থাকে। সে যেন দেখিতে পায়—তাকে সুখী করার জন্য কুন্তলা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। যে রকম একটি ছোট একতলা বাড়িতে রমলা আর ধীরেন বাস করে অবিকল সেই রকম একটি বাড়িতে ঠিক রমলার মত সাজ করিয়া কুন্তলা কাঠের চেয়ারে বসিয়া আছে, তার কোলে একটি শিশু, তার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে আরেকটি মেয়ে।

মণীশের বাড়ি যাওয়া সে বন্ধ করিয়া দিল। ধীরেনের বাড়িতেও আর গেল না। রমলাকে দেখিলে মনে পড়িবে কুন্তলাও তারই মত। ধীরেনের পরিতৃপ্ত মুখ দেখিতে হইবে, মনে হইবে কুন্তলাকে নিয়া এমনি সুখের সংসার পাতিতে কোন বাধা নাই। সে সুখশান্তি চায় না। ধীরেনের মত আনন্দোজ্জ্বল হাসির বিনিময়েও সংকীর্ণ খাঁচায় সে ঢুকিবে না। আর বিচার বিবেচনা নয়, বসিয়া বসিয়া লাভ লোকসানের হিসাব নিয়া মাথা ঘামানো নয়। যা' সে ঠিক করিয়াছে তাই ঠিক। জগৎ চুলোয় যাক।

মণীশ খোঁজ করিতে বাড়ি আসিল না, ক্ষিতীশও আসিল না। দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল, সেই চায়ের দোকান হইতে মণীশ তাকে ডাকিল।

দোকানে এখন ভীড় জমিয়াছে, একটি চেয়ারও খালি ছিল না। দোকানের ছোকরা কোথা হইতে একটা ভাঁজ করা চেয়ার আনিয়া ছোট একটু ফাঁকের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

'একজন আজ একশ টাকা ঠকিয়েছে, তিষ্টু!'

'কে?'

'তুমি চিনবে না। পাল চৌধুরী কোম্পানীর পালবাবু।'

'চিনি। একবার চাকরীর খোঁজে দেখা করেছিলাম।'

'এর একশ লাখ টাকা আছে। আমার একশটা টাকা কি করে আদায় করা যায় বসে ভাবছিলাম।'

ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়া ত্রিষ্টুপ বলিল, 'ও টাকার আশা ছেড়ে দিন। ভেবে আর কি করবেন?'

মণীশ মৃদু হাসিল!—'ভেবে আর কি করব, টাকা আদায় করব।'

টাকার জন্য মণীশকে একটু বিচলিত মনে হয় না। পালবাবু টাকাটা না দেওয়ায় সে যেন খুসী হইয়াছে—আদায়ের জন্য লড়াই করিতে পারিবে। মণীশের প্রকৃতির এই দুর্বল দিকটা ত্রিষ্টুপ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পাওনা আদায়ের জন্য লড়াই করিতে সে যদি ভালবাসে, সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য একজনের সঙ্গে শুধু লড়াই না করিয়া অনেক টাকার জন্য অনেকের সঙ্গে লড়াই করে না কেন? সে কি মনে করে সে যা পায়, তার বেশী আর কিছু তার পাওনা নাই? উপার্জন বাড়ানোর জন্য সে তার অসাধারণ শক্তিগুলি কাজে লাগাইতে অবহেলা করে; কিন্তু কেউ একটি পয়সা ফাঁকি দিলে নির্মল ধৈর্যের সঙ্গে সেই পয়সাটি ছিনাইয়া আনিবার জন্য প্রায় সাধনা সুরু করিয়া দেয়।

'কদিন যাওনি কেন, তিষ্টু?'

'খুব ব্যস্ত ছিলাম।'

'মণীশ আর কিছুই বলিল না। তার আগ্রহের অভাবে তিষ্টুপও একটু আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে রাস্তায় নামিয়া হঠাৎ সে বলিল, 'কুন্তলার যদি বিয়ে দেন—'

ত্রিষ্টুপের দুই কান গরম হইয়া উঠিল। কথায় কথায় মণীশের কাছে কুন্তলার বিবাহ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, বিনা ভূমিকায় এমনভাবে কথা তুলিবার কোন ইচ্ছা তার ছিল না। মণীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

'কুন্তলার বিয়ে দেবেন না?'

'দেবো বৈকি। বিয়ে না দিলে চলবে কেন?

'আমাদের অফিসে একটি ছেলে আছে তার সঙ্গে চেষ্টা করতে পারেন। নরেশ নাম। ছেলেটি বেশ ভাল; বাড়ির অবস্থাও মন্দ নয়। আপনি যদি বলেন—'

মণীশ হাসিমুখে তার একটি হাত ধরিয়া বলিল, 'কুন্তলার বিয়ের জন্য ভেবো না ভাই। যার তার হাতে ওকে দিতে পারব না। আমি ছাড়া ওর জন্য কেউ ছেলে খুঁজে বার করতে পারবে না।'

'এ ছেলেটি—'

'খুব ভাল ছেলে। কিন্তু কুন্তলার সঙ্গে ওর যে বনবে তার ঠিক কি? আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারনি, তিষ্টু। বাংলা দেশের সব মেয়ে ভাল পাত্রটির সঙ্গেও আমি কুন্তলার বিয়ে দেবে না। এমন একটি ছেলে খুঁজে আনব, যার সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে। ছেলের অবস্থা কেমন, স্বাস্থ্য কেমন, চরিত্র কেমন, এ সব দেখার আগে আমি দেখব ছেলের প্রকৃতি কেমন, কুন্তলার সঙ্গে খাপ খাবে কিনা?'

ত্রিষ্টুপ সায় দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ সেটা দেখা দরকার বটে।'

তাড়াতাড়ি কুন্তলার বিবাহ মিটাইয়া দিয়া নিজেকে বাঁচানোর জন্যই সে ভাল একটি ছেলের সন্ধান দিয়াছে, অথচ একটু বিবেচনা পর্যন্ত না করিয়া মণীশ প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া তাকে যেন বাঁচাইয়া দিল। মণীশের কথা শুনিতে শুনিতে যতই তার মনে হইতে লাগিল কুন্তলার উপযুক্ত ছেলে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, ততই যেন মনটা তার হাল্কা হইয়া যাইতে লাগিল।

মণীশ বলিল, 'সব চেয়ে বেশী দরকার। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। তোমাদের হিসাবে ধীরেনের চেয়ে হাজার গুণ ভাল একটি ছেলে রমলার জন্য পাওয়া গিয়েছিল—এখন সে মাসে হাজার টাকা রোজগার করে। আমিই জোর করে ধীরেনের সঙ্গে রমলার বিয়ে দিয়েছিলাম। ভালই করেছিলাম কি বল?'

'আচ্ছা মণিদা, বিয়ের আগে ওদের পরিচয় ছিল?'

মণীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

চার

ঠিক এই অবস্থাতেই ত্রিষ্টুপের দিন কাটিতে লাগিল। জীবনটা মনে হইতে লাগিল একঘেয়ে!

কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল, কোন দিক দিয়া অবস্থার অপ্রত্যাশিত কোন পরিবর্তন ঘটিল না; জিভে খারাপ লিভারের স্বাদের মত ত্রিষ্টুপের মনে জাগিয়া রহিল ভয়ার্ত ব্যাকুলতার বদ গ্লানি। নিজের আলস্য, অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা ও অক্ষমতার জন্য অনুতাপের জ্বালা হইলে তার এতটা কষ্ট হইত না। নিজে সে কিছু করিতেছে না, তা যেন নয়। কিছু করিতে পারিতেছে না, তা'ও নয়। কিছু হইতেছে না। কোন এক অজ্ঞাত অকারণে জীবনের কোন এক অনির্দিষ্ট অনিয়মে, ব্যর্থতা না ঘটিয়াও সার্থকতার অভাবটা স্থায়ী হইয়া যাইতেছে।

আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয় নাই। নষ্ট হইলে বোধ হয় ভালই হইত—কিছুদিনের জন্য নষ্ট হইলে। আগুনে লোহা পোড়ানোর মত এ বিপদ ছাড়া মানুষের চলে না। ত্রিষ্টুপ যে জানে একদিন সে সাফল্য লাভ করিবেই করিবে, এই জানাটাই তাকে ঠাণ্ডা লোহার মত কঠিন করিয়া রাখিয়াছে, নূতন অবস্থার উপযোগী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ সঞ্চয় করিতে দিতেছে না। আগে নিজেকে নূতন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযোগী করিতে না পারিলে, নিজের চেষ্টায় কে নূতন জীবন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে? কিছু ঘটিবে না, এ ভয় ত্রিষ্টুপের নাই। কিছু ঘটিতেছে না বলিয়া ভয়ার্ত ব্যাকুলতার বিশ্রী অনুভূতিটাই শুধু সে বোধ করিতেছে, পথ খুঁজিবার তাগিদ পাইতেছে না। এ তো মনের বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। রাজকন্যা ও রাজকুমারের মিলনে রূপকথার শেষ জানিয়াও কাহিনীর মাঝখানে কুমারের বিপদের পর বিপদ ঘটার সময়ে অসহায় ক্ষোভে কাতর হওয়া চলে। নিজের মনের রূপকথায় নিজের এখানকার দুরবস্থায় ত্রিষ্টুপ অনায়াসে উদ্বিগ্ন হইতে পারিয়াছে।

বেতনের সমস্ত টাকাই ত্রিষ্টুপ বাপের হাতে তুলিয়া দেয়, অবিনাশ পঞ্চাশ টাকা রাখিয়া তাকে পঁচিশ টাকা ফেরত দেন। এটা প্রায় নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ত্রিষ্টুপের মনটা খুঁতখুঁত করে। হাত-খরচের জন্য অবিনাশ তাকে পঁচিশ টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফিরাইয়া দিবেন, কিন্তু সে জানে ওই টাকাটা কাটিয়া রাখিয়া বাকি বেতনটা সে যদি অবিনাশের হাতে দেয়, একটু তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন। টাকার পরিমাণের জন্য নয়, তার দরকার আছে জানিলে সব টাকাই তিনি অনায়াসে ফিরাইয়া দিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথমে তার টাকাগুলি তাঁর হাতে তুলিয়া দেওয়া চাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই ধরনের তুচ্ছ খুঁতগুলি চিরদিন ত্রিষ্টুপকে পীড়া দেয়।

টাকাপয়সা সম্পর্কে আর একটা পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা ত্রিষ্টুপ সঞ্চয় করিয়াছে। চাকরী পাওয়ার পর রমেশ বার তিনেক তার কাছে টাকা ধার করিয়াছে। সাহায্য নয়,—ঋণ, পরে শোধ করিবে। শেষবার সে যখন কুড়িটি টাকা ঋণ চাহিল, ত্রিষ্টুপের হাতে একেবারেই টাকা ছিল না।

'বাবার কাছ থেকে চেয়ে দিচ্ছি।'

'বাবার কাছ থেকে? তা'—আমার নাম ক'রো না কিন্তু ভাই।'

'বাবা তো জিজ্ঞাসা করবেন কি জন্য টাকা চাই?'

'বলো তোমার নিজের দরকার। নয় তো বলো কোন বন্ধু ধার চেয়েছে। আমার নাম করো না, সে ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে।'

রমেশের বেকার অবস্থার জন্য ত্রিষ্টুপের বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। নিজে সে হাতে পাওয়া চাকরী ছাড়িয়া দেওয়ার কথা ভাবে, সে বিশ্বাস করিত না যে চেষ্টা করিলে কোন মানুষের পক্ষে দিন চলার মত সামান্য উপার্জন করা অসম্ভব। রমেশের অবস্থার জন্য রমেশকেই সে দায়ী করিয়া রাখিয়াছে। তবু প্রভার স্বামী যখন চাহিয়াছে, না দিলে চলিবে না। বিরক্তিতে মন ভরিয়া অবিনাশের কাছে টাকা চাহিতে গেল।

অবিনাশ বলিলেন, 'কুড়ি টাকা? কি করবি কুড়ি টাকা দিয়ে?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'দরকার আছে।'

মা বললেন, 'অত খরচে হসনে তিষ্টু।'

অবিনাশ বলিলেন, 'দরকার আছে জানি। কি দরকার আছে শুনি না?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'কি দরকার না জানলে টাকা দেবে না?'

অবিনাশের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। আহত বিস্ময়ে তিনি ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মার হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল।

'টাকা দেব না বলিনি তো, তিষ্টু। টাকা দিয়ে কি করবি তাই শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

ত্রিষ্টুপও তা জানে। অবিনাশের শুধু জিজ্ঞাসা, আর কিছু নয়। কুড়ি টাকার বদলে কুড়ি পয়সা চাহিলেও, এমনিভাবে জানিতে চাহিতেন পয়সাটা কি কাজে লাগিবে। বাড়ির বাহিরে যাইতে দেখিলে যেমন জিজ্ঞাসা করেন সে কোথায় যাইতেছে, এও তেমনি জিজ্ঞাসা।

তার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ছোট-বড় সব খবরই ও'রা রাখিয়াছেন; প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না এমন কিছু তার জীবনে উপস্থিত হইয়াছে, ঐ ধারণাই ওদের নাই। ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিয়া মনটা ত্রিষ্টুপের বড় খারাপ হইয়া গেল। টাকা সে নিক, খরচ সে করুক, সেটা ভিন্ন কথা। কিসে টাকা খরচ করিবে, একটু জানিবার অধিকার তার বাপ-মা দাবী করেন। টাকা যদি সে নষ্ট করিতে চায়, তাও সে করুক। কিছু না বলার চেয়ে সে অনেক ভাল! এ গোপনার মানেই স্পষ্ট ভাষায় তার ঘোষণা করা যে, এতদিন যা করিয়াছ, বেশ করিয়াছ, এখন হইতে আর সমস্ত বিষয়ে তোমরা মাথা ঘামাইতে আসিও না। শুধু অবিনাশের একটি প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করায় আজ মতের অমিল, অবাধ্যতা আর কলহের চেয়েও বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

হাতে দেওয়ার বদলে টাকাটা ত্রিষ্টুপ রমেশের সামনে ফেলিয়া দিল। ইচ্ছা করিয়ানয়, মনে অশ্রদ্ধা থাকিলে, সময় বিশেষে আপনা হইতে সেটা প্রকাশ হইয়া যায়।

রমেশ বলিল, 'শীগ্‌গির তোমার টাকা ফেরত দেব ভাই, এক মাসের মধ্যে। কত যেন হল সব শুদ্ধ?'

টাকাটা ওভাবে ছুঁড়িয়া দিয়া ত্রিষ্টুপ একটু অনুতাপ বোধ করিয়াছিল, রমেশের অমায়িকতা দিয়া অপমান চাপা দিবার চেষ্টায় আবার তার পিত্ত জ্বলিয়া গেল।

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।'

তখন উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া চোখ পাকাইয়া রমেশ বলিল, 'তার মানে? ও রকম বাঁকা করে কথা বলছ যে?'

'বাঁকা করে কি বললাম?'

'বুঝি, বুঝি। আমরাও সব বুঝি। ভাবছ যে ধার বলে নিচ্ছে, তার মানেই তাই। কাজ নেই ভাই তোমার টাকা নিয়ে আমার, বরং কাবলীওয়ালাকে খত লিখে দেব!'

দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ী ফেরামাত্র প্রভা একতাড়া নোট হাতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ত্রিষ্টুপকে দেখাইয়া নোটের তাড়া হইতে পঁচিশ টাকার নোট বাছিয়া সামনে ফেলিয়া দিল।

'তোমার টাকা।'

'সুদ কই?' ত্রিষ্টুপ হাসিবার চেষ্টা করিল। এদের বিকৃত অভিমানের পরিচয় তো সে জানে, কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পাইল না।

নোটের তাড়াগুলি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে প্রভা নিজেই বলিল, 'চিরকাল কারো সমান যায় না। দু'দিন অবস্থা একটু খারাপ হলে কি রকম যে করে সবাই! সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে যেন ফতুর করে দিল।' প্রভার চোখ জলে ভরিয়া যায়, 'মনে থাকবে সব, কত লাথি, ঝাঁটা, অপমান জুটেছে। এতদিন চুপ করে সব সয়েছি, আর তো চুপ করে থাকব না।'

লাথি, ঝাঁটা, অপমান। চুপচাপ সব সহ্য করা। হাসিবে না কাঁদিবে, ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল না। সারাদিন প্রভা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করিল। বাপ-মাকে কাঁদাইল এবং নিজেও কাঁদিল। সকলকে সে আঘাত করিতে চায় না, প্রমাণ করিতে চায় যে, এতদিন সকলের কাছে তার শুধু অনাদর আর অপমানই জুটিয়াছে। রমেশের চাকরী থাকিলে বাপের বাড়িতে দিন কাটানোর সময়ে সকলের কথা ও ব্যবহার তার কাছে সহজ ও স্বাভাবিক ঠেকিত, রমেশের চাকরী ছিল না বলিয়াই সেই কথা ও ব্যবহারের মধ্যেই এতকাল কিছু আবিষ্কার করিয়া সে অভিমান করিয়াছে। নিজেই এই বিকারকে সে সমর্থন করিতে চায়। সেই চেষ্টায় একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড বাধাইয়া দিয়া সে রমেশের সঙ্গে চলিয়া গেল।

রওনা হওয়ার আগে রমেশ অবিনাশকে বলিল, 'আপনার খুব টাকার টানাটানি চলছে শুনছিলাম?'

অবিনাশ বলিলেন, 'কই না? চলে যাচ্ছে এক রকম। তিষ্টুর চাকরীটা হয়ে।'

'আমি কিছু টাকা দিলে কি আপনার অপমান হবে? আমি তো আপনার ছেলের মত।'

অবিনাশের মনে ছিল না; কিন্তু ত্রিষ্টুপের এখন মনে পড়িয়া গেল, রমেশ টাকা ধার চাহিতে আসিলে, তিনি টাকা ধার দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'ধার দিতে পারব না, বাবা। ধার চাওয়াটাও তোমার উচিত হয়নি। তুমি এমনি টাকা চাও! আমার কাছে টাকা নিতে তোমার অপমান কি? তুমি তো আমার ছেলের মত।' ছেলের মত বলিয়া তাকে ধার দেওয়ার বদলে একেবারে দান করিতে

চাওয়ায় রমেশের রাগ হইয়াছিল। এতদিন সেই রাগ মনে পুষিয়া রাখিয়াছে, আজ সেই ঝাল মিটাইতে চায়।

ত্রিষ্টুপের যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। এক বিষয়ে এত তীক্ষ্ন মান অপমান জ্ঞান, এত তেজ, অথচ, সবটাই বিকার। কতকগুলি বিষয়ে মানুষটা সুস্থ ও স্বাভাবিক, আবার কতকগুলি বিষয়ে এমন খাপছাড়া বলিবার নয়। বেকার জীবন কি এমনি সব মানসিক রোগের সৃষ্টি করে?

অবিনাশ আনন্দ ও আবেগে রমেশের হাত চাপিয়া ধরিলেন।—'না বাবা, অপমান কিসের! এখন তো দরকার নেই, দরকার থাকলে তোমার কাছ থেকে নিতাম বৈকি। নিজে চেয়ে নিতাম।

খোঁচাটা বিঁধিল না দেখিয়া রমেশ বোধ হয় একটু ক্ষুন্ন হইয়াই চলিয়া গেল।

কোথায় কি কাজ সে পাইয়াছে, এত টাকা হঠাৎ সে কোথা হইতে পাইল, এ সব স্পষ্ট করিয়া কিছুই তার কাছে জানা গেল না। প্রশ্ন করিয়া পাওয়া গেল শুধু ভাসা ভাসা জবাব। ঠিক চাকরী নয়, এজেন্সীর মত কি যেন তার একটা জুটিয়াছে।

ত্রিষ্টুপের মনে আঘাত লাগিল বৈকি! স্বামীর ধার করা পঁচিশটা টাকা তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া প্রভা তাকে যেভাবে আঘাত করিতে চাহিয়াছিল সেভাবে নয়। রমেশের অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনটাই তাকে যেন ঝাঁকি দিয়া গেল। রমেশ অপদার্থ, জীবনে কোনদিন তার অভাব ঘুচিবে না, এই ছিল মানুষটা সম্বন্ধে তার ধারণা। কেবল পরিবর্তন নয়, নিজের অবস্থার খুব ভাল রকম পরিবর্তনই সেই রমেন করিয়াছে! তার কাছে মনে হইতেছে আকস্মিক, কিন্তু এ উন্নতি হয়তো রমেশের অনেক দিনের চেষ্টার ফল।

স্বামীর সঙ্গে বিদায় হইয়া যাওয়ার তিন চার দিন পরেই প্রভা একবার এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, যাওয়ার দিন যে কাণ্ড করিয়া গিয়াছিল সেজন্য সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে।

ক'দিনের মধ্যে গায়ে গয়না চাপানোর সুযোগ সে পায় নাই, তবে নূতন যে কাপড়খানা পরিয়া আসিয়াছে তার দাম অনেক। তাকে পেঁাছিয়া দিতে গেল ত্রিষ্টুপ। প্রভাই এক রকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। রমেশ একটি সুশ্রী নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েকটা আসবাস কিনিয়াছে দামী দামী। এতদিনের পুরানো জিনিস-পত্রের গায়ে আঁটা দারিদ্র্যের পরিচয়ের মধ্যে স্বচ্ছলতার আরও অনেক চিহ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রভার কপাল ফিরিয়াছে ভাবিয়া এক দিকে ত্রিষ্টুপের বুকটা যেমন হাল্কা হইয়া গেল,—অন্য দিকে রমেশের মত মানুষ যা পারিয়াছে নিজে সে তার চেষ্টা পর্যন্ত সুরু করিতে পারিল না ভাবিয়া মন তার ভারি হইয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল, তার দ্বারা বোধ হয় কিছু হইবে না। সে শুধু কল্পনা করিতে জানে, তার শুধু স্বপ্ন দেখা। নিজে সে অক্ষম, অপদার্থ। নিজের সম্বন্ধে ধারণাটাই শুধু তার বড়।

আত্মবিশ্বাসে আগুন লাগার তাপে পুড়িতে পুড়িতে তার দিন কাটিতেছিল। এক সপ্তাহ পরে রমেশকে পুলিশে ধরিয়া নিয়া গেল এবং প্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল বাপের বাড়ী। ত্রিষ্টুপের মনে হইল, একটা চোখে যেন একদিন তার দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ সেই পুরাতন অন্ধ চোখে নূতন দৃষ্টি আসিয়াছে।

পাঁচ

প্রথম কিছুদিন আপিসের কাজ করিতে ত্রিষ্টুপের ভালই লাগিল। জীবনে এ তার একটা নূতন অভিজ্ঞতা—অনেকের সঙ্গে কলম পিসিয়া পয়সা উপার্জন করা! নূতন সাথী, নূতন আবেষ্টনী। প্রথম কয়েক দিন সে ঘাড় গুঁজিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটানা কাজ করিয়া যাইত, মনোযোগের ছোট ছোট বিরামগুলিতে এই ভাবিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করিত, সে কাজ করিতেছে, কাজ! তার ছোট ঘরখানাতে বিছানায় চিৎ হইয়া দেশবিদেশের চিন্তাবিদ্‌দের ছাপানো মতামতের চিন্তায় মগজ বোঝাই করার ছলে অমন বেকার জীবন যাপন করার বদলে, নিজের চিন্তা কল্পনার জাল বোনার বদলে কিছু একটা কাজ করিতেছে। গৃহের অসুস্থ মনে তার যেন আপিসে চেঞ্জ আসিয়াছে। এ যেন প্রায় মুক্তির সমান।

প্রকাণ্ড একটা টেবিল ঘিরিয়া দশ জন কর্মী বসে; তাদের মধ্যে সে স্থান পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে আরও অনেকগুলি ছোট-ছোট টেবিলে আরও অনেক সহকর্মী আছে। মাঝে-মাঝে চোখ তুলিয়া ত্রিষ্টুপ চারিদিকে তাকায়। ঘরের সোঁদাগন্ধী গরম বাতাসের ঘনত্ব যেন অনুভব করা যায়, দুটি ফ্যান পাক খাইতে খাইতে অবিরাম এলোমেলো আলোড়ন বজায় না রাখিলে বাতাস যেন আরও গাঢ় হইয়া যাইত। দেওয়ালে গা ঘেঁসিয়া বসানো প্রায় ছাদের সমান উঁচু কাঠের তাকগুলিতে গাদা করা কাগজপত্র—কত মানুষের কত দিনকার কত পরিশ্রমের ফল কে জানে!

আপিসের কয়েক জনের সঙ্গে ত্রিষ্টুপের একটু একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে।

'মুগ্ধবোধ নকল করছেন নাকি মুগ্ধ হয়ে?'

ত্রিষ্টুপ মুখ তুলিয়া একটু হাসে। টেবিলের অপর দিকে তার মুখোমুখি বসে সত্যেন। বয়স ত্রিষ্টুপের চেয়ে বেশী নয়—অভিজ্ঞতা বেশী। বছর তিনেক কাজ করিতেছে। একমাথা কোঁকড়া চুলে তার সাধারণ চেহারাটিকে একটু-অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ত্রিষ্টুপের মনে হয়—তার চুলগুলি হঠাৎ ওরকম অসাধারণ হইয়া গেলে লজ্জায় সে কারও কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না।

'হুঁ হুঁ বাবা, মোহমুদ্গরের গুঁতো তো লাগেনি, টের পাবেন!'

ডান পাশে বসে নিকুঞ্জ। বেঁটে মোটা, মাঝবয়সী, ধীর স্থির মানুষ, ছোট ছোট চোখ দুটি কেবল সর্বদা পিট পিট করে। সে নাকি নূতন বিবাহ করিয়াছে, দ্বিতীয়বার। আধময়লা জামাকাপড় পরিয়াই কিন্তু সে আপিসে আসে, কেবল তেলে ভেজা চুলে সযত্নে টেরি-কাটা আর কামানো মুখে স্নো পাউডার লাগানো ছাড়া তার আর কোন বাহার নাই। মাথার সুগন্ধি তেলের গন্ধটা সর্বদাই ত্রিষ্টুপের নাকে লাগে।

'অত স্পীডে কাজ করবেন না মশায়, মারা যাবেন শেষে। যত শীগ্‌গির শেষ করে দেবেন, তত কাজ ঘাড়ে চাপবে। এক দম থই পাবেন না।'

টাইপিস্ট ধীরেন। একটি ফুলস্ক্যাপ শীটে কয়েক লাইন টাইপ করিয়া টাইপরাইটার যন্ত্রের চাবিগুলিতে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে চাবীগুলিতে

বিদ্যুৎবেগে তার আঙ্গুলের সঞ্চালন ত্রিষ্টুপ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু ধীরেন একটানা আঙ্গুল চালায় না, মিনিট দুই-তিন টাইপ করিয়া আট-দশ মিনিট বসিয়া থাকে, গল্প করে আর ইয়ার্কি দেয়। মাঝে মাঝে দশ বিশ মিনিট দ্রুত একটানা টাইপ করিয়া হাতের কাজ শেষ করিয়া, কাগজগুলি ঘণ্টাখানেক ফেলিয়া রাখে, তারপর ধীরে সুস্থে কর্তাদের কাছে পাঠাইয়া দেয়। মন্থর গতিতে সে টাইপ করতে পারে না, আঙ্গুল বাগ মানে না। তিন মাসের মধ্যে আপিস একঘেয়ে হইয়া উঠিল।

এমনিভাবে এক একটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নূতন মানুষের পরিচয় পাইয়া অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সকরুণ অন্তহীন লড়াই দেখিয়া, নিজের জীবনে বৈচিত্র্য আসার আনন্দ ও উৎসাহ ত্রিষ্টুপ অনুভব করিতে লাগিল। বড় কিছু হোক না হোক এ ছোট কাজই বা মন্দ কি? এ কাজেও তো মানুষ মসগুল হইয়া যাইতে পারে।

প্রথম ত্রিষ্টুপের কাছে ধরা পড়িল—কাজ সহজ, অতি সহজ। তারপর ধরা পড়িল—এই সহজ কাজ করিতে তার সময় লাগে দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত, কোন কোন দিন তার চেয়েও বেশী। স্কুলের ছেলে অনায়াসে যা পারে, সেই কাজ করিতে তার এত সময় খরচ হয়।

বাহিরে আকাশ-ছাওয়া মেঘের বর্ষণ চলিয়াছে, দিনদুপুরে ঘরে জ্বালা হইয়াছে আলো। পাখা বন্ধ, হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাসে সোঁদা গন্ধটা ভিজা ভিজা মনে হয়। ঘরের সকলের মুখে ত্রিষ্টুপ চোখ বুলায়—বন্দীত্বের অনুভূতি তাকে যে কষ্ট দিতেছে কারোও মুখে কি তার একটু ছায়া সে দেখিতে পাইবে না? কুড়ি পঁচিশ বয়সের যে সাত-আট জন আছে, তাদের মুখে? মনটা হু হু করিতে থাকে। সে একা, তার কেহ নাই, সকলে তাকে ত্যাগ করিয়াছে। পাওয়ার মত কিছুই সে পায় নাই, জীবনে কোনদিন পাইবে না।

নতুন মাসের গোড়ায় এমনি বাদলার দিনে বেতন পাওয়া গেল। ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন, ধীরেন, আর নিকুঞ্জ তাকে ঘিরিয়া ধরিল।

'কদ্দিন দেনা ফেলে রাখবেন ত্রিষ্টুপবাবু? আজ আর ছাড়ছি না। বেশ বাদলার দিনটা আছে।'

চাকরী হওয়ার জন্য এরা একদিন খাওয়া দাবী করিয়াছিল। ত্রিষ্টুপের মনে ছিল না।

'নিশ্চয়। বলুন কি খাবেন?'

চার জনে সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিতেছে, অবিনাশ পিছন হইতে ডাকিলেন, 'ত্রিষ্টুপ?'

ত্রিষ্টুপ কাছে গেল।

'টাকাগুলো দিয়ে যা, আমার একটু দেরী হবে যেতে।'

'বাড়ী গিয়ে দেব। ক'জন বন্ধু ধরেছে, খাওয়াতে হবে।'

'দুটো টাকা রেখে বাকীটা দিয়ে যা। অতগুলো টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবি? যা অসাবধান তুই! আর শোন,'—অবিনাশ গলা নামাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, 'সংক্ষেপে সেরে দিস, অমন বন্ধু ঢের খেতে চায়। একটা চপ কি কাটলেট আর এক কাপ চা—ব্যস! এক টাকাতেই হয়ে যাবে। তবু দুটো টাকাই বরং রাখ—'

'বাড়ী গিয়ে দেব'খন!

ত্রিষ্টুপ তরতর করিয়া নামিয়া গেল। অবিনাশ আহত বিস্ময়ের সঙ্গে ছেলের দিকে চাহিয়া থ' বনিয়া রহিলেন।

ত্রিষ্টুপ ছাড়া তিন জনেই আজ যেন একটু বেশী উত্তেজনাপ্রবণ। নিজেদের কথা আর হাসি তামাসার মধ্যেই তিন জনে যেন রসের অন্ত পাইতেছে না, বিশেষ করিয়া কেরাণীবাবুদের জন্য পরিচালিত এই সস্তা রেস্তোঁরার চপ-কাটলেট আর চা খাইতে খাইতে জীবনকে উপভোগ করিতে মসগুল হইয়া ত্রিষ্টুপ কথা বলিল, হাসিতেও যোগ দিল, কিন্তু তিন জন ও একজনের দুটি দল মিশ খাইতে পারিল না কোন রকমেই। এবং ত্রিষ্টুপের দলে ফেরার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সকলের উৎফুল্ল ভাবটাও কেমন যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

রাস্তায় নামিয়া তিন জন চুপি চুপি কি যেন বলাবলি করিল নিজেদের মধ্যে, তারপর নিকুঞ্জ বলিল, 'অ, তিষ্টুপবাবু, বলি বাড়ী যাবেন নাকি এখন?'

'কোথা আর যাব বলুন?'

'আমাদের সঙ্গে আসুন না, একটু ফুর্তিটুর্তি করা যাক?'

ধীরেন বলিল, 'মাইনে পাবার পর আমরা একদিন একটু জমাই, ত্রিষ্টুপবাবু।'

'সত্যেন বলিল, 'কাল ছুটিও আছে।'

ত্রিষ্টুপের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। মানুষের সঙ্গে সে মিশিতে পারে না, সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে! সঙ্গীহীন অসহায়ের দুর্বোধ্য ভয়টাও পীড়ন করিতেছিল। উগ্র অন্ধ হিংসায় বন্ধু তিনজনকে আঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

সন্ধ্যার বেশী দেরী নাই। টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষার অতি অমায়িক রূপ ও ব্যবহার। ওরা ফুর্তি করিতে চায়—ফুর্তি! আজ কি তা' সম্ভব? তার পক্ষেও?

নিকুঞ্জ বলিল, 'আমরা চাঁদা করে খরচ দি, যা খরচ হয়, চারজনে সমান সমান দেব। আসবেন?'

'কত লাগবে?'

'গোটা দশেক টাকা, আর কতো?'

দশ টাকা! এক সন্ধ্যার ফুর্তির জন্য দশ টাকা খরচ!

কিন্তু ওরা যদি পারে, সে কেন পারিবে না? হাজার হাজার টাকা সে একদিন উপার্জন করিবে, দশ টাকা খরচের নামে তার চমক লাগে? ধিক্!

'চলুন যাই।'

পরদিন অনেক বেলায় ত্রিষ্টুপের ঘুম ভাঙ্গিল একটা অস্থিরতার মধ্যে। রাত প্রায় একটায় সে বাড়ি ফিরিয়াছিল। বাড়ির সকলে জাগিয়াছিল তার প্রতীক্ষায়। দরজা খোলার পর ভিতরে আলোয় আসিয়া দাঁড়াইলে তার চেহারা দেখিয়া মা চাপা সুরে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন, ত্রিষ্টুপের মনে আছে। অবিনাশ কি যেন একটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দাঁড়ায় নাই, কোনমতে ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পৃথিবীর এলোমেলো টানে পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে দু'হাতে চৌকীর প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ চিৎ হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল। তারপর এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

জলকাদায় পিছল সরু গলিতে ঢোকার পর হইতে সুরু হইয়াছিল তার ফুর্তি—দারুণ ভয়, উদ্বেগ ও প্রত্যাশার উত্তেজনায়। তারপর এক দেয়ালচাপা বাড়ির দোতালায় ছোট একটি ঘর—আলো আর ঠাসা আসবাবে সাজানো ঝলমল অদ্ভুত একটি ঘর। আর একটি মেয়ে—ঘরের মতই যার একটি ছোট দেহে দশটি দেহের গাদা করা

সাজসজ্জা। তারপর নেশা—জীবনে প্রথম মদের নেশা। চাপা কষ্ট আর তীব্র উন্মাদনার অদ্ভুত সমাবেশ—মাটির ভয়ঙ্কর টানে অবলম্বনহীন শূন্যে অবিরাম পড়ার মত শেষের দিকে নিকুঞ্জ ধেই-ধেই নাচিয়া ফুর্তি করিয়াছিল—বেঁটে-মোটা, ধীর-শান্ত নিকুঞ্জ, অল্পদিন আগে যে বিবাহ করিয়াছে দ্বিতীয় বার। কেমন মেয়েকে সে বিবাহ করিয়াছে? কুন্তলার মত?

ঘরের সেই মেয়েটিকেও শেষের দিকে কুন্তলার মত মনে হইয়াছিল। কতবার সেই যে নিজের মাথায় ঝাঁকি দিয়াছে! কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র, কি বীভৎস একটি রাত তার কাটিয়াছে কাল; একটু মদ খাওয়া ছাড়া কিছুই সে করে নাই চুপচাপ বসিয়া শুধু চাহিয়া রহিয়াছে। তবু তার মনে হইয়াছে, মুহূর্তে মুহূর্তে সে যেন উপার্জন করিতেছে এক অক্ষয় অমর সম্পদ। অভিজ্ঞতা নয়, চেতনার জাগরণ নয়, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

মাথা টনটন করিতেছে, সমস্ত শরীরে জ্বর-ছাড়া বিশ্রী অবসন্নতা বোধ করিতেছে। তবু তার আপশোষ নাই। সে ভুলিতে পারিতেছে না যে রহস্যময় জীবনের একটি ধর্ম সে আবিষ্কার করিয়াছে। মৃতপ্রায় মানুষও বিদ্রোহ করে, করিতে পারে। অবস্থার চাপে, শিক্ষা-দীক্ষা আবেষ্টনীর চাপে, স্বাস্থ্যহীন শুষ্ক নীরস একঘেয়ে জীবনের চাপে, মানুষ যত প্রাণহীণ নিস্তেজ হোক, বিদ্রোহের প্রেরণা তার মরে না। তার সহকর্মী তিনজন তাই বেতন পাওয়ার পর মাসে একদিন ফুর্তি করার আর কোন খুঁজিয়া পায় না, তাই এই ভীরু দুর্বল মানুষ তিনটি এইভাবে বিদ্রোহ করে। একঘেয়ে, নিরুপায়, অবসন্ন জীবনযাপনের বিরুদ্ধে, দিনের পর দিন কালের মত সুবোধ সুশীল ভাল মানুষ হইয়া থাকার বিদ্রোহ করে।

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান মাত্র মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, বইয়ের সেল্‌ফটা ধরিয়া ত্রিষ্টুপ ভাবে, তা হোক। এ দুর্বলতা কিছু নয়। মন তার সবল হইয়াছে। আর কোনদিন সে হতাশ হইবে না। হতাশা বোধ করিলেও আসিয়া যাইবে না কিছুই, সে শুধু হইয়া থাকিবে হৃদয় মনের একটা বদ অভ্যাস। যতদিন সে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, তার লড়াইয়ের ক্ষমতা আর কিছুতেই নষ্ট হইবে না। নিজের সমস্ত পাওনা আদায় করার চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন দিন ভালও লাগিবে না।

নিচে নামিতেই সে সামনে পড়িয়া গেল অবিনাশের। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চাহিয়াই নীরবে সরিয়া গেলেন।

রাণু জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার অসুখ করেছে মামা?'

প্রভা খোঁটা দিয়া বলিল, 'তুমিও এমনি করে গোল্লায় যাবে, তা আমি আগেই জানতাম! চাকরী বাকরী করে নিজের ভাগ্নীকে একটা জামা পর্যন্ত যে কিনে দেয় না, মদ না খেলে সে খাবে কি!'

অবিনাশ আড়াল হইতে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'চুপ কর প্রভা, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব। পাড়াশুদ্দু লোককে শুনিয়ে চিল্লাচ্ছেন মেয়ে, বোকা বজ-জাত কোথাকার!'

উনানে কেটলী চাপাইয়া মা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রথমে প্রভাকে বলিলেন, 'জামাই তো চুণকালি দিয়েছে মুখে, ভায়ের একদিনের বদখেয়ালটা চেপেই যা না বাছা?' তারপর কাঁদ-কাঁদ হইয়া ত্রিষ্টুপকে বলিলেন, 'না বাবা, তুই লজ্জা করিস নে। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে ওনার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিবি যা। তোর কিছু দোষ ছিল না, পোড়ারমুখো বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে'—

অবিনাশ ইতিমধ্যে আড়াল হইতে সামনে আসিয়াছিলেন, বলিলেন, 'থাক থাক, ওসব কথা বলে আর কি হবে? টাকা যা আছে, দাও তো ত্রিষ্টুপ। সব উড়িয়ে দাওনি তো?'

ত্রিষ্টুপ সমস্ত টাকা আনিয়া অবিনাশের হাতে দিল। মোটে গোটা তের টাকা কম দেখিয়া অবিনাশ স্বস্তি বোধ করিলেন। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া পাঁচটি টাকা ত্রিষ্টুপকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'দরকার হলে চেয়ে নিও।'

ত্রিষ্টুপ কিছুই বলিল না।

বেলা তিনটার পর জামা কাপড় পরিয়া সে বাহির হইয়া গেল। কুন্তলার দিদির বাড়িতে গিয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিবে। মনটা কেমন অশান্ত হইয়া আছে, ওবাড়ির শান্তিপূর্ণ আবেষ্টনী আর দু'টি শান্ত ও সুখী মানুষের সঙ্গ হয় তো তার মনটাকে শান্ত করিয়া দিবে।

বাহিরে যাওয়ার আগে ত্রিষ্টুপ শুনিয়া গেল মা বলিতেছেন, 'এত বড় সোমত্ত রোজগেরে ছেলে, কদ্দিন থেকে বলি একটা বিয়ে থা দিয়ে দাও—'

আর অবিনাশ বলিতেছেন, 'মেয়ে তো খুঁজছি—'

মেয়ে খুঁজিতেছে, মেয়ে! তার বাপ তার জন্য মেয়ে খুঁজিতেছে! এমন হাস্যকর অশ্লীল ঠেকিল কথাটা ত্রিষ্টুপের কাছে! তার হইয়াছে বয়সকালের রোগ, সেজন্য এই ঔষধ প্রয়োজন। এর বেশী আর কিছু ভাবিয়াছে অবিনাশ? তার মা? মেয়ে খুঁজিয়া আনিয়া দিলে যথানিয়মেই সে প্রিয়া, সাথী, জননী ও গৃহিণী হইবে, এটা জানা কথা। কিন্তু জানা কথাটাও কি মনে পড়িয়াছে ওদের? মেয়ে বলিতে যে মানবজাতীয় জীব বুঝায় তাও বোধ হয় খেয়ালে আসে নাই।

এইভাবে কিছু ভাবিতে গেলেই আগে ত্রিষ্টুপ গভীর জ্বালা বোধ করিত, মনে হইত মানুষ বড় হীন, জীবনে শুধু ক্লেদ! আজ মৃদু আপশোষের সঙ্গে সে শুধু কৌতুক অনুভব করিল। বাড়িতে নাই বলিয়াই যে বাজারে সে মেয়ে ভাড়া করিয়াছে, একথা মনে করার জন্য বাড়ির লোকের উপর রাগ করা চলে না। এরকম করে বৈকি মানুষ, বাড়িতে বৌ থাকিলে পর্যন্ত করে, নয়তো ভাড়া করার জন্য এত মেয়ে সংসারে থাকিত না। তাকে মহাপুরুষ মনে করিবার কোন কারণ বাড়ির লোকের নাই। এটা তার ব্যক্তিগত অপমান নয়। সংসারে এরকম অনুচিত বাস্তবতা থাকাটা মানুষেরই অপমান। একি ভয়ানক কথা যে যুবকদের চরিত্র সম্বন্ধে মানুষকে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়, ধরিয়া রাখিতে হয় যে, গোল্লায় যাওয়াই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক! এই ব্যাপারটাই ত্রিষ্টুপের বড় খাপছাড়া মনে হয়। এরকম অভাব মানুষ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে কেন, মানুষের স্বভাব যাতে বিগড়াইয়া যায়? চরিত্র একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়? তার জন্মের অনেক আগেই এ সব ঠিক করিয়া রাখা উচিত ছিল। এতকাল মানুষ তবে কি করিয়াছে?

এতটুকু ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে যে এসব অভাবের ফল, মাসকাবারের পর আপিসের তিন বন্ধুর ফূর্তি করার বিকৃত সখ এক ধরনের বিকার। কিন্তু তার কতখানি অনুগত আর কতখানি মানসিক অভাব-বোধের চাপ, ঠিক কি ধরনের সেই অভাব এবং তার কারণ কি, এসব সে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ত্রিষ্টুপ ভাবে, অবসর মত দু'চারখানা বই পড়িতে হইবে এ বিষয়ে।

মণীশ বলিল, 'এমন দিশেহারা হলে কিছু হয় না, তিষ্টু।'

'দিশেহারা?'

'তা ছাড়া কি ? আজ ভাবছ, ব্যবসা করে বড় লোক হবে, পর দিন ভাবছ জ্ঞান সঞ্চয় করা বিশেষ প্রয়োজন, আবার সখ চাপছে সমাজের দোষ ত্রুটি সংশোধন করবে, দেশকে স্বাধীন করবে। একটা মানুষ যদি ব্যবসায়ী, বিদ্বান, সংস্কারক, রাজনৈতিক সব কিছু হতে চায়, তার কিছুই হয় না।'

'ওরকম বলেছি নাকি ?'

'একদিন এক কথায় বলনি, নানান দিনের নানা কথাবার্তায় বলেছ।'

ত্রিষ্টুপ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ও কিছু নয়। এ কথা সে কথা মনে হয়েছে বলেছি। কাজের বেলায় যা ধরব তাই করব।'

'কি করবে ? করবে কি করবে না, পারবে কি পারবে না, সে কথা এখন বাদ দিলাম। কি ধরবে ঠিক করেছ, তাই শুনি আগে ?'

মণীশের কথায় মৃদু ব্যঙ্গের সুর ত্রিষ্টুপের কাছে ধরা পড়িল। আগেও মণীশ এই সুরে কথা বলিত, সে ভাবিত এটা তার স্নেহার্দ্র প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গী। সে ছেলেমানুষ বলিয়া মণীশ এভাবে তার সঙ্গে কথা কয়। আজ তার মনে হইল, মণীশ এইভাবে তার কাছ হইতে শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থন প্রার্থনা করে। আপিসে তার উপরওয়ালা নিরীহ অবস্থায় ও একান্ত অনুগত তাকে পিঠ চাপড়াইয়া যেভাবে মিষ্টি সুরে কথা বলেন, তার সঙ্গে মণীশের কথা বলার বিশেষ পার্থক্য নাই।

ত্রিষ্টুপ বিচলিত হইল না। মনের যে পরিবর্তন মণীশের মৃদু তাচ্ছিল্য অনুভব করার ক্ষমতা তাকে আনিয়া দিয়াছে, সেই পরিবর্তনই অনেক কিছু তুচ্ছ করার ক্ষমতাও তাকে দিয়াছে। সে টের পাইয়াছে মণীশের এটা দুর্বলতা।

'কি ধরব ? আমি যা চাই !'

'সেটা কি ?'

'আমার যা নেই, সেই সব।'

'ওতো এক কথাই হল—তোমার যা নেই, তুমি তাই চাও। কিন্তু অভাবের শেষ নেই মানুষের, চাওয়ারও শেষ নেই। দুটো অভাব বেছে না নিলে, তুমি চাইবেই বা কি ? সব অভাব মেটে না মানুষের।'

মণীশ ফস্ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল।

ত্রিষ্টুপ হাত বাড়াইয়া বলিল, 'আমায় একটা দিন।'

সিগারেট দিয়া মণীশ একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে চাহিয়া থাকে। ত্রিষ্টুপের শান্ত নির্বিকার, আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবটা তার কাছে এতক্ষণ ধরা পড়িয়াছে।

নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলিতেছে এমনিভাবে ত্রিষ্টুপ তারপর বলিতে থাকে, 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মণিদা। কিন্তু ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাব না, ঠিক করেছি। ওতে কোন লাভ হয় না। ও বড় গোলমেলে ব্যাপার। ওটা আসলে ভবিষ্যতের হিসাব। কিন্তু একদিন আমি কি চাইব, এখন থেকে সেটা স্থির করে ফেলতে চাই, ধাঁধা লেগে যায়। দশ বছর পরে কি চাইব, আজ কি আমি তা জানি ? কোন একটা আদর্শ ধরতে পারলেও কথা ছিল। কিন্তু আপনি তো আমাকে জানেন, আদর্শের জন্য বেঁচে থাকার ধাত আমার নয়। আমি তাই ভেবেছি, নিজেকে বাঁধব না। আমি ঠিক করেছি, ভবিষ্যৎকে গড়ে উঠতে দেব। আজ আমার কাছে যা সবচেয়ে দামী, সবচেয়ে কাম্য, আমি সেটা পাওয়ার চেষ্টা করব। সেজন্য যদি ভবিষ্যতেও মস্ত কোন পাওয়া ফস্কে যায়, যাবে। বড় ভবিষ্যৎ নষ্ট হবার ভয়ে এতদিন কিছু গ্রহণ করার নামেই আমার আতঙ্ক হয়েছে, যদি বোঝা বেড়ে যায়। এখনও আমি বড় হতে চাই, যদিও ঠিক

জানি না ভবিষ্যতটা কি রকম হলে আমি খুসী হব। কিন্তু সব দিক দিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করার সাধ আমার নেই! এখন থেকেই আমি পাওনা আদায় করতে করতে চলব, মণিদা।'

'সে তো ভাল কথা ত্রিষ্টুপ।'

একটু চিন্তিত ও বিষণ্নভাবেই যেন মণীশ কথাটা বলিল, আজ প্রভাতের অভিনব উপলব্ধি এখন কথায় প্রকাশ করিবার সময়ে ত্রিষ্টুপ মণীশের কাছে সমর্থন পাওয়ার কথা ভাবে নাই, নিজের মনেই বলিয়া গিয়াছে। এখন সে উৎসুক দৃষ্টিতে মণীশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। জানালা দিয়া ঘরে একফালি রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। মণীশ চাহিয়া দেখিতেছে তার সিগারেটের জ্বলন্ত মুখ হইতে নীলাভ ধোঁয়ার আঁকাবাঁকা ঊর্দ্ধগতি। সে যে কি ভাবিতেছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

'এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম মণিদা।'

'আমার কাছে? কি ব্যাপার ত্রিষ্টুপ?'

'আমি কুন্তলাকে বিয়ে করতে চাই।'

মণীশ এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

'তা হয় না তিষ্টু!'

এই অপ্রত্যাশিত জবাবে ত্রিষ্টুপ থমমত হইয়া গেল। অসহায়ের মত প্রশ্ন করিল, 'কেন?'

এতদিন তার জানা ছিল, সে কুন্তলাকে বিবাহ করিবে কি করিবে না, সমস্যা শুধু এই। তার খুসী হইলেই সে কুন্তলাকে বিবাহ করিতে পারে, কারও আপত্তি হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই ধারণা লইয়াই সে এতদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে যে এখন বিবাহ করিয়া জড়াইয়া পড়িলে তার কোন মতেই চলিবে না, তা' কুন্তলাই হোক আর যেই হোক। আজ খানিক আগে মনস্থির করিয়া ফেলিবার সময়ে সে ভাবিতে পারে নাই, কেন মণীশ অমত করিবে।

'বোনের বিয়ে দেওয়া সম্পর্কে তুমি তো আমার মতামত জান ত্রিষ্টুপ। যার সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে, তার সঙ্গেই আমি ওর বিয়ে দেবো।'

ত্রিষ্টুপের মনে হইল—মণীশ যেন তাকে গাল দিয়াছে। তার সঙ্গে বিবাহ হইলে কুন্তলা সুখী হইবে না! সে যে কুন্তলাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে, তাই কি মেয়েটার পরম সৌভাগ্য নয়? মণীশ কি এমনি মূর্খ যে, এই সহজ কথাটা তার কাছে এখনও ধরা পড়ে নাই, তার সঙ্গে বিবাহ না হইলেই চিরদিনের জন্য কুন্তলা অসুখী হইয়া যাইবে? তার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে সুখী হওয়ার উপায় এ জীবনে কুন্তলার আর নাই?

'আমার সঙ্গে কুন্তলা সুখী হবে না?'

'না ভাই। তোমাদের মিল হবে না। ও তোমার যোগ্য নয়।'

মণীশ কি তামাসা করিতেছে তার সঙ্গে? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ত্রিষ্টুপ তার মুখ দেখিয়া মনের ভাব অনুমান করিবার চেষ্টা করে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলে 'আপনি ওর মত জানেন?'

'মত জানি না; মন জানি।'

'তবে?'

মণীশকে আশ্চর্য হইয়া যাইতে দেখিয়া ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, প্রশ্নটা একটু গোঁয়ারের মতই করা হইয়াছে। এটা ঠিক প্রশ্ন হয় নাই, হইয়াছে কৈফিয়ৎ তলব।

কুন্তলার মনের ভাব কি, সে বিষয়ে যেন কারো কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না ; সুতরাং কুন্তলার মন জানিয়াও মণীশ অমত করিতেছে কেন ? হঠাৎ একটা কথা ভাবিয়া ত্রিষ্টুপের বুকের একটি স্পন্দন স্থগিত হইয়া যায়। কুন্তলার মনোভাব সম্পর্কে সে এত নিশ্চিত হইল কিসে ? তার জন্য কুন্তলার হয়তো কোন মাথাব্যথা নাই, সবটা তার নিজেরই কল্পনা ?

'কুন্তীর সঙ্গে কি তোমার কোন কথা হয়েছে, ত্রিষ্টুপ ?'

'না।'

'তবে ?'

মণীশের পাল্টা প্রশ্নে ত্রিষ্টুপ একেবারে নিভিয়া গেল, মৃদুস্বরে বলিল, 'আপনাকেই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'তা করোনি ভাই। তোমার কথা শুনে মনে হল আমার চেয়ে কুন্তীর মন তুমিই ভাল জান। এ তো ভারি মুস্কিলে ফেললে তুমি আমাকে।'

'আমার তাই মনে হয়। অবশ্য আপনি যদি বলেন—'

'আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হবে ? আমি হলাম ওর দাদা, গুরুজন। তুমি ভাববে, আমি কিছু জানি না, বুঝি না, কিন্তু জানলেও কর্তামি করার জন্য ছেলেমানুষী বলে, সব উড়িয়ে দিচ্ছি। তার চেয়ে এক কাজ করি, ওকে ডেকে দি'! তুমি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ।'

ত্রিষ্টুপ অভিভূত হইয়া, 'ও ছেলেমানুষ—'

'তবে ওর মনের কথা তুললে কেন ?'

মণীশের কণ্ঠের রুক্ষতায় আহত হইয়া ত্রিষ্টুপ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

'সেজন্য ছেলেমানুষ বলি নি। আমি বলছিলাম, আপনার অমত আছে জেনে ও হয়তো মনের কথা বলতে পারবে না!'

মণীশ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'জানো তিষ্টু, তোমার মনের এই জটিলতার জন্যই আমি অমত করছি। সহজভাবে কিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতা তোমার নেই। আমার মত আছে, কি অমত আছে, কুন্তী জানবে কি করে ? আজ এসে তুমি প্রথম কথা তুললে। এ বিষয়ে আমরা কখনো আলোচনা করি নি।'

'আমি বুঝতে পারি নি, মণিদা!'

'মুস্কিল তো হয়েছে সেইখানে। সব কথাই তুমি নিজের মত করে' বুঝে নাও। যেভাবে তুমি নিজে বুঝতে চাও সেইভাবে।'

এ ঠিক মন্তব্য নয়, সমালোচনা। নিজের সম্বন্ধে এই স্পষ্ট ও কঠোর সমালোচনা স্বীকার করা বা অস্বীকার করার ক্ষমতা ত্রিষ্টুপের ছিল না। নিজের সম্বন্ধে নিজেরই তার কত সংশয় আছে, কত প্রশ্ন আছে! কি করিবে স্থির করিয়া ফেলার সঙ্গে ওসব দ্বিধা সন্দেহের মীমাংসা তো আর হইয়া যায় নাই। কতদিক দিয়া কতভাবে নিজেকে তার আবিষ্কার করিতে হইবে, তাও কি এখনো সে জানে ? তার সম্বন্ধে কেউ জোরের সঙ্গে কোন মত প্রকাশ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সত্য কি মিথ্যা, ঠিক করিয়া ফেলিবার মত ভাল করিয়া এখনো সে নিজেকে চেনে না! মণীশের কথায় তার মধ্যে শুধু তীব্র একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, নিজেকে পরাজিত, অক্ষম, অপদার্থ মনে হইতে থাকে। নূতন জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা সুরু করিয়া গোড়াতেই সে হার মানিল। তার প্রথম চাওয়া, প্রথম দাবী ব্যর্থ হইয়া গেল। অথচ কত সহজ সে ভাবিয়াছিল কুন্তলাকে পাওয়া!

'আমি যাই, মণিদা।'

পরিচিত ঘরখানা যেন অপরিচিত হইয়া গিয়াছে। ঘরের বাহিরে যাইবে ভাবিয়া সে আগাইয়া যায় দরজার বদলে জানালার দিকে। জানালার কাছে এক মুহূর্ত বিফলের মত দাঁড়াইয়া থাকে, যেন ভুলিয়া গিয়াছে এবার সে কি করিবে। তারপর হঠাৎ সচেতন হইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হয়।

'তিষ্টু শোন।'

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ত্রিষ্টুপ দেখিতে পায় মণীশ চিন্তিতভাবে তার দিকে তাকাইয়া আছে।

'একটু বোসো তিষ্টু।'

ত্রিষ্টুপ নীরবে বসিয়া পড়িল।

'আমি কুন্তীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওকে জিজ্ঞেস কর, ও যদি রাজী থাকে আমি অমত করব না।'

'আপনিই বরং জিজ্ঞেস করুন।'

মণীশ মৃদু একটু হাসিল। সে ত্রিষ্টুপের ক্ষোভকে পরিণত করিয়া দিল ক্রোধে। খেলা করিতেছে, তার সমস্ত জীবন লইয়া মণীশ খেলা করিতেছে!

'না, তোমার জিজ্ঞেস করাই ভাল, তিষ্টু। আমি জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেবে আমি জানি। বলবে, 'আমি কিছু জানি নে দাদা, তোমার যা খুসী কর।'

ত্রিষ্টুপ ভাবিল, বটে! কুন্তলার দাদা-ভক্তি এত গভীর!

'তাছাড়া তোমার কথাটাও একটু ভাবতে হবে বৈকি। তুমি ইচ্ছে করলে আমি যা বলেছি কুন্তীকে জানিয়ে দিতে পার, তিষ্টু। ও রাজী হলে আমি অমত করব না।

'মণীশ চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই কুন্তলা ঘরে আসিল।

'বলুন কি ফরমাস আছে!'

'বোসো, কুন্তলা।'

কুন্তলা বসিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'মণিদাকে বলছিলাম, তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই।'

'ও!' বলিয়া কুন্তলা তার মুখ হইতে দৃষ্টিটা শুধু মেঝেতে নামাইয়া লইয়া গেল।

'তুমি তো জানো আমি তোমাকে—'

'দাদা কি বললেন?' ত্রিষ্টুপের প্রেম নিবেদনে বাধা দিয়া কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল।

'তোমার মত জানতে বললেন।'

ত্রিষ্টুপ জবাবের প্রতীক্ষা করে! কুন্তলা চুপ করিয়া থাকে।

'মণিদা বললেন, তুমি রাজী থাকলে তিনি মত দেবেন।'

'আমি কিছু জানি নে।'

'তুমি রাজী আছো তো?'

'দাদা যা বলবেন।'

ত্রিষ্টুপ কথা খুঁজিয়া পায় না। কুন্তলাকে তার খাপছাড়া, অদ্ভুত মনে হয়। চোখটি শুধু সে নত করিয়া রাখিয়াছে, কোন উত্তেজনার চিহ্নই তার মধ্যে খুঁজিয়া পায় না। কথা বলিতে গলাটি পর্যন্ত তার একটু কাঁপিয়া যাইতেছে না। অতি তুচ্ছ সাধারণ কথা যেন তারা আলোচনা করিতেছে।

'তোমার ইচ্ছেটা আমায় বলো। তারপর মণিদাকে জানাব।'

'আমার কোন ইচ্ছে নেই'

'তোমার ইচ্ছে নেই !

কুন্তলা চোখ তুলিয়া তার মুখে দৃষ্টি বুলাইয়া দেওয়ালের দিকে চাহিল।

'তা নয়। দাদা যা বলবেন তাই হবে! আমায় কেন জিজ্ঞেস করছেন? আমি কিছু জানি নে!'

'তুমি একি কথা বলছ কুন্তলা?'

'কেন?'

'মণিদা কি তোমার ভাল লাগা না-লাগা ঠিক করে দেন? তোমার নিজের সখ নেই, সাধ আহ্লাদ নেই? পছন্দ নেই?'

'তা কেন থাকবে না?'

'আমাকে তুমি পছন্দ কর?'

'এ পছন্দের কথা নয়।'

'ভালবাস?'

'তা জানি না।'

খানিক আগে ঘরটা যেমন অপরিচিত ঠেকিয়াছিল, কুন্তলাকে এখন ত্রিষ্টুপের তেমনি অপরিচিত অজানা অচেনা মনে হইতে লাগিল। কুন্তলা যে কোনদিন তার কাছে এত সহজে বিনা চেষ্টায় এমন একটা ধাঁধাঁ হইয়া উঠিতে পারে, ত্রিষ্টুপ কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

'আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি খুসী হবে?'

'জানি না।'

'তুমি তবে রাজী নও?'

'আমি রাজীও নই, অরাজীও নই। কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন আমাকে? যা বলবার দাদাকে বলুন।'

এ জবারের পর আর কোন কথা চলে না! আর কিন্তু বলার সুযোগও কুন্তলা তাকে দিল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। ত্রিষ্টুপ চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। কি জানা গেল এতক্ষণ জেরা করিয়া? কিছুই নয়? তার সম্বন্ধে কুন্তলার অনুরাগ বা বিরাগ নাই, অন্ততঃ আছে কি না, কুন্তলা নিজে সে হিসাব রাখে না, এটা অবশ্য জানা গিয়াছে। কিন্তু ও জানা জানাই নয়। একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ত্রিষ্টুপকে পীড়া দিতে লাগিল, সে যেন কি একটা ছেলেমানুষী করিয়াছে—কুন্তলার কাছে করিয়াছে। তার নিজের স্বপ্নকে বাস্তব প্রমাণ করার জন্য শিশুর সঙ্গে তর্ক করার মত ছেলেমানুষী!

মণীশ আসিলে সে ঝাঁঝালো গলায় বলিল, 'মণিদা, এমনি করে আপনি বোনদের মানুষ করেছেন?'

'কেমন করে ত্রিষ্টুপ?'

'চারিদিক থেকে মনের আঁটঘাট বেঁধে রেখে? আপনি বলে দিলে তবে কুন্তলা বুঝতে পারে ওর কি ভাল লাগে না!'

মণীশ মৃদু হাসিল। —'তুমি ভুল করছ তিষ্টু! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছ না। কুন্তলার মন স্বাধীনভাবেই গড়ে উঠেছে। আমি শুধু ওর মনে রোমান্স সৃষ্টি হতে দিই নি। ওকে নিয়ে তোমার মনে যে প্রতিক্রিয়া চলছে, ও তা ধারণাও করতে পারবে না।'

ত্রিষ্টুপ উঠিয়া দাঁড়াইল।

মণিদা। আমি কুন্তলাকে বিয়ে করব।'

বলিয়া মণীশকে কথা বলিবাব সুযোগ না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ত্রিষ্টুপের মনে হইল, আবার তার চিন্তাজগতে একটা ওলোট পালোট ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, বন্ধুদের সঙ্গে সেদিন রাত্রে হৈ-চৈ করবার পর যেমন হইয়াছিল। মনের অনেকটা আশ্রয় তার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বড় একটা ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে নূতন দৃষ্টির আলোয় আরও কত ছোট ভুল যে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তার সংখ্যা হয় না। অনেক ধারণা তাকে বদল করিতে হইবে, আয়ত্ত করিতে হইবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, মূল যাচাই করিবার জন্য লিখিতে হইবে নূতন হিসাব-শাস্ত্র।

সবচেয়ে ভয়ানক কথা এবারের ধাক্কায় তার আত্মবিশ্বাস যেন একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

মনে হইতেছে, এ আত্ম-বিশ্বাসের মূল্য কি যা নিজের ভুল ধারণাকেই শুধু প্রশ্রয় দেয়, যা অন্ধ একগুয়েমির সামিল ?

কয়েকদিন মনের এলোমেলো গতির কোন হদিস ত্রিষ্টুপ পায় না। কখনো নিজেকে অকথ্য রকমের বিব্রত ও বিপন্ন মনে হয়, কখনো রাগে গা জ্বালা করিতে থাকে, কখনো হৃদয়ের সমস্ত চাপল্য ডুবিয়া যায় গভীর উদাস ভাবের থমথমে ব্যথিত শান্তিতে।

অথচ নিজের মধ্যে যে পরিবর্তনের জন্য সে অপেক্ষা করিয়া থাকে, সে পরিবর্তন আর আসে না। ভিতরে কেবল তোলপাড়ই চলিতে থাকে। আগের বার পরিবর্তন আসিয়াছিল স্পষ্ট ও সুনির্দ্ধারিত, কি করিবে, কোন পথে চলিবে নিঃসন্দেহে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। কি করিবে জানা থাকিলেও এবার যেন কোন মতেই খেয়াল হইতেছে না কোন পথে চলা দরকার। দিশেহারা ভাবটা কোন মতেই কাটিতেছে না।

কুন্তলাকে সে বিবাহ করিবে।

এটা তার করা চাই। মণীশের মত না থাক, কুন্তলা তাকে পছন্দ না করুক, কুন্তলাকে সে বিবাহ করিবে ! এটা জিদের কথা নয়, গোঁয়ার্তুমি নয়, এই তার সংকল্প। প্রেম চুলোয় যাক, সুখের নীড়ের স্বপ্ন আকাশে থাক। সে পুরুষ, সে কুন্তলাকে চায়। তাই সে কুন্তলাকে বিবাহ করিবে। কুন্তলা তার কাম্য এবং প্রাপ্য—ওকে সে আদায় করিবে। যে ভাবেই হোক।

এ পর্যন্ত কোন গোলমাল নাই। প্রশ্ন শুধু এই—কি ভাবে ? নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব তার জোটে না।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানোর প্রক্রিয়া এখনো না জানায় ত্রিষ্টুপ বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে।

মা বলেন, 'তুই কিছু মনে করিস নে বাবা।'

ত্রিষ্টুপ চমকাইয়া ওঠে, 'কি বলছ তুমি ?'

'বলছি কি, ওঁর নানারকম বাতিক। উনি কি বলেন, কি করেন তাতে তুই রাগ করিসনে বাবা !'

'ও, এই কথা।'

ত্রিষ্টুপ স্বস্তি বোধ করে। প্রথমে তার মনে হইয়াছিল মণীশদের বাড়ী হইতে খবরটা বুঝি এ বাড়িতে আসিয়া পেঁাছিয়াছে এবং মা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। বলিতে আসিয়াছে,ন 'তুই ভাবিসনে বাবা, কুন্তলার চেয়ে লক্ষগুণে সুন্দরী লেখাপড়া গানবাজনা-জানা বৌ তোর জন্যে এনে দেব।'

একবার এক মুহূর্তের জন্য ত্রিষ্টুপের মনে হইল, মাকে বলিলে কেমন হয় ? মার

কাছে তার মনের কথা জানিয়া বাবা যদি মণীশের কাছে নূতন করিয়া বাঙ্গালী প্রথায় আবার প্রস্তাবটা উত্থাপন করেন, কোন ফল হওয়ার আশা আছে কি ?

তারপর মণীশের কথা ভাবিয়া ত্রিষ্টুপের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। অত সহজে মণীশের মত বদলায় না। মণীশ শান্ত, কিন্তু বড় শক্ত। না ভাঙ্গিয়া ওকে মচকানো যাইবে কিনা সন্দেহ! তার চেয়ে বরং রমলার সঙ্গে পরামর্শ করিলে কাজ দিতে পারে।

বিকালে ত্রিষ্টুপ রমলাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য বাহির হইয়াছে, পথের মোড়ে মণীশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। হঠাৎ কি যে খেয়াল চাপিল ত্রিষ্টুপের !

'মণিদা ?'

'কি খবর তিষ্টু।'

কেমন একটু লজ্জা আর অস্বস্তি বোধ হইতেছে, মুখ তুলিয়া মণীশের চোখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না। ত্রিষ্টুপ আশ্চর্য হইয়া গেল, তারও লজ্জা-সংকোচ আছে।

'মা বলছিলেন, কুন্তলাকে একবার দেখতে চান। পাঠিয়ে দেবেন ?'

মণীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

'তুমি কি মাকে বলেছ ?'

'না।'

'তবে হঠাৎ—?'

'কুন্তলার কথা মাঝে মাঝে মাকে বলতাম—এমনি কথায় কথায়। সেইজন্য হয়তো দেখতে ইচ্ছে হয়েছে মেয়েটি কেমন।' গায়ের জোরে মুখ তুলিয়া ত্রিষ্টুপ সোজা মণীশের চোখের দিকে তাকায়, 'হয়তো অন্য কথাও ভাবছেন, বলতে পারি না।'

'আচ্ছা, কুন্তলাকে বলব।'

'আমার কোন মতলব নেই মণিদা।'

'তোমার কি মতলব থাকবে।'

'আপনি যদি কিছু ভাবেন, আপনার যদি ভয় হয় তাই বলছিলাম।'

মণীশ শান্তভাবে সহানুভূতির সঙ্গে বলিল, 'এখনো তোমার মন শান্ত হয়নি তিষ্টু ? এতো ভারি দুঃখের কথা হল।'

ত্রিষ্টুপ প্রাণপণ চেষ্টায় একটা অদ্ভুত হাসি হাসিল। 'না না, ভাববেন না। ওসব কিছু নয়।

রমলাদের বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত সমস্ত পথ ত্রিষ্টুপ শুধু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া গেল, হঠাৎ তার এই পাগলামী করার মানে কি ? মণীশকে মিথ্যা বলিয়া কুন্তলাকে দু'একবার বাড়িতে বেড়াইতে আনিয়া তার লাভ কি ?

নিজের মনের কথাটা নিজের কাছেই ত্রিষ্টুপের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, আর কিছু নয়, মাঝে মাঝে বাড়িতে আনিয়া কুন্তলাকে বশ করিবে। যেন সুযোগ পাইলেই মেয়েদের বশ করা যায়।

তারপর চিন্তাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ওরকম বশ করিয়া কি কোন লাভ হইবে মণীশের বোনকে ? বশীকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরও কি মণীশের বোন বলিবে না 'আমি কিছু জানি নে, দাদাকে জিজ্ঞেস করুন ?' কুন্তলা যে এখন তাকে ভালবাসে না তাই বা কে বলিল ! ভালবাসিয়াও হয়তো সে বলিয়াছে, দাদার কথাতেই তার মরণ-বাঁচন, তার নিজের কোন পৃথক ইচ্ছা নাই।

মণীশকে ত্রিষ্টুপের রূপকথার দানবের মত মনে হয়—তার রাজকন্যাকে সে ঘুম

পাড়াইয়া রাখিয়াছে। এমন ঘুম পাড়াইয়াছে যে, রাজপুত্র আসিয়া জাগাইলেও, সে জাগে না—জাগিয়াও তন্দ্রার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু কুন্তলাকে জাগানো চাই, মণীশের মন্ত্রের প্রভাব ব্যর্থ করা চাই।

যদি চাই—তবে দোষ কি? কি দোষ এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে, যখন তাকে বিবাহ করা ছাড়া উপায় থাকিবে না, তার সঙ্গে কুন্তলার বিবাহ দেওয়া ছাড়া মণীশের কোন উপায় থাকিবে না?

ভাবিলেও ত্রিষ্টুপের মাথা ঝিম-ঝিম করে, গলা শুকাইয়া যায়। দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া সে নির্জন ঘরে, জরাজীর্ণ ট্রামে বাসে, নিজের লড়াই করে। না, এতে কোন দোষ নেই। তার উদ্দেশ্য তো খারাপ নয়, সে তো বিবাহ করিবে কুন্তলাকে। আর কোন উপায় যখন নাই, এ উপায়টি বর্জন করা কাপুরুষতা।

শিশির নামে ত্রিষ্টুপের একজন বন্ধু ছিল, পাড়াতেই বাড়ি। বাড়ির সকলে দেশে গিয়াছে, বাড়িটাও খালি। শিশির কেবল বাড়িতে থাকে, খায় মেসে।

শিশিরের আপিস যাওয়ার সময়ে ত্রিষ্টুপ একদিন সদরের তালার চাবিটা চাহিয়া রাখিল।

'কেন?'

'কাজ আছে।'

'আচ্ছা?' শিশির হাসিতে হাসিতে আপিস চলিয়া গেল।

দুপুরবেলা ত্রিষ্টুপ গেল মণীশদের বাড়ি। মণীশও বাহিরে যাইতেছিল, ত্রিষ্টুপের মুখ দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার জ্বর হয়েছে নাকি তিষ্টু?'

ত্রিষ্টুপ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'না—সাবান দিয়েছি, তাই চুল উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছে।'

'চুল তোমার বেশ চকচক করছে, টেরি ভাঙেনি। মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে তুমি বড় অভিমানী, বড় একগুঁয়ে না?'

'ছিলাম একটু। এখন ভাল ছেলে হয়ে গেছি। কুন্তলাকে নিয়ে যেতে এসেছি মণিদা।'

মণীশ এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে। প্রসন্ন শান্ত দৃষ্টিতেই সে ত্রিষ্টুপের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কিন্তু চোখে তার একটু সময়ের জন্য কঠিন প্রশ্ন উঁকি দিয়া যায়।

'নিয়ে যাও।'

ডাকিলেই কুন্তলা আসিল। তাকে দেখিয়াই ত্রিষ্টুপের মুখ একেবারে বিমর্ষ পাংশু হইয়া গেল, কেহ লক্ষ্য করিল কিনা, জানা গেল না।

'তিষ্টু তোমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে কুন্তী।'

'এখন?'

'তাই তো বলছে তিষ্টু।'

'যাব?'

কুন্তলার এই একটি প্রশ্নে, মণীশের কাছে অনুমতি চাওয়ায়, ত্রিষ্টুপের বিবর্ণ মুখ চোখ পলকে রাঙা হইয়া গেল। কুন্তলার প্রশ্নের জবাব না দিয়া, মণীশ তার মুখের দিকে চাহিয়া আছে খেয়াল করিয়া, জোরে সে নীচের ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিল।

মণীশ তখন বলিল, 'যা, যা।'

কুন্তলা বলিল, চলুন যাই।'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'রিক্সা ডাকি?'

'রিক্সা কি হবে?'

'কাপড় বদলে এস তবে। আমি বসছি।'

'কাপড় বদলাতে হবে না। চলুন।

মণীশ বাহিরে যাইতেছে, সে যদি তাদের সঙ্গ নেয়; মণীশ চলিয়া যাওয়ার খানিক পরে তাদের বাহির হওয়া দরকার।

'একগ্লাস জল দেবে কুন্তী?'

'দিই।' কুন্তলা জল আনিতে গেল।

'মণিদা, আমি একটু বিশ্রাম করে—'

মুখ ফিরাইয়া ত্রিষ্টুপ দেখিল—মণীশ কখন বাহির হইয়া গিয়াছে, সে টেরও পায় নাই।

শিশিরদের বাড়ির সদর দরজায় ত্রিষ্টুপ তালা দিয়া যায় নাই, দরজা খোলাই ছিল। কুন্তলা ভিতরে গেলে ত্রিষ্টুপ দরজা বন্ধ করিল। কুন্তলা একথা সেকথা বলিতেছিল, তার যেন মুখ খুলিয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে সায় দিতে গিয়াও ত্রিষ্টুপের গলা আটকাইয়া যাইতেছিল। সব কেমন অবাস্তব স্বপ্নের মত মনে হইতেছে, অথচ বাস্তবতার অনুভূতির চাপে প্রাণটা তার হাঁস-ফাঁস করিতেছে। নিজেকে কত বার এই পরিস্থিতিতে ধীর স্থির আত্মপ্রতিষ্ঠ বীরের মত সে কল্পনা করিয়াছে, কুন্তলার কাল্পনিক আর্তনাদে পর্যন্ত সে বিচলিত হয় নাই,সংকল্পে অটল থাকিয়াছে। কুন্তলাকে সঙ্গে করিয়া বাড়িতে ঢুকিবার আগে হইতেই যে, তার হৃদয়-মন এমন অবাধ্যপণা আরম্ভ করিবে, কে জানিত!

উপরে শিশিরের দাদার শোবার ঘরে সে কুন্তলাকে লইয়া গেল। ঘরে বসিবার ব্যবস্থাও ছিল, খাটে বিছানাও পাতা ছিল। পাশাপাশি বালিশ পাতা। নবপরিণীতা স্বামী-স্ত্রীর সে শয্যার দিকে চাহিয়া ত্রিষ্টুপ যেন চমকাইয়া গেল। কুন্তলার পিছু পিছু সবে সে ঘরের ভিতরে পা দিয়াছিল, হঠাৎ নিঃশব্দে বাহির হইয়া বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুন্তলা ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ত্রিষ্টুপকে ডাকিল না, কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না।

কুন্তলার এই নীরবতাই শেষ পর্যন্ত ত্রিষ্টুপকে ভিতরে টানিয়া আনিল।

'এটা আমাদের বাড়ি নয় কুন্তী।'

'জানি।'

কুন্তলা আবার বলিল, 'আপনাদের বাড়ি আমি চিনি।'

'তবে এলে কেন?'

'দাদা আসতে বললেন।'

ত্রিষ্টুপ একটা চেয়ার টানিয়া কুন্তলার মুখোমুখি বসিল।

'এ বাড়িতে কেউ নেই জান?'

'জানি।'

'তবে যে এলে?'

'বললাম তো দাদা আসতে বললেন।'

ত্রিষ্টুপ এবার চটিয়া গেল। 'দাদা! দাদা! দাদা! তোমার মত এমন দাদাভক্ত কখনও দেখিনি কুন্তী।'

কুন্তলা একটু হাসিল।

ত্রিষ্টুপ আরও চটিয়া গেল। 'তোমায় এখানে কেন এনেছি জান? বিয়ে করব বলে। দরকার হলে জোর করে' বিয়ে করব বলে। বুঝতে পারছ সেটা কি?'

কুন্তলা মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, 'দাদা বলছিল, আপনি ভয়ানক একগুঁয়ে।'

ত্রিষ্টুপ ক্লিষ্ট জ্বালাভরা হাসি হাসিল।—'একগুঁয়ে? তোমার দাদা তাই জানে। একগুঁয়ে হলে, এত করে, তোমাকে এখানে এনে মত বদলাতাম না কুন্তী। আমার এতটুকু মনের জোর নেই। তোমাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছি।'

'ছেড়ে না দিলে কি হত?'

'আমাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার কোন উপায় থাকত না। মণিদাকেও বাধ্য হয়ে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে হত।'

কুন্তলা মুখ নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'আপনি দাদাকে জানেন না।' ত্রিষ্টুপ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, 'বল কি! আজ আমাদের আসল বিয়েটা হয়ে গেলেও, তোমার দাদা সামাজিক বিয়ে দিতেন না? বেশ, বেশ! তারপর তোমার দাদার পছন্দ-মত বরের সঙ্গেই বিয়ের আয়োজন হলে তুমিও বোধ হয় দাদার আজ্ঞা মাথায় ক'রে রাজী হয়ে যেতে?'

'দাদা আপনাকে চেনেন, তাই আমাকে আসতে দিয়েছেন। দেখছেন তো দাদার ভুল হয় নি?'

ত্রিষ্টুপের সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া মণীশের বিরুদ্ধে একটা দুঃসহ ক্রোধে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কুন্তলার কথায় তার মাথা খারাপ হইয়া গেল।

'ভুল হয়নি? আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি ভুল হয়েছে কিনা।'

কুন্তলার হাত ধরিয়া সে হিড়হিড় করিয়া বিছানার কাছে টানিয়া লইয়া গেল। নিজে বসিয়া দু'হাতে তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তখন সে অনুভব করিল, কুন্তলার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা টিপ্-টিপ্ করিতেছে। এতক্ষণ পরে কুন্তলার মুখ একটু বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তার চোখে দেখা দিয়াছে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি!

'ভুল হয়নি মণিদার?'

'না।'

কুন্তলার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে ত্রিষ্টুপের হাতের বন্ধন আল্‌গা হইয়া আসিল। কুন্তলা ইচ্ছা করিলেই সরিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু ত্রিষ্টুপ, সম্পূর্ণরূপে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত সে নড়িল না।

'আমি হার মানলাম কুন্তী, মণিদার ভুল হয়নি।'

'সংস্কার কি এত সহজে জয় করা যায়?'

'সংস্কার নাকি?'

'অসহায়ের ওপর দরদ আপনার রক্তে মিশে আছে।'

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করিয়া রহিল।

'চল তোমায় দিয়ে আসি কুন্তী!'

'চলুন!'

কিন্তু কেউ উঠিল না, দু'জনেই যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল। ত্রিষ্টুপ সহজ সুরে বলিল, 'আমাকে ক্ষমা কর। জীবনে অনেক কিছু আদায় করব বলে ছকেছিলাম তার মধ্যে প্রথম ছিলে তুমি। প্রথমটাতেই ব্যর্থ হব?—ভাবলেই মনে হচ্ছিল সমস্ত জীবনটাই তা'হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর কোন উপায় ছিল না, তাই এই খাপছাড়া উপায়টা দিয়ে চরম চেষ্টা করব ভেবেছিলাম। অন্য উপায় থাকলে—'

'অন্য উপায় তো ছিল!'

'ছিল কি উপায়?'

'আদায়ের যে ছক করেছিলেন সে বদলে ফেলে!'

'তাতে কি হত ?'

'দাদা রাজী হতেন। আপনি ঠিক করেছেন বড় হবেন। টাকা-পয়সা, মানসম্ভ্রম, এসব নিয়ে যারা বড় হয়, দাদার কাছে তাদের কোন দাম নেই। আপনি একগুঁয়ে মানুষ, যা, ধরবেন তা' ছাড়বেন না। একদিন মস্ত লোক হবেন, মোটর হাঁকাবেন, দেশ জুড়ে খ্যাতি লাভ করবেন—এই আপনার প্রতিজ্ঞা। আপনার সঙ্গে আমার কখনও বিয়ে হয় ?'

'কেন ?'

'আমাদের ছক আলাদা। আমরা অন্য প্রতিজ্ঞা করেছি--জীবন দিয়ে কিছু আদায় করব !'

'কি আদায় করবে ?'

'স্বাধীনতা।'

ত্রিষ্টুপ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, 'ও !'

কুন্তলা ব্যগ্রভাবে বলিল, 'বুঝতে পারছেন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে কেন অসম্ভব ? আপনি যা' চান, সে সব আদায় যারা করেছে, তারা হল এক জাত ; আর তাদের পায়ের নিচে যারা চ্যাপ্টা হয়ে মরছে, তারা হল আর জাত। আমরা ওই জাতের। বেজাতের হাতে দাদা কখনও বোনকে দিতে পারে ?'

'কেরাণীরা তো তোমাদের স্বজাত ? তোমার দিদিকে তো কেরাণীর হাতে দেওয়া হয়েছে। আমিও কেরাণী।'

কুন্তলা আঁচল দিয়া মুখ মুছিল, তারপর হাসিল।—'কেরাণীর কোন জাত নেই। জামাইবাবু আমাদের জাতের জাতের লোক, পেটের জন্য কেরাণীগিরি করছেন। জামাইবাবু দু'বছর পরে এই সেদিন ফিরেছেন. জানেন না ?'

ত্রিষ্টুপ জানিত না। কিই বা সে জানিত ? আশী টাকার কেরাণী ও রমলার ঘরে আনন্দের ছড়াছড়ি দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। মণীষকে সে ভাবিয়াছিল খাপছাড়া রহস্যময় মানুষ ! কুন্তলাকে সে ধরিয়া রাখিয়াছিল আত্মচেতনাহীন সৃষ্টি-ছাড়া পরবশ মেয়ে ! জীবনাদর্শ কত সহজ ও কত স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এসবের ! ত্রিষ্টুপ খাট ছাড়িয়া কুন্তলার কাছে গিয়া বসিল।

'তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব কুন্তী। আমার প্রথম আদায় ফস্কে গেল, ছকটাও ওলট-পালট হয়ে গেল। আমি যদি নতুন ছক কাটি, যদি তোমাদের জাতে উঠতে চাই। মণিদা রাজি হবেন ?'

'নিশ্চয় ! কিন্তু মত বদলানো বড় কঠিন।'

'সে আমি বুঝব। তুমি রাজি হবে ?'

'দাদা রাজি হলে—'

ত্রিষ্টুপ অসহিষ্ণুর মত বাধা দিয়া বলিল, 'তোমার নিজের কথা বল। মনে কর তোমার আর আমার জীবনের আদর্শের একচুল তফাৎ রইল না। তখন যদি মণিদাকে বলার আগে তোমাকে বলি, মণিদাকে জিজ্ঞেস না ক'রেই তুমি তোমার মত জানাবে ?'

কুন্তলা বলিতে গেল, 'ওসব যদি টদির কথা—'

ত্রিষ্টুপ প্রায় ধমক দিয়া বলিল, 'যদির-কথাই বল। রাজী হবে ?'

'হুং

সমাপ্ত